একাঙ্কিকা

মন্মথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড্ সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওআলিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
প্রদীপ রায়
পোঃ বালুরঘাট,
পশ্চিম দিনাজপুর

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
[মহালয়া, ১৩৬২]
রচনাকাল ঃ ১৩৩২-১৩৬১
সম্পাদনা ঃ মনোমোহন ঘোষ [চিত্রগুপ্ত]

মূল্য পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন, কলিক

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল,

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার প্রথম একাঙ্ক-নাটক "মুক্তির ডাক" পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে আপনি ১৩-৭-২৪ তারিখে প্রথম পত্র লেখেন। সেই পত্রে যে উৎসাহ পাইয়াছিলাম, যে আশীর্ব্বাদ ছিল, তাহাই আমাকে আত্ম-বিশ্বাসী করিয়াছে, দুঃসাহসী করিয়াছে, নাটকলেখায় সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এ-কথাটি কেহই হয়ত জানেন না, আপনিও না, এই কথাটি জানাইয়া আমার "একাঙ্কিকা" আপনাকে প্রণাম করিল।

নিবেদন ইতি।

স্নেহধন্য

মন্মথ রায়

১১ই নভেম্বর, ১৯৩১

"বরদাভবন"

বালুরঘাট ; (দিনাজপুর)

20, May fair
Ballygunge
13/7/24

সবিনয় নিবেদন,

আপনি শুনে খুসি হবেন যে "মুক্তির ডাক" আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে ও-জিনিষ একান্ত দুর্লভ। নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি। কিন্তু যা যথার্থ নাটক তা শুধু দেখবার বস্তু নয়, পড়বারও জিনিষ। সত্য কথা বল্‌তে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ নাটক আমরা পড়বার বই হিসেবেই জানি, acting piece হিসেবে জানি নে। আমরা চোখে না দেখলেও মানসচক্ষে সে সব নাটকের অভিনয় দেপতে পাই। "মুক্তির ডাকের" অভিনয়ও আমি মানসচক্ষে দেখেছি এবং তাই দেখেই বলছি যে "মুক্তির ডাক" একখানি যথার্থ drama.

বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়; আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।

ইতি—
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের কথা

[উদ্ধৃতি]

আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নাট্যকারের প্রশংসাপত্র লিখতে বসিনি। সে ধৃষ্টতা আমার নেই। যাঁর ঢাকায় ছাত্রাবস্থার লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তোমার টেক্‌নিক্‌ perfect, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যাঁর লেখা পড়ে তারিফ করেছেন ও নজরুল যাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই—তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে আর কি বলব!

বঙ্গসাহিত্যে এই একাঙ্ক-নাটিকাগুলি মন্মথ রায়ের এক অভিনব দান। মাসিকের পাতায় যেগুলি ছড়িয়েছিল তাই কুড়িয়ে নিয়ে এই একাঙ্কিকার জন্ম।

আমি জানি এই একাঙ্ক-নাটিকা সম্পাদনের ভার পড়লে যে কোন সাহিত্যিক গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু যে অনুরাগে ও যে আন্তরিক স্নেহে তিনি সে ভার আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা আমি জানি। আর জানি বলেই সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবো না।

নাটকের নামকরণ করেছেন নাট্যকার স্বয়ং এবং এর চাইতে সুন্দর নাম আমার কল্পনায় আস্‌ত না। এই একাঙ্ক-নাটিকা-সংগ্রহ যে বাঙলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব দান বলে গৃহীত হবে এবং এর যে বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে—একথা ইতিপূর্বে আমি বহু সাহিত্যিক-বন্ধুর মুখে শুনেছি।···

আজ দীপান্বিতা-পূজার দিনে নাট্যকারের একাঙ্ক-নাটিকার দীপালী সাজিয়ে বাণীর পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করলুম—জানি, আরতি করবার যোগ্যতর উপকরণ আর আমার জুটবে না।

দীপান্বিতা, ১৩৩৮   শ্রীঅখিল নিয়োগী

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যাবার পর বহুকাল মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা বাজারে ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে তিনি আরও বহু একাঙ্ক নাটিকা লিখেছেন। তাই অনেক দিন পরে তাঁর একাঙ্কিকার এই যে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হোলো এতে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত (১) রাজপুরী (২) বহুরূপী (৩) উইল (৪) বিদ্যুৎপর্ণা (৫) স্মৃতির ছায়া (৬) উপচার (৭) পঞ্চভূত ও (৮) মাতৃমূর্তি—এই আটটি নাটিকার মধ্যে একমাত্র 'স্মৃতির ছায়া' ছাড়া বাকি সাতটি এবং ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই বন্দী হয়ে ছিল এমন আরও চোদ্দটি নাটিকা দেওয়া হোলো। এছাড়া আরও যে অনেকগুলি নাটিকা র'য়ে গেল সেগুলিকে নিয়ে ভবিষ্যতে অন্য একটি নাটিকা-গুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার কথা রইল।

এই একাঙ্কিকায় গ্রথিত নাটিকাগুলির রচনাকালের ব্যাপ্তি হচ্ছে ১৩৩২ সাল থেকে ১৩৬১ সাল পর্যন্ত—দীর্ঘ উনত্রিশ বছর। (বর্তমান সংস্করণে প্রত্যেকটি রচনার শেষে পত্রিকার নামসহ তার প্রথম প্রকাশের তারিখও দিয়ে দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু তবুও পড়বার সময় পাঠকরা গ্রন্থকারের তরুণ*ও পরিণত উভয়কালের রচনার মধ্যে গুণগত বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখতে পাবেন না। অর্থাৎ বত্রিশ বছর আগে যখন তিনি লিখতে নেমেছিলেন তখনও তিনি কাঁচা হাত নিয়ে লিখতে নামেন নি। প্রথম থেকেই রচনাগুণের দিক দিয়ে তিনি প্রবীণ লেখক। অথচ উদার, দরদী মনটি তাঁর বরাবরই যে অতি-আধুনিক, তার প্রমাণ এই একাঙ্কিকার বিভিন্ন রচনার মধ্যেই মিলবে।

একাঙ্কিকা সম্পর্কে আরও একটি বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ-যুগে পাশ্চাত্যের সাহিত্যক্ষেত্রে একাঙ্ক নাট্য একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। কিন্তু বাংলার নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণাঙ্গ-নাট্য-সম্পদে যত সমৃদ্ধই হোক, নিছক সাহিত্যগুণে ঋদ্ধ একাঙ্ক নাট্যের সন্ধান সেখানে বিরল। মন্মথ রায়ের এই একাঙ্কিকা আজও সেখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ১৯২৩ সালে কলকাতার স্টার থিয়েটার কর্তৃক তাঁর প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হয়। মন্মথ রায়ই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একাঙ্কিকার প্রবর্তক, মায় 'একাঙ্কিকা' নামটির পর্যন্ত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকারের গুণগ্রাহী শিল্পী-বন্ধু শ্রীআদিনাথ মুখোপাধ্যায় শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদপটটির সম্পূর্ণ নক্সাখানিই ছ'কে দিয়েছেন—আর তাকে সম্পূর্ণ রূপদান করেছেন গ্রন্থকারের আর এক তরুণ শিল্পী-বন্ধু শ্রীতারাপ্রসাদ দাস। ইতি।

মহালয়া, ১৩৬২ মনোমোহন ঘোষ

সূচী

রাজপুরী

[কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎএর রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ মহাসমারোহে-সজ্জিত উদ্যান-ভবন। বাহিরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত কুঞ্জবীথি। সম্মুখে শ্বেত পাথরের অঙ্গনে ঝর্ণা। কক্ষ মধ্যে সহস্র প্রদীপের পূর্ণদীপ্তি।

চৈত্র মাসের বসন্ত-উৎসব। আজ কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি বলিয়া বসন্তোৎসবের বিচিত্র গরিমা সমধিক বর্দ্ধিত।

কুঞ্জ-বীথির অন্তরালে, ঝরণার চারি পাশে, প্রাসাদকক্ষের মধ্যে আবির কুঙ্কুম ও রং লইয়া রাজান্তঃপুরের নরনারী উৎসবমত্ত।

দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইলে দেখা গেল সেই পরিপূর্ণ উৎসবের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলা,—আর শোনা গেল অজস্র কণ্ঠের বিচিত্র কলগান। সহসা ভেরী ও দামামা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষগণ "রাজা" এবং নারীগণ "রাণী" 'রাণী" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে কক্ষমধ্যে যথাশীঘ্র সমবেত হইলেন।

কক্ষের তিনটি দরজা। দক্ষিণের ও বামের দরজা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র…কিন্তু মধ্যের দরজাটি সুবিশাল। মধ্যের এই সুবিশাল দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এই দরজা দিয়া রাণী বাসবক্ষত্রিয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র কুমার রাজশেখরকে দুইহস্তে উর্দ্ধে ধারণপূর্ব্বক নাচাইতে নাচাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ… তাঁহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণ-পেটিকা। রাজা ও রাণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের এক পার্শ্বে পুরুষগণ ও অন্য পার্শ্বে নারীগণ রংএর পিচকারী হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রং-ক্রীড়া করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন।

—গান শেষ হইলে সকলেই আভূমি নত হইয়া রাজা-রাণীকে অভিবাদন করিলেন]

রাজা॥ [দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

[তাহার পর]—উৎসব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তোমাদের জন্যে ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আবির কুঙ্কুম নিবেদন ক'রে সেই চরণাশিস এনেছি। রাণী! কুমারকে আমার কোলে দিয়ে তুমি এই চরণাশিসের ডালি নাও…সব্বার কপালে এই মঙ্গল-ধূলির টিপ্ দিয়ে দাও…

রাণী॥ [চমকিয়া উঠিয়া] আমি!

রাজা॥ হাঁ, তুমি।

রাণী॥ না রাজা,—তুমিই দাও·· চেয়ে দেখ রাজশেখর এই রংএর খেলা দেখে কেমন খুসী হয়ে উঠেছে !···ওর এই পদ্ম-আঁখি দুটিতে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে !—কি চোখ !—কি সুন্দর ! [কুমারের চোখে চুম্বন করিতে লাগিলেন]

পুরুষগণ॥ দিন্···আমাদের মাথায় ভগবানের চরণ-ধূলি দিন্···

নারীগণ॥ রাণীমা !—আমাদের কপালে ভগবানের ঐ চরণ-ধূলির টিপ্ পরিয়ে দিন্···

রাজা॥ রাণী !—কুমারকে আমার হাতে দিয়ে এই ডালি ধর···

রাণী॥ রাজা !—রাজশেখর আমার পানে চেয়ে আছে !···অপলক চোখে চেয়ে আছে !—চরণ-ধূলি তুমিই বিলিয়ে দাও···শেখর ! আমার সোণা ! আমার মাণিক !

[কুমারকে পুনরায় চুম্বন-বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন]

রাজা॥ কিন্তু রাণী, এ মঙ্গলাশিস তোমার পুণ্য-হস্তেই বিতরিত হয়···স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা !

রাণী॥ আমার পুণ্য-হস্তে ! [কাঁপিয়া উঠিলেন] [সংযত হইয়া কুমারের পানে অপলক দৃষ্টিতে···] না রাজা ! আমাকে ক্ষমা কর।—আমি পার্ব্ব না··· আমার মাণিক আমার পানে তাকিয়ে আছে···আমার এটুকু তৃপ্তি···থাক্ না !

রাজা॥ কিন্তু, তুমি যে রাণী শাক্য-কুল-দুহিতা···! ভগবান বুদ্ধের পুণ্য-বংশের পুত-রক্তে তোমার জন্ম ! ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাক্য-বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ ব'লে ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলে যে তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে !

রাণী॥ আর এই শেখর !···সে কি আমার মুখের দিকে চেয়ে নেই ?—না রাজা, শেখর ভয় পেয়েছে···সে কেঁপে উঠেছে···তার আঁখিতারা ভয়ে মিট্ মিট্ কর্চ্ছে···ও কেঁদে উঠবে !—আমি ওকে নিয়ে বাইরে ঐ ঝর্ণার ধারে চললুম··· শেখর !—আমার সোণা ! আমার মাণিক ! আমার লক্ষ্মী !

[তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে অঙ্গনের পথে ঝর্ণার দিকে প্রস্থান]

রাজা ॥ রাণী কুমারকে নিয়েই পাগল। আমি এ চরণাশিস তুলে রাখলুম··· রাণী অন্য সময় তোমাদের এ প্রসাদ দেবেন। চল, আমরা কলা-ভবনে যাই। কুমারের জন্ম-তিথি উপলক্ষে রাণী কপিলাবস্তু থেকে তাঁর পিতা শাক্যরাজার সভাকবি কবিশেখরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—তাঁর গীতিকাব্য, তাঁর গান··· সুন্দর···অতি সুন্দর। যাও, তোমরা সেই সঙ্গীত-সুধায় স্নান করে ধন্য হয়ে এস··· রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও এখনি যাবো···

[অঙ্গনের পথে রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[রাজা ধীরে ধীরে অঙ্গনের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীকে ডাকিবেন, কি, নিজে রাণীর নিকট যাইবেন চিন্তা করিতে করিতে রাণীকেই ডাক দিলেন···]

—রাণী!

রাণী ॥ [প্রাঙ্গন হইতেই] আমায় ডাকছো?

রাজা ॥ ডেকে কি কোন দোষ করলুম? [এমন সময় কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া রাণী রাজার নিকট কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রাণী ॥ [রাজার প্রতি]—রাগ করেছ বুঝি?—কিন্তু, র'সো···,—মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর সহচরী মল্লিকার প্রবেশ] জলতরঙ্গের বাদ্য এনে বাজা···শেখরের চোখে ঘুমের পরী উড়ে এসে চুমো দিক্···[কুমারকে চুম্বন করিয়া মল্লিকার ক্রোড়ে দিলেন। মল্লিকা তাহাকে লইয়া দক্ষিণের দ্বারপথে পার্শ্বস্থ কক্ষে চলিয়া গেল এবং শীঘ্রই জলতরঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হইল। সেই মৃদু সুর-লহরীর মধ্যেই রাজারাণী কথোপকথন করিতে লাগিলেন] খুব রাগ করেছ, না?

রাজা ॥ আমি হয় ত রাগ করিনি···কিন্তু, পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তোমার ঐ কল্যাণহস্তের মঙ্গলস্পর্শ থেকে তাদের বঞ্চিত কর্লে কেন রাণী?

রাণী ॥ রাজা!—আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।—ঠিক উত্তর দেবে?

রাজা ॥ কি রাণী?

রাণী ॥ আমাকে তুমি কি ভাবো?—আমি মানুষ, না দেবী?

রাজা॥ তুমি দেবী···স্বয়ং ভগবানের পূত-রক্ত তোমার শিরায়···ধমনীতে প্রবাহিত···

রাণী॥ এবং সেই জন্যই, বৌদ্ধসঙ্ঘে কৌলীন্য লাভের সহজ পন্থা স্বরূপ তুমি তোমার সামন্ত শাক্যরাজকে তোমার রক্তচক্ষুতে বশীভূত করে আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেছ,—কেমন ?

রাজা॥ ঠিক্।

রাণী॥ বেশ। কিন্তু, এই আমি যদি ঐ শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ না করতুম, তবে···আমার এই সাধারণ রূপ-সম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ কর্ত্তে পার্ত্তুম না···

রাজা॥ পদ্ম কি তার নিজের রূপ নিজে উপলব্ধি কর্ত্তে পারে ?

রাণী॥ ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার···কিন্তু, তোমার সত্যিকার উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তিটুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই জন্যই আমি দেবী···সেই জন্যই আমি সহধর্ম্মিণী। কিন্তু, রাজা, এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয় ?

রাজা॥ তার অর্থ ?

রাণী॥ আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না ? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ···জন্ম আমাদের যা-ই হোক্ না কেন !

রাজা॥ কিন্তু তোমার এই জন্ম-গৌরবের উপরই যে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে আমার সকল সম্মানের প্রতিষ্ঠা! আজকে সেই পুরানো কথাটি মনে পড়ছে। ষোল বছর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্ঘে আমি তাঁদের জন্য আহার্য্য পাঠাতুম। কিন্তু, দেখতুম, তাঁরা তা শ্রদ্ধায় গ্রহণ কর্ত্তেন না। একদিন আমি নিজে স্বয়ং ভগবানের নিকট গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। ভগবান বল্লেন "বন্ধুত্বের দান ভিন্ন অন্য দান গ্রহণ করি না।" শুনলুম "জ্ঞাতিবন্ধুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

রাণী॥ তারপর আমাকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞাতিত্ব অর্জ্জন করেছ। কিন্তু রসাতলে যাক্ সেই সমাজ···যে সমাজে বন্ধুত্ব জ্ঞাতিত্বের চোরাবালির উপর নির্ভর করে!

রাজা॥ রাণী! তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছ কেন ?

রাণী ॥ [রাজার প্রতি অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] আমি এখন রাত্রিতে ঘুমুতেও যে পারি না রাজা !

রাজা ॥ সে আমি দেখেছি। কিন্তু কেন রাণী ?

রাণী ॥ আমি ভাবি···সারাক্ষণ ভাবি !···আমি ভয় পাই···ইচ্ছা হয়··· ইচ্ছা হয়—

রাজা ॥ কি ইচ্ছা হয় রাণী ?

রাণী ॥ আমি হয় ত পাগল হব ! হব কি, হয় ত হয়েছি,—না রাজা ?

রাজা ॥ তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী ?

রাণী ॥ হাসবে না ?

রাজা ॥ হাসবো কেন !

রাণী ॥ কাঁদবে না ?

রাজা ॥ কাঁদবো কেন ! ছিঃ রাণী !

রাণী ॥ রাগ কর্ব্বে না ?

রাজা ॥ [রাণীর হাত দুখানি ধরিয়া] তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী ?

রাণী ॥ [অপ্রকৃতিস্থ ভাবে]—আমি আমার এই বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব···

রাজা ॥ [হাসিয়া] আমার এক রাজ্যখণ্ড-মূল্যে এর চাইতে সহস্রগুণে গরিমাময় বসন-ভূষণ তোমায় আমি পরিয়ে দেব···

রাণী ॥ না রাজা। সেদিন কাশী থেকে যে নর্ত্তকী এসে আমাদের সম্মুখে নৃত্য করেছিল—নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে সে বিবসনা হয়ে পড়েছিল। আমি তার সেই অসভ্যতার জন্য তোমার চোখের সম্মুখেই তার মস্তক মুণ্ডন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলুম।—মনে পড়ে ?

রাজা ॥ হাঁ, তুমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্লে না···

রাণী ॥ [নিম্নস্বরে চারিদিকে চাহিয়া] এখন আমার ইচ্ছা হয়···আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি···দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি···আত্মার উলঙ্গ মূর্ত্তি নিয়ে তোমার চোখের সম্মুখে দাঁড়াই !—রাজা ! রাগ কর্লে ?

রাজা ॥ রাণী !—রাজসভায় চল···তোমার পিত্রালয়ের সভা-কবি কবিশেখর এসেছেন,—তিনি গান কর্ব্বেন···হয়ত আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

রাণী ॥ [রাজার মুখে কবিশেখরের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক, সহজ সংযত স্বরে] কবিশেখর ! হাঁ, সে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। এসেছে,—না ?—কিন্তু, আমি যে আমার বিরূঢ়কের প্রতীক্ষা করছি···তারও তো কবিশেখরের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে ফিরে আসার কথা···

রাজা ॥ কুমার বিরূঢ়ক আর কবিশেখর একসঙ্গেই কপিলাবস্তু থেকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু, সৈন্যদলের নদী পার হ'তে একটু বিলম্ব হওয়াতে যুবরাজের পুরপ্রবেশেও একটু বিলম্ব হবে। তবু, খুব সম্ভব সে আজ রাত্রিতেই এসে পড়বে···

রাণী ॥ আমি বিরূঢ়কের সঙ্গে দেখা না করে কোনখানে যেতে পার্ব্ব না···

রাজা ॥ এলেই দেখা হবে···

রাণী ॥ না, কারো সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পূর্ব্বে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই···

রাজা ॥ বেশ্···তা-ই ক'রো···। এখন চল···

রাণী ॥ না, আমি যাব না। আমি তার সঙ্গে সবার আগে গোপনে দেখা কর্ব্ব···

রাজা ॥ কেন রাণী ?

রাণী ॥ [হাসিয়া] কৌতূহল, শুধু কৌতূহল। ছোটবেলাতে সে এসে আমাকে জ্বালাতন কর্ত্ত "মা, আর সব রাজপুত্রদের মামার বাড়ী থেকে কত উপহার আর উপঢৌকন আসে।—আমার আসে না কেন ?" আমি বলতুম "তোমার মামার বাড়ী, সেই কপিলাবস্তু—কত দূ—র ! তাই তোমার দাদামশায় বা দিদিমা কিছু পাঠাতে পারেন না।" তারপর এই ষোল বছর বয়সে যুবরাজ হয়েই সে জিদ্ ধরল সে কপিলাবস্তুতে যাবে। আমি বাধা দিতে পারলুম না···

রাজা ॥ বাধা দেবেই না কেন ! তোমার বাবা মা তাকে দেখে না জানি কত খুসী-ই হয়েছেন···কত আদর-যত্নই না জানি তাকে করেছেন !

রাণী ॥ সেই কথা শোনবার জন্যই তো আমি ছট্‌ফট্‌ কর্ছি—তুমি যাও রাজা …রাজশেখর একলাটি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে ফেলে আমি যেতে পার্ব্ব না…

রাজা ॥ কিন্তু তোমাকে রেখে আমি একলাটি সভায় গেলে কবিশেখরের গান জমবে তো? [রসিকতার হাসিটুকু হাসিয়া বাম পার্শ্বস্থ দরজা দিয়া প্রস্থান। রাণীও দক্ষিণের দরজা দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতেছিলেন এমন সময় সহসা বাহিরে অতি তীব্রভাবে ভেরীবাদ্য হইতে লাগিল। রাণী চমকিয়া দাঁড়াইলেন। জলতরঙ্গের বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল]

রাণী ॥ মল্লিকা…

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ মা!

রাণী ॥ [উত্তেজিতভাবে] অকস্মাৎ এই ভেরীবাদ্য কেন?

মল্লিকা ॥ তা তো জানি না মা…

রাণী ॥ [ভয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায়]—হয় ত বিরূধক এসেছে!—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি ॥ না, সে এখনো আসে নি—

রাণী ॥ [ক্রমে, চেষ্টা করিয়া সংযত ও শান্ত হইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থভাবে] তবে ও বুঝি তোমারি অভিনন্দন?

কবি ॥ আমার অভিনন্দন তোমার ঐ দৃষ্টি-প্রসাদে।

রাণী ॥ [অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া] বটে! হুঁ। [ভেরীবাদ্য] তবে ও কি?

কবি ॥ যুদ্ধের আশঙ্কা।

রাণী ॥ যুদ্ধ?

কবি ॥ হাঁ, খণ্ডযুদ্ধ। আজ বসন্তোৎসব আর কুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে নগরবাসী প্রমোদমত্ত জেনে গুপ্ত বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে খবর পাওয়া গেছে।

সেনাপতির এই সংবাদে এই মাত্র রাজা স্বয়ং দুর্গে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আর সময় না পেয়ে আমাকে দিয়ে তিনি তোমাকে এ খবর পাঠিয়ে দিলেন—

রাণী ॥ [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্যে] শেখর !—আমার বিরূধক ?

কবি ॥ ভয় নেই। সে নিরাপদ। তার কাছে খবর গেছে। নগরের বাইরে সে সুগুপ্তভাবে অবস্থান কর্ব্বে।

রাণী ॥ কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করার পর—

কবি ॥ রাজা বলে গেলেন কোনই আশঙ্কা নেই। বিদ্রোহীরা ঐ ভেরীবাদ্যে রাজধানী সতর্ক রয়েছে বুঝতে পেরে খুব সম্ভব আর আত্ম-প্রকাশই করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—

রাণী ॥ [দারুণ উত্তেজনায়] সম্মুখে বিরূধক···তবু আমি নিশ্চিন্ত ! কবি ! এবার কি শুধু ব্যঙ্গ কর্ত্তেই এসেছ ?

কবি ॥ কেন রাণী ?

রাণী ॥ আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তোমার স্পর্দ্ধা দেখে···আবার পরক্ষণেই তোমার ঐ চোখের দিকে যেই চাই—অমনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি !

কবি ॥ আমি তোমাকে রাজার খবর দিতে এসেছিলাম, এইবার তবে কলা-ভবনে যাই···

রাণী ॥ দাঁড়াও···

কবি ॥ বল···

রাণী ॥ কাছে এস···আরো কাছে এস···

কবি ॥ [অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে আসিয়া] বল···

রাণী ॥ [চারিদিকে চাহিয়া নিম্ন-স্বরে] বিরূধক কি কিছু জেনে এসেছে ?

কবি ॥ সে পথ তো তুমি আগে থেকেই রুদ্ধ করে রেখেছিলে—

রাণী ॥ তবু···যদি কারো বিন্দুমাত্র অসাবধানতায়—

কবি ॥ না, তা হয় নি।—হ'লে আমি শুনতে পেতুম।

রাণী ॥ কবিশেখর !

কবি ॥ রাণী !

রাণী ॥ আর যে আমি পারি না !—এ যে অসহ্য !

কবি ॥ চল, আমি গান গাইব···তুমি শুনবে···

রাণী ॥ কিন্তু, তার আগে আমার গানখানি শোন···শুনবে···

কবি ॥ গাও···

রাণী ॥ তোমার সেই কালো পাখীটি ভালো আছে ?

কবি ॥ কালো পাখী ?

রাণী ॥ তোমার বৌ···সেই "কোকিল"···

কবি ॥ তার নাম ত কোকিল নয়···

রাণী ॥ ও···তবে, তবে···হাঁ, "কাক" ; না ?

কবি ॥ তার নাম "কাকলী"। আমি চললুম···

[প্রস্থানোদ্যত···]

রাণী ॥ না, না, রাগ ক'রো না। আমি ভুলে গিয়েছিলুম। তা তার চোখ ভালো হয়েছে ?

কবি ॥ সে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ···

রাণী ॥ এখনো তুমি তাকে···তেমনি ভালোবাসো···না ?

কবি ॥ [পরিপূর্ণ বিরক্তিতে চলিয়া যাইতে যাইতেই সহসা ফিরিয়া] তোমার কি মনে হয় ?

রাণী ॥ আমাকে রক্ষা কর। হাঁ, ভালো কথা, তোমার মেয়ে ভালো আছে ?

কবি ॥ আছে।

রাণী ॥ সে দেখতে কেমন হয়েছে কবি ?

কবি ॥ কালো হলেও সে আমাদের কুটীরখানি আলো করে রেখেছে রাণী !

রাণী ॥ কবি ! আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব···রাগ কর্ব্বে না ?

কবি ॥ বল রাণী···

রাণী ॥ তোমার মেয়ে দেখতে কার মত হয়েছে কবি ?

কবি ॥ [একটু ভাবিয়া] কেমন করে বলব !

রাণী ॥ এই ধর, তোমার মতো···কি তার মা কাকলীর মতো···কিম্বা···

কবি ॥ ···কিম্বা—

রাণী ॥ ···[একটু ইতস্ততঃ করিয়া] এই আমার মতো···

কবি ॥ তার রং হয়েছে তার মার মতো···আর মুখ হয়েছে বোধ হয় কতকটা আমারি মতো···

রাণী ॥ শেখর ! শেখর ! আমার মত কি তার কিছুই হয় নি··· এতটুকুও না ?

কবি ॥ —অপরূপ তোমার রূপ ।—সে রূপসী হয় নি রাণী !

রাণী ॥ —হুঁ । তার চোখ দুটি ঠিক তোমারি মত হয়েছে, না ?

কবি ॥ —হওয়া বিচিত্র নয় । কিন্তু, একরত্তি ঐ মেয়েটির উপর তোমারি বা এত আক্রোশ কেন ?

রাণী ॥ ···তোমার ঐ চোখ···ও যে অতুল !···অনুপম !—এখন কি ভাবি জানো ?

কবি ॥ —কি ভাব রাণী ?

রাণী ॥ প্রকৃতির প্রতিশোধ ।

কবি ॥ কি রকম ?

রাণী ॥ আমি তোমার ঐ চোখদুটির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম ; কিন্তু তুমি আমার পানে ফিরেও তাকাও নি···আজ তোমার ঐ···কাকলীই তার শোধ নিয়েছে···

কবি ॥ আজ আর সে পুরানো কথা কেন ?

রাণী ॥ —আজ নয়ই বা কেন ? আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্ ।··· তোমার ঐ চোখ দুটি আমার বড়ই ভাল লাগতো···মনে করে দেখ সেই কিশোর কালের কথা । আমাদের রাজসভায় তুমি গান গাইতে···আমি কখনো বা নাচতুম কখনো বা বীণা বাজাতুম ।···আমার নৃত্যের তালে তালে তোমার গান অগ্নিশিখার মত খেলতো···আমার সুরের ঝঙ্কারে তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ চমকাতো···

কবি ॥ —মনে আছে। তুমিই আমার কণ্ঠে সুর দিয়েছিলে, প্রাণে গান দিয়েছিলে···

রাণী ॥ [শ্লেষ হাস্যে]—দিয়েছিলুম,···সত্যি ?—কিন্তু তার চাইতেও তো আরো বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলুম···তবে আমার সে বরমাল্য প্রত্যাখ্যান কর্লে কেন কবি ?···তোমার সেই বালিকা-বধূ···সেই গ্রাম্যবালা···সেই দৃষ্টিহীনা কালো বৌ-টি···সে কি···

কবি ॥ —রাণী, ক্ষমা কর,···আমি আসি···

[প্রস্থানোদ্যত···]

রাণী ॥ [হঠাৎ আদেশসূচক স্বরে] না, যেতে পার্ব্বে না···দাঁড়াও···

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া···সবিস্ময়ে]—এ কি ! ও হাঁ···তুমি রাণী···কি আদেশ ?

রাণী ॥ —হাঁ, আমি রাণীই বটে···কিন্তু, এ মণি-মুকুট আমি চাই নি··· আমি চেয়েছিলুম তোমার ভাঙা-ঘরের চাঁদের আলো। আমি তো রাজশক্তির দিব্যদৃষ্টি চাই নি। আমি তোমার ঐ পদ্ম-চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসাদ চেয়েছিলুম। তুমি বলেছিলে কাকলী কি মনে কর্ব্বে···আমি বলেছিলুম কাকলী যে আকাশের তলে বাস করে সেই একই আকাশে চাঁদও ওঠে···সূর্য্যও ওঠে···ওঠে না ?— বল তুমি···

কবি ॥ —ওঠে। কিন্তু সে ছিল কালো, তার উপর সে ছিল দৃষ্টিহীনা, তারো উপর সে ছিল শিক্ষাশূন্যা। তার এই অনন্ত দৈন্যকে আমি তো একদিনও তার দৈন্য মনে কর্ত্তে দিই নি···সে তাই পরিপূর্ণ আশ্বাসে আমার উপর নির্ভর করে ছিল। রাজকন্যাকে তার পাশে এনে দাঁড় করালে সে মনে কর্ত্ত জীবন তার ব্যর্থ ···আমি তার রিক্ততা ঐ রাজকন্যাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিলুম···

রাণী ॥ হাঁ; তাকে দয়া করে গেলে, কিন্তু আমাকে দয়া কর্ত্তে তোমার হাত উঠলো না। আমিও প্রতিশোধ নিলুম। তারা যখন জোর করে আমার মাথায় কোশলের রাজমুকুট তুলে দিলে, আমি আপত্তি কর্লুম না। আজ আমি তো সেই রাণী !

কবি ॥ কল্পনাতীত সুখেই তো রয়েছ রাণী !

রাণী ॥ সুখে আছি ! আর যদি কেউ এই কথা আমায় বলতো…আমি স্বহস্তে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম !

কবি ॥ এ পক্ষপাত আমার উপর না হয় না-ই করলে !

রাণী ॥ তোমার ঐ চোখ…তোমার ঐ চোখ…আমি সব ভুলে যাই। [বলিয়াই যেন লজ্জা পাইলেন। পরে সংযত হইয়া]—আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি শেখর ?

কবি ॥ অপ্রকৃতিস্থ হবে কেন রাণী ?

রাণী ॥ আচ্ছা কবি, আমার এই নূতন রূপ দেখে কি বুঝেছ ?

কবি ॥ তুমি বসন্তের রাণী বাসন্তী !

রাণী ॥ রংএ লাল হয়েছি, না ? মূর্খ ! এ রং নয় !…এ রক্ত ! তাজা রক্ত ! টাট্‌কা রক্ত ! এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ !—আর কত যুদ্ধ কর্ব্ব ! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্ত্তে পারি !…শেখর ! আমায় বাঁচাও…আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল…আমাকে মুক্তি দাও…আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে চল—

[কবির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন…]

কবি ॥ [বিচলিত হইয়া]—কিন্তু রাণী, সে যে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ ! আঘাত যদি সে পায়, তবে এখনি যে সে সব চাইতে বেশী পাবে !

রাণী ॥ [করুণ নেত্রে] শেখর !

কবি ॥ শোন রাণী ! জীবনের পুরানো পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে নূতন পাতায় নূতন পুঁথি লেখ…শান্তি পাবে…মুক্তি পাবে…

রাণী ॥ কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ! না শেখর, আমার এই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে সত্যের সম্মান রক্ষা কর…

কবি ॥ ভুলে যাও…ভুলে যাও রাণী…আমাকে ভুলে যাও…

রাণী ॥ অসম্ভব ! অসম্ভব ! ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি ! আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছ। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কত দিন ঢেকে রাখতে পারি ?

কবি ॥ মনে কর আমি মৃত। আর তা-ও যদি না পারো রাণী,…ঐ হাতে একখানি অস্ত্র এনে দাও…এখনি আমি আমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সত্যকে তোমার চোখের সম্মুখে ধরি…

রাণী ॥ [কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া] তুমি জান না! তুমি দেখ নি!…তা-ই।…কবি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর…আমার কুমার হয়ত জেগে উঠে কাঁদছে…আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি তাকে দেখ নি, না কবি?

কবি ॥ দেখতে আর অবসর পেলুম কই রাণী?

রাণী ॥ এই সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়…আমি এখানেই তাকে নিয়ে আসি। [প্রাঙ্গণে কে গান গাহিয়া যাইতেছিল…] তুমি ততক্ষণ গান শোন…

কবি ॥ ও কে গাইছে রাণী?

রাণী ॥ ও বলে "ও চৈত্র রাতের উদাসী"…দেখো এখন…এখানেই আসবে…

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[কবি উঠিয়া অঙ্গনের সম্মুখে গেলেন। উদাসী গান গাহিয়া যাইতেছিল…তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। উদাসী গাহিতে গাহিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—গাহিতে গাহিতেই উদাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কবি বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন]

[ধীর-পদসঞ্চারে রাণী কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কবির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন…]

রাণী ॥ কবি!

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] রাণী!

রাণী ॥ বল দেখি এ কে! [কুমারকে কবির সম্মুখে ধরিলেন…]

কবি ॥ তোমার কুমার…

রাণী ॥ এ তুমি। এই পরিপূর্ণ দীপালোকে এস…[এক হাত দিয়া কবিকে প্রদীপের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন]…এই আমার সন্তান…কিন্তু এ কার মুখ? —রাজার নয়…আমারও নয়…তোমার। এ কার চোখ? রাজার নয়, আমার নয়…তোমার। কার মতো এর রং?—রাজার মতো নয়, আমারো মতো নয়… ঠিক্ তোমার মতো। তোমার ঐ নাক…তোমার ঐ ভ্রূ…পরিপূর্ণভাবে এই

মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমার চোখের মধ্য-মণিতে একটি তিল আছে··· দেখ এর চোখেও সেটি বাদ যায় নি···

কবি॥ [দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া] রাণী! রাণী! এ আমি কি দেখছি! এ আমি কি দেখলুম!

রাণী॥ দেখলে সত্যের নগ্ন-মুর্ত্তি। রাজার সন্তান আমার গর্ভে ছিল···তুমি আমার মনের সকল চিন্তা জুড়ে ছিলে···সে তোমার রূপ ধরে আমার কাছে মূর্ত্তিমান হয়ে এল! এব নাম রেখেছি কি জানো?

কবি॥ [স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে] কি?

রাণী॥ "শেখর"! "রাজশেখর"! তুমি কবিশেখর···এ আমার রাজশেখর।

কবি॥ নরক! নরক! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আমার চোখ জ্বলে গেল!

রাণী॥ আমারো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!—আমার হাত ধরো···চল বাইরে চল···

কবি॥ না রাণী···এ চোখে আর তোমাব দিকে চাইবো না···ঐ শিশুর পানে চেয়ে আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে···আমি চললুম···কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে রাখে!···

[অঙ্গনের পথে দ্রুত প্রস্থান। রাণী আরক্ত চোখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন···অস্ফুট ধ্বনিতে কি সঙ্কল্প আঁটিয়া লইলেন]

রাণী॥ মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে মল্লিকার প্রবেশ]···কুমার মল্লিকার ক্রোড়ে কুমারকে দিলেন ও তাহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মল্লিকা চলিয়া গেল] দাসী!—[বামপার্শ্বের দরজা পথে দাসীর প্রবেশ]···আমার সেই মুক ক্রীতদাস—[দাসী চলিয়া গেল] [পাদচারণা করিতে করিতে] হাঁ, শুধু তার ঐ চোখ দুটি যদি না থাকতো! কি সুন্দর ঐ চোখ দুটি! ঐ পদ্ম-আঁখির মণি-তারা আমার সমস্ত জীবনটাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে!···ঐ চোখ দুটি···ঐ চোখ দুটি [ভেরীবাদ্য]···ঐ যুদ্ধ-বাদ্য! প্রতিহিংসার

ঐ রুদ্র-আহ্বান।—ক্রীতদাস! ক্রীতদাস! [বামপার্শ্বের দরজা দিয়া বিকট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ মূক ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুণ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড শক্তিমান···ভীতিব্যঞ্জক, অতিকায় তাহার শরীর। এক হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ছুরিকা] [রাণী তাহাকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ সরিয়া গেলেন···ও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন]···না; না, প্রয়োজন নেই···আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও···[ক্রীতদাস উঠিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]—যা—ও···[ক্রীতদাস তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল] [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া] না, যাক্। বিশ্বের সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! অক্ষয় হোক···অমর হোক···[ধীরে ধীরে, আবেগে,] ঐ চোখদুটির পানে কতদিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি···তবুও তৃপ্তি পাই নি! ঐ আঁখিপাতে শুধু একটী চুম্বনরেখা এঁকে দিতে চেয়েছি···কিন্তু, পাইনি, পারিনি··· [ভেরীবাদ্য—, ভেরীবাদ্য শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন]—ঐ আবার! [বিষম উত্তেজনায় যেন নাচিয়া উঠিলেন] আবার আবার সেই আহ্বান···[সপদদাপে]—ক্রীতদাস—[পূর্ব্ববৎ ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল] ওঠো···[ক্রীতদাস উঠিয়া দাঁড়াইল] এসো—[তাহাকে লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলেন] কিন্তু আবার পা টলে কেন? বুক কাঁপে কেন!—দাসী! [দাসীর প্রবেশ] জলতরঙ্গ বাজাও দেখি দাসী। আমি তার তরঙ্গের তালে তালে অগ্রসর হব···[দাসী চলিয়া যাইয়াই জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল] [সহসা ক্রীতদাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া] এইবার এসো তুমি···[তাহাকে লইয়া অঙ্গনের এক কুঞ্জবীথির ধারে গেলেন—এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রীতদাস ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবে··· আভাস দিয়া পরে তাঁহার চরণধূলি লইয়া দৃপ্তচোখে দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল···এমন সময় রাণী ঐ কুঞ্জবীথির পার্শ্ব হইতেই চাপা গলায়, কিন্তু জোরে বলিয়া উঠিলেন]—চিনেছ? [ক্রীতদাস ইঙ্গিতে বুঝাইল চিনিয়াছে] তার নাম? [ক্রীতদাস নাম বলিতে চেষ্টা করিল···কিন্তু পারিল না]—"শেখর" ···"শেখর"···যাও—[ক্রীতদাস চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। রাণী দৃপ্তচরণে

অঙ্গন হইতে কক্ষমধ্যে উঠিয়া আসিলেন। এবং ইঙ্গিতে জলতরঙ্গ বাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বামপার্শ্বের দরজা হইতে কে ডাকিল 'মা']

রাণী॥ কে? [উত্তর আসিল "প্রতিহারী"]—ভেতরে এস। কি খবর···

প্রতিহারী॥ মহারাজ খবর পাঠালেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—তিনি আজ রাত্রি দুর্গে যাপন কর্বেন···

রাণী॥ উত্তম। যাও—[প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল] তবে আজ কি প্রলয়ের রাত্রি! আজ না বসন্তোৎসব! আজ না রংএর খেলা!—রংএর খেলা খেলব। জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাটকা রক্তের পিচকারিতে আজকে আমার হোরী-খেলা, হাঃ হাঃ হাঃ [বিকট হাস্য···কিন্তু পরক্ষণেই অঙ্গনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাহাকে দেখিলেন তাহাকে দেখিয়া] এ কি! কে!—তুমি! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি॥ হাঁ, আমি। তুমি আমার চোখ চেয়েছ রাণী?

রাণী॥ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই রহিলেন]

কবি॥ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আমি তোমার এখান থেকে চলে গিয়েই খবর পেলুম, একদল বিদ্রোহী তোমার এই প্রাসাদ-উদ্যানের দিকে গুপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে—তোমাকে সতর্ক কর্ত্তে ছুটে এলুম···এসে দেখি, আমার পাশের ঐ কুঞ্জবীথিতে তুমি তোমার এক ক্রীতদাসকে আমার এই চোখদুটি উপড়ে নিতে আদেশ দিচ্ছ··আমি থমকে দাঁড়ালুম···সব শুনলুম···অপলক দৃষ্টিতে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিলুম··তার পর তোমার ক্রীতদাস ছুটে চলল···আমার সম্মুখ দিয়েই সে ছুটে গেল···আমাকে দেখ্‌লে—কিন্তু আমাকে চিনতে পার্লে না।···

রাণী॥ [ছুটিয়া আসিয়া কবির হাত দুখানি ধরিয়া] শেখর! সে তবে তোমায় চেনে নি?

কবি ॥ —না, সে আমাকে চিনতে পারে নি···

রাণী ॥ আমি তাকে পূজা কর্ব্বো···আমি তাকে রাজ্য দেব···আমি তাকে—আমি তাকে—

[আবেগে আর বাকাস্ফুরণ হইল না]

কবি ॥ আমি ভাবলুম সে ভুল করেছে···তার সেই ভুল ভেঙে দিতে আমিও তার পশ্চাতে চললুম। গিয়ে কি দেখলুম জানো ?

রাণী ॥ কি শেখর ?

কবি ॥ সে তোমার ঐ দক্ষিণের শয়নকক্ষের বাতায়নে উঠেছে···প্রথমে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পার্লুম না···পরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তার নামও তুমি শেখর রেখেছ···

রাণী ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া] শেখর ! শেখর !—ঠিক্···ঠিক্···ও-হো-হো···তবে আমি কি করলুম !—এতক্ষণে বুঝি সব শেষ !

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

কবি ॥ —দাসী—দাসী—[দাসীর প্রবেশ]···রাণী মূর্চ্ছিত···তাঁর জ্ঞানসঞ্চার কর···

[দক্ষিণের দ্বারপথ দিয়া, দ্রুত, শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান]

[দাসী জল আনিয়া চোখে জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল।
ক্রমে রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল]

রাণী ॥ না, সরে যাও···আমার কিছু হয় নি···আমি হোরী খেলছি ! জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাট্‌কা রক্তের পিচকারিতে, আজকে আমার বসন্তোৎসব ! উঃ পিপাসা ! বড় পিপাসা ! রক্তের জন্য আমার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে। [দাসী জল দিল] [পানপাত্র সম্মুখে ধরিয়া] এ কি জল ! না রক্ত ? হোক্ রক্ত, আমি খাব। [জল পান করিলেন] উঃ বাঁচলুম···যাও দাসী···আমায় বিরক্ত ক'রো না···আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ! আমি নাচতে পারি···থিয়া তাথৈ···থিয়া তাথৈ···থিয়া তাথৈ···আমি হাসতে পারি···হাঃ হাঃ হাঃ [দক্ষিণের দ্বারে মল্লিকার প্রবেশ]

২

মল্লিকা ॥ দাসী !

দাসী ॥ কি ঠাকরুণ !

রাণী ॥ [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন—মল্লিকার স্বর শুনিয়া উঠিয় দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে মল্লিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন]

মল্লিকা ॥ আমি কি এখন রাণীমার সম্মুখে আসতে পারি ?

রাণী ॥ [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সভয়ে] না-না-না কথ্‌খনো না—[মল্লিকার প্রতি এক হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্য হস্তে তাঁহার চোখমুখ আবৃত করিলেন]

মল্লিকা ॥ —কিন্তু, না এসেও যে পারি না মা···

রাণী । [তদ্রূপ অবস্থাতেই]—দূর হও তুমি···

মল্লিকা ॥ আমি তাকে নিয়ে এসেছি···

রাণী ॥ [বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া]—দাসী ! শুনে যা [দাসী নিকটে আসিল] শোন্‌···[কাণে কাণে কি কহিলেন] [দাসী মল্লিকার পাশে যাইয়া দরজাপথে উঁকি দিয়া কি দেখিল···ও পরক্ষণেই রাণীর নিকট ছুটিয় গেল···] [পরিপূর্ণ ব্যাকুলতায়] কে ? ও দাসী ?

দাসী ॥ শেখর···

রাণী ॥ [রাগিয়া উঠিয়া, সপদদাপে] কোন্ শেখর···?

দাসী ॥ কুমার ।

রাণী ॥ তার চোখের দিকে চেয়েছিলি ?

দাসী ॥ হাঁ, সেই পদ্মচক্ষু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে···

রাণী ॥ [ছুটিয়া মল্লিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে কুমারকে তুলিয়া আনিয়া তাহাব চক্ষু চুম্বন-বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন]

মল্লিকা ॥ [রাণীব সম্মুখে আসিয়া] ওকে দাসীর কোলে দিন···দাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক । বাইরের ঐ ভেরীবাদ্যে কুমার ভয় পাবেন···

রাণী ॥ যাও মাণিক···দাসীর কোলে ঘুমিয়ে পড়···[দাসীর হস্তে কুমারকে দিলেন । দাসী কুমারকে লইয়া দক্ষিণের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল]—কিন্তু মল্লিকা, একটা কথা···।—জিজ্ঞাসা কর্ত্তে শিউরে উঠ্‌ছি !

মল্লিকা ॥ কি কথা বলুন মা···

রাণী ॥ [সভয়ে, অতি সন্তর্পণে] সে কোথায় ?

মল্লিকা ॥ কে ?

রাণী ॥ কবিশেখর ?

মল্লিকা ॥ তিনি দেশে চলে গেছেন···

রাণী ॥ —চলে গেছে ?

মল্লিকা ॥ হাঁ, আপনাকে তাঁর জন্মের মত বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন···

রাণী ॥ ঘৃণায় হয়তো দেখাটি পর্য্যন্ত করে গেল না,—না ?

মল্লিকা ॥ ও কথা বলবেন না মা···তিনি দেবতা···আপনার পাপ হবে···

রাণী ॥ হুঁ ।—আর সেই ক্রীতদাস ?

মল্লিকা ॥ তিনি তাকে বধ করে তবেই ত কুমারকে রক্ষা করেছেন···। কুমারকে রক্ষা করে আমার হাতে সঁপে দিয়েই তিনি আপনাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করে চলে গেলেন···

রাণী ॥ অর্ঘ্য !

মল্লিকা ॥ হাঁ, অর্ঘ্য । আমি রেখে দিয়েছি ।

রাণী ॥ আমি দেখব·· আমি এখনি তা দেখব···

মল্লিকা ॥ —আসুন ··

[মল্লিকার সঙ্গে রাণী চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অঙ্গনের পথ দিয়া রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন]

রাজা ॥ রাণী !

রাণী ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কি রাজা !

[অঙ্গনে জনতার বিরাট কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল]

রাজা ॥ —রাণী ! বাইরে ঐ উন্মত্ত প্রজাসঙ্ঘ । গুপ্ত-বিদ্রোহ দমন করে এসেছি । কিন্তু ওদের দমন কর তুমি···

বাণী ॥ আমি !

রাজা ॥ হাঁ, তুমি। তাদের এক অভিযোগ আছে।

রাণী কি অভিযোগ···?

রাজা ॥ আর সে অভিযোগ তোমারি বিরুদ্ধে···

রাণী ॥ আমার বিরুদ্ধে!

রাজা ॥ হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে।

রাণী ॥ কিন্তু অভিযোগ শোনবার এই কি সময়?—বেশ! তবু শুনি···দেনা পাওনা না হয় চুকিয়েই যাই···

রাজা ॥ তারা বলে এ রাজ্যে আজকে এই যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে··· এ শুধু আজ রাত্রে এই প্রাসাদে ভগবানের চরণধূলির অমর্য্যাদা করার দরুণ···

রাণী ॥ কি অমর্য্যাদা হয়েছে শুনি···

রাজা ॥ তুমি ভগবানের জ্ঞাতিকন্যা হয়েও তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করনি···। ভগবদ্বংশে তোমার জন্ম···বংশ-গৌরবে তুমি মহামহিমময়ী···! সদাচারের মধ্যে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা···ধর্ম্মক্রিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার—তুমি আমার রাজপুরীর সেই শ্রেষ্ঠ পূজারিণী হয়েও স্বধর্ম্মে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ···

রাণী ॥ —তা আমাকে কি করতে হবে?

রাজা ॥ সেই চবণধূলি তুমি এখন ঐ উন্মত্ত জনসঙ্ঘের ললাটে স্পর্শ করাবে···

রাণী ॥ —[ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাহার পর] কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার এক অভিযোগ আছে · তাব বিচার কর···

বাজা ॥ আমার আপত্তি নেই। কি তোমার অভিযোগ?

রাণী ॥ —ব্যভিচারের অভিযোগ।

রাজা ॥ —কার বিরুদ্ধে?

রাণী ॥ —সুবিচাব পাবো?

রাজা ॥ —কবে না পেয়েছ?

রাণী ॥ —কিন্তু আজ যার নামে অভিযোগ কর্চ্ছি···সে তোমার এক প্রেয়সী ···তাইতেই আশঙ্কা হয়···

রাজা ॥ আমার বিচারকে পক্ষপাত দোষে কলঙ্কিত করেছি···শত্রুতেও তো এ কথা বলে না···

রাণী ॥ তবে শোন রাজা···এই রাজপুরীতে তোমার এক প্রেয়সী রক্ষিতা অতি গুপ্তভাবে আমাদের এই সুখের সংসারকে তার বিরাট ব্যভিচারে কলঙ্কিত করেছে···সে এক দাসীকন্যা কিন্তু সে কথা গোপন রেখে উচ্চকুলজাত বলে তার পরিচয় দিয়ে তোমার অন্তঃপুরে এসেছিল···পরে সে তোমার প্রীতির জন্য, আমাকে দিয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান যা কিছু করিয়েছ···সে সবই করেছে।···ধর্ম্মের, আচারের এত বড় অনিয়ম আমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছিনে···আর সেই জন্যই আজকে ঐ চরণধূলি বিতরণ করবার মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানে আমার হাত ওঠে নি···! রাজা, আমার বিচার কর্ত্তে ছুটে এসেছ···কিন্তু, কর দেখি এইবার তোমার সেই রক্ষিতার বিচার···

রাজা ॥ —কে সে ?

রাণী ॥ —নাম আগে বলব না···আগে দণ্ড উচ্চারণ কর—

রাজা ॥ আমি তার নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করলুম—আজ রাত্রিতেই সে এ নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক···

রাণী ॥ রাজবিধান জয়যুক্ত হোক্। আমি এখনি গিয়ে তাকে তার এই দণ্ড জ্ঞাপন করে আসি—[প্রস্থানোদ্যত···]

রাজা ॥ কিন্তু প্রজাসঙ্ঘ ভগবানের চরণধূলির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে···

রাণী ॥ আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্···শুদ্ধ হোক্···সত্য হোক্···তার পর—

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[বাহিরে প্রজাসঙ্ঘ "ভগবানের চরণ-ধূলি" "ভগবানের চরণ-ধূলি" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল]

রাজা ॥ [একটি আলো লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া আলোটি নিজের সম্মুখে ধরিয়া]—প্রজাগণ !

প্রজাসঙ্ঘ ॥ "রাজা" "রাজা" "চুপ্ চুপ্"—"সকলে চুপ কর" "শোন" ইত্যাদি।

রাজা ॥ প্রসাদের জন্য আর একটু অপেক্ষা কর···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ কেন ?

রাজা ॥ আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—পবিত্র হোক্···

রাজা ॥ শুদ্ধ হোক্···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—শুদ্ধ হোক্···

রাজা ॥ সত্য হোক্···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—সত্য হোক্।

রাজা ॥ তোমরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে অপেক্ষা কর···আমি রাণীকে নিয়ে যাচ্ছি।···বুদ্ধের জয় হোক্···ধর্ম্মের জয় হোক্···সংঘের জয় হোক্···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি···

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে দৃশ্যের অন্তরালে প্রস্থান।
দুর্গে পুনরায় তিনবার ভেরীবাদ্য]

রাজা ॥ ঐ সেই সঙ্কেত···যুবরাজ পুর-প্রবেশ করেছে। দাসী! [দাসীর প্রবেশ] রাণী এলে তাঁকে বলো আমি এখনি ফিরে আসছি···

[বাম দরজা দিয়া প্রস্থান]

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠে দুধের জন্য কাঁদছেন···রাণীমা আসেন না কেন!—ঐ যে—

[দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর প্রবেশ। একমনে অতি সন্তর্পণে তাঁহার হস্তস্থিত স্বর্ণ-পেটিকায় কি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন। পার্শ্বে মল্লিকা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল]

রাণী ॥ [পেটিকা হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই] এই তার অর্ঘ্য?

মল্লিকা ॥ হাঁ, ঐ তাঁর অর্ঘ্য।

রাণী ॥ [মল্লিকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] পদ্মফুল, না?

মল্লিকা ॥ [নীরব রহিল]

রাণী ॥ এই পদ্ম দুটি আমি উপড়ে নিতে চেয়েছিলুম···পারি নি।—আজ সে তা আমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে গেছে···কেন, কেন মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ জানি না মা···

রাণী। ভালো।—না জানা ভালো। জীবনের এই প্রহেলিকা চিরন্তন হয়ে থাক্। চলে আয়···তুই আমার সঙ্গে চলে আয়···এ চোখের দিকে চাইব পরে···,—আগে পবিত্র করি···শুদ্ধ করি···সত্য করি··· [মল্লিকার দেহে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বাম দরজা দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন—এমন সময় দাসী তাঁহাকে ডাক দিল···]

দাসী ॥ মা !

রাণী ॥ [তাহার দিকে না তাকাইয়া] কে মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ দাসী···।

রাণী ॥ কি চায় ?

মল্লিকা ॥ কি চাস দাসী ?

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠেছেন, কাঁদছেন—দুধ চান···

রাণী ॥ [হঠাৎ বিকট হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ দুধ—আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্—শুদ্ধ হোক্···সত্য হোক্···[বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ সচকিত হইয়া হঠাৎ মল্লিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া চকিতে বাম দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

দাসী ॥ [বিস্ময়াস্তে]—এ কি ! রাণীমার আজ হয়েছে কি ! [বাম দরজা-পথে তাকাইয়া রহিল]

[যুবরাজ বিরূধক সহ প্রাঙ্গণের পথে রাজার প্রবেশ]

রাজা ॥ বিরূধক—তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ ?

বিরূধক ॥ না পিতা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। মাতামহ আমাকে খুবই সমাদর করে কপিলাবস্তুতে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কিন্তু, আমার মাতামহীকে দেখতে পেলুম না—শুনলুম তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন—

রাজা ॥ কই, আমরা তো সে খবর পাই নি—

বিরূধক ॥ আমিও তাঁদের সেই কথাই বললুম···উত্তর পেলুম, মা সে খবর পেলে শোকাতুরা হবেন বলে কোশলে তা গোপন রাখা হয়েছে—

রাজা ॥ তার পর ?

বিরূধক ॥ তার পর দেখলুম, রাজপুরীতে আমাকে প্রণাম করবার জন্য আমার বয়ঃকনিষ্ঠেরা কেউ নেই—শুনলুম তারা সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মৃগয়ায় গেছে। তখনো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি—

রাজা ॥ তার পর—

বিরূধক ॥ তার পর কোশলে ফিরে আসবার দিন আমরা হাতীতে উঠেছি··· এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার শয়নকক্ষে আমার মাতৃ-দত্ত অঙ্গুরীয় ফেলে এসেছি···কক্ষে ফিরে গিয়ে দেখি···এক বৃদ্ধা দাসী দুধ-জল দিয়ে আমার সেই কক্ষের যাবতীয় আসবাব ধুয়ে ফেলছে···আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম··· সে আমাকে চিনতে না পেরে বললো, এক দাসীপুত্র,—আমাদের রাজার নাচওয়ালীর নাতি—এই ঘরে বাস করে গেছে···তাই দুধ-জলে এই ঘর ধুয়ে ঘর শুদ্ধ করছি !

রাজা ॥ বিরূধক ! বিরূধক !—সে যে মিথ্যা বলে নি···বা পরিহাস করে নি··· তার প্রমাণ ?

বিরূধক ॥ তখনি আমি ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে রাজপুরীর বাইরে এসে গ্রামে গ্রামে সন্ধান নিলুম। দেখলুম সব শাক্যই এ খবর জানে। তারা বললো "কোশলরাজ তলোয়ালের জোরে শাক্যবংশের মেয়ে বিয়ে করে কুলীন হবার ফন্দী এঁটেছিলেন···একটা নাচওয়ালীর মেয়ে দিয়ে তাকে খুব ঠকানো গেছে···"

রাজা ॥ এতদূর ! এতদূর !

বিরূধক ॥ —আমিও তখনি তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলুম, "ঐ দুধ-জল আমি শাক্যদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে ফেলব। মিথ্যাবাদী শঠদের রক্ত দিয়ে ঐ মিথ্যা পুরীকে সত্য আর শুদ্ধ কর্ব্ব।"

রাজা ॥ —কিন্তু, আমি ভাবছি রাণীর কথা। মিথ্যা মূর্ত্তিমতী হয়ে একদিন

নয়, হুদিন নয়, এই ষোলটি বছর আমার চোখে ধূলি দিয়ে আছে! অথচ আজ—এখনি একটি পুরনারীর বিরুদ্ধে সে ঠিক এমনি এক অভিযোগ এনে নিজে তাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে গেছে—স্পর্দ্ধা তার!—দাসী, কোথায় সে···ডাকো তাকে···

[বাম দরজা দিয়া দাসীর প্রস্থান]

বিরূধক॥ —ঐ নির্ব্বাসন দণ্ড তাকে দিন···আজই···এই মুহূর্ত্তে—

রাজা॥ —অবশ্য দেব, অবশ্য দেব—

বিরূধক॥ অন্য শাক্যদের ভার নিলুম আমি। জানেন পিতা, পুর-প্রবেশ করেই আমি সেই শঠকুলচূড়ামণি শাক্যমুনি বুদ্ধের আশ্রম শাক্যের রক্তে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে এসেছি···হত্যাকাণ্ড হয়তো এতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে···

রাজা॥ ···না না···সে কি করেছ!—ভগবান যে স্বয়ং শাক্য—

বিরূধক॥ তাঁর ছিন্ন মস্তক আমি আজ রাত্রেই স্বর্ণ-পাত্রে নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছি···

রাজা॥ না···না···সে হয় না, সে হবে না···

বিরূধক॥ —অবশ্য হবে।—সেই হবে আমার প্রথম ও প্রধান গৌরব···

রাজা॥ আগে রাণীর নির্ব্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থা কর রাজপুত্র···তার পর—

[বাম দরজা-পথে মল্লিকার প্রবেশ]

এই যে মল্লিকা!—রাণী কোথায় শীঘ্র বল···

মল্লিকা॥ তিনি রাজপুরী থেকে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধের আশ্রমে চিরপ্রস্থান করেছেন—

রাজা॥ —আমি তো এখনো তার ওপর সে দণ্ড বিধান করি নি···

মল্লিকা॥ আপনি বহু পূর্ব্বেই, স্বয়ং তাঁকে সে দণ্ড দান করেছেন—

রাজা॥ কি রকম!

মল্লিকা॥ তিনি আপনার নিকট এক পুরনারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন···

রাজা॥ —তবে সে পুরনারী রাণী স্বয়ং!

[মল্লিকা নীরব রহিল]

এখন বুঝেছি কি নিদারুণ ঝড় এই ষোলটি বছর তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—বিরূধক! বিরূধক! সে শেষে রাত্রে ঘুমাতেও পার্ত্তো না···আমি আজ বুঝতে পার্ছি তার সেই অন্তর্যুদ্ধের তীব্রতা।—কিন্তু সে তবে সেই যুদ্ধে শেষকালে জয়লাভ করেছিল।—বিরূধক! আর আমার ক্ষোভ নেই—আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্ব!

বিরূধক॥ —নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ এনে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছেন!···পিতা, আমি আশ্রমে চললুম···আমার সেই সত্যকুলজাতা···সেই সত্যাশ্রয়ী মাকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর সেই রাজলক্ষ্মীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব···

[অঙ্গনের দ্বারপথে প্রতিহারীর প্রবেশ]

কি সংবাদ?

প্রতিহারী॥ [অভিবাদনান্তে] যুবরাজের এক দেহরক্ষী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মস্তক নিয়ে যুবরাজের দর্শন-প্রার্থী—

বিরূধক॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সেই শাক্য-মুনির ছিন্ন মস্তক!—যাও, অবিলম্বে তাকে এখানে উপস্থিত কর—

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান]

* * *

[সহসা ঝড় উঠিল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল]

রাজা॥ বিরূধক! বিরূধক!—ঝড় উঠেছে···এ তো প্রলয়ের কালবৈশাখী নয়? ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···ঐ—ঐ—

[প্রাঙ্গণে বজ্রপাত হইল]

উঃ উঃ [চোখ বুজিয়া কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

[দেহরক্ষীর প্রবেশ—হাতে তাহার এক স্বর্ণথালা…তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক।
আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল—* * *]

বিরূধক ॥ [বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—]

এ কি! মা!…আমার মা!

[দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া আসিলেন]

দেহরক্ষী ॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা…

বিরূধক ॥ —আশ্রমের শেষ হত্যা…

মা! মা! [সেই ছিন্ন মস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল]

[ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩২]

বহুরূপী

[মৃত্যুশয্যায় শয়ান সুধীর রায়। সুধীর অচেতন। পার্শ্বে ডাক্তার, শিয়রে সুধীরের স্ত্রী তরলা। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে]

তরলা ॥ কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার ॥ শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন কারণেই যেন মনে এতটুকু আঘাত উনি না পান···ওঁর খেয়াল মত চলবেন, যখন যা চান···দেবেন···।

তরলা ॥ যখনি জ্ঞান হচ্ছে তখনি শুধু জিজ্ঞেস করছেন, মা কই, খোকা কোথায় ? রাণীকে আসতে লিখেছ ? বিবজা কি ভুলেই গেল ?···এই সব।··· কি হবে ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার ॥ খোকাকে নিয়ে আপনার শাশুড়ীর আজ রাত্রেই তো পৌঁছবার কথা ছিল···এখনো এলেন না কেন ?

তরলা ॥ ট্রেণ ফেল হয়েছেন হয় তো।··কিন্তু সে কথা ওঁকে এখনো জানাইনি।···রাত দুটোর গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছি।

ডাক্তার। খোকা বুঝি আপনাদের ঐ একই সন্তান ?

তরলা ॥ হাঁ ডাক্তার বাবু, সে তার ঠাকুরমাব সঙ্গে দেশের বাড়ীতে থেকে পাঠশালায় পড়াশুনো করে, ওরা দুজনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। শাশুড়ীও বাড়ী ছেড়ে এখানে আসতে চান না···দেশে গৃহদেবতা ঠাকুর-সেবা নিয়ে পড়ে আছেন !

ডাক্তার ॥ রাণী কে ?

তরলা ॥ ওঁর দেশের বাড়ীর এক প্রতিবাসিনীর মেয়ে। সে অনেক কথা।··· ছোটবেলার খেলার সাথী।···দুজনে বর-কনে সেজে খেলতেন।···কিন্তু···পরে আর

সত্যি করে বিয়ে হওয়া ঘটল না···।···রাণীর বাবা টাকার মায়ায় ভুলে এক বুড়ো জমিদারের হাতে রাণীকে সঁপে দিলেন।···আর···উনি রাগ করে বিনা পণে বিনা যৌতুকে এক কালো মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আমি ওঁর সেই বৌ!···কিন্তু সেই রাণী বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল।···উনি চাকরি নিয়ে পাটনায় চলে এলেন।

ডাক্তার ॥ আর ঐ বিরজা?

তরলা ॥ জানিনে ডাক্তার বাবু, জানিনে···[ক্ষণেক থামিয়া]···জানি ডাক্তার বাবু, জানি!···কিন্তু ঐ যে···আবার বুঝি জ্ঞান হচ্ছে···

সুধীর ॥ তরলা!

তরলা ॥ [সুধীরের হাত দুখানি হাতে লইয়া সস্নেহে]···কি?

সুধীর ॥ ও কে?

তরলা ॥ ডাক্তার বাবু।

সুধীর ॥ আমি ওষুধ খাবো না।···ডাক্তার, তোমার ওষুধ আমি ফেলে দিয়েছি। তুমি এখান থেকে পালাও বলছি···

ডাক্তার ॥ [বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন]

সুধীর ॥ মাকে ডাক···

তরলা ॥ এখনো তো দুটো বাজে নি···

সুধীর ॥ কত বাকী?

তরলা ॥ আরো আধ ঘণ্টা।···এখন না হয় ঘুমোও···ঘুম থেকে জেগে উঠলেই তাঁদের দেখতে পাবে···তাঁরা এলেন বলে···

সুধীর ॥ কারা?

তরলা ॥ মা আর খোকা···খোকার কথাটি বুঝি ভুলেই গেছ?

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা···আমার পাজী খোকা···আসবে?···সেও আসবে?

তরলা ॥ বাঃ···সে আসবে না? বল কি?

সুধীর ॥ ওরে···সে যদি ট্রেনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চল্‌তি

গাড়ী থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায়!···সে যেন আসে না···সে যেন আসে না···না···না···না···

তরলা ॥ মা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছেন···কোনো ভয় নেই···। তাকে কিন্তু চুমু খাবো আগে···আমি···হাঁ—

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা···আমার পাজী খোকা···ছুটে এসে লাফিয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে! তুমি তখন মাকে প্রণাম করতে ব্যস্ত থাকবে··· পাবে না···পাবে না···খোকাকে পাবে না!

তরলা ॥ ···কিন্তু মাকে তবে আমিই আগে প্রণাম করছি···তুমি পাচ্ছ না···

সুধীর ॥ ···সেই ফাঁকে, যদি রাণী আসে···তবে, সেই ফাঁকে···রাণী আমারি কাছে আগে চলে আসবে···আসবে কি না?···

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন]

সুধীর ॥ কি?···রাণী কি তবে আসছে না?

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন]

সুধীর ॥ রাণীকে তবে আসতে লেখো নি?

তরলা ॥ লিখেছি।

সুধীর ॥ তবে সে আসবে। আসবে, সে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। আসবেই আসবে। হাঁ···সে···না এসে পারে না!

তরলা ॥ একটু বেদানার রস দিই?

সুধীর ॥ ওরে রাণী···ঘোষেদের বাগানে লিচু যা পেকেছে···!···দেখলে তোর মুখ জলে ভরে যাবে···কথাটি কইতে পার্ব্বি নে···আয়···আয়···চলে আয়···

তরলা ॥ [পাখা করিতে লাগিলেন]

সুধীর ॥ আর তোর জন্যে এই জামরুল এনেছি।···পদ্ম? আজ পারি নি ভাই···কাল যাব। দীঘির মাঝখানে নীলপদ্ম আছে স্বপ্ন দেখেছি···নিবি ভাই নিবি? যাবি ভাই যাবি?···আয় রাণী আয়! চল রাণী চল! ছুটে আ—য়! ছুটে আ—য়! [বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িলেন]

ডাক্তার ॥ [কক্ষান্তর হইতে প্রবেশ করিয়া] ঘুমিয়ে?

তরলা ॥ বুঝছিনে !

ডাক্তার ॥ থাক্। কিন্তু…আপনি একলাটি আর কত রাত জেগে রইবেন ?

তরলা ॥ এ তো আজ নতুন নয় ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার ॥ দুটো বাজতেও তো আর বিলম্ব নেই…যাব আমি ষ্টেশনে ?

তরলা ॥ কেউ গেলে ভালো হ'ত…, কিন্তু আপনাকে তাই বলে যেতে বলতে পারি নে…যেতে দিতেও পারি নে…

ডাক্তার ॥ তার মানে আপনার বড় ঈর্ষা। আপনার স্বামীকে আর কেউ সেবা করুক…বা তার বিপদে তার কাজে লাগুক এটা আপনি সহ্য কর্ত্তে পারেন না !…কিন্তু দেখুন…সুধীর আমার প্রতিবাসী বন্ধু…আপনার সঙ্কোচের কোনই আবশ্যক নেই।…আমি চললুম।…আলোটা কমিয়ে দিন…ওর চোখে ওটা বড্ড বেশী লাগে। নমস্কার—

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন।…তরলা উঠিয়া প্রদীপটি খুব ছোট করিয়া দূরে রাখিয়া আসিলেন। একটা জানালা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না মেঝেতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আলোছায়ার আবছায়াতে মৃত্যু-শয্যা রহস্যময় হইয়া উঠিল।…তরলা আর একটা জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানটা অন্ধকার। তরলাকে ভালো করিয়া দেখাই যাইতেছিল না]

সুধীর ॥ কে…বিরজা ?…এসেছ ?…এসো !…কিন্তু…কেন এলে তুমি ?…তরী যে এখনো ঘুমোয় নি !…তার ওপর মা এসেছেন !…পালাও তুমি পালাও !…না গো না…ভালোবাসি…সত্যি…এই মর্ত্তে বসেও সে কথা বলছি।…কিন্তু…তরী কি বলবে…কি ?…চুমো ?…শুধু একটি চুমো ?…তবে চট্ করে চলে এস…তরী ও-ঘরে রয়েছে…এই ফাঁকে…এই ফাঁকে…দাও…একটি চুমো দাও…মরণের পথে ঐ একটি চুমো আমার বড় ভালো লাগবে…হাঁ…আমার চোখে তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটে একটি ছোট্ট চুমো দাও…

[চুম্বন শব্দ] আঃ…আঃ…আমার চোখ জুড়িয়ে গেল !…একি ! তুমি কি কাঁদছ ?…কেঁদো না…শব্দ করো না…পালাও…পালাও…শীগ্‌গীর পালাও…

[ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল]

…ঐ ছুটো বাজল ! মা ! মা !…কোথায় আমার মা ! ওগো আমার মা !… কোথায় মা, তুমি কোথায় ? শীগ্‌গীর এস কোলে নাও আমায়…আমার হয়ে এসেছে…বড় জ্বালা…কোথায় তুমি !…একটি চুমো দাও মা…একটি চুমো দাও। কই ?…কোথায় তুমি ?…আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে !…গেলুম মা, গেলুম ! তোমার একটি চুমো পেলে আমি বেঁচে যাব…আবার বেঁচে উঠব আবার সারব…আবার হাসবো…আবার আপিস কর্ব্ব…আবার টাকা রোজগার কর্ব্ব… আবার তোমায় পায়ে টাকা ঢেলে দেব। কোথায় তুমি…তবে কি তুমি আসো নি !…তবে কি…তবে কি…আমি স্বপ্ন দেখছি…ও—হো—হো…কোথায় তুমি… কোথায় তোমার হাত দুখানি…কোথায় তোমার মুখখানি…কোথায় তোমার ঠোঁট্ দুটি…কোথায় তোমার আদরের একটি চুমো ? [চুম্বন শব্দ] আঃ…ওগো আমার লক্ষ্মী মা ! একটি চুমু দিয়ে…তুমি আমায় আজ বাঁচালে…আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! আমার ঘুম পাচ্ছে…খোকা আসে নি ?…দেখো…তাকে সামলে রেখো… ঘরের নিচেই পুকুর…কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে !…ত—র—লা ! আমি ঘুমুলুম…তুমি শুধু খোকাকে নিয়েই থেকো না—মার কাছে এস…ওরে খো—কা !…তুই এখন ঘু—মি—য়ে পড়…কাল সকালে জেগে দুজনে গল্প করব…বাঘের গল্প…চোরের গল্প…তেপান্তরের মাঠে ডাকাতের গল্প—সাত ভাই চম্পার গল্প…আমার রাণীর গল্প…সেই ঘু—মি—য়ে প—ড়া রা—জ— রাণীর গ—ল্প ! [আবার অচেতন হইলেন]

* * * *

[দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। আলো বাড়াইয়া দিয়া তরলা দরজা খুলিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকিলেন]

তরলা ॥ খোকা কই ? মা কই ?

ডাক্তার ॥ —বলছি…

তরলা ॥ বলুন…শীগ্‌গীর বলুন—

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ আপনি বলুন শীগগীর···তাঁরা কোথায় ?

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ জেগেছিলেন···কিন্তু···তবে কি তাঁরা এ ট্রেণেও আসেন নি ?

ডাক্তার ॥ সুধীর জেগে কি তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?

তরলা ॥ ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু !

ডাক্তার ॥ তারা আসে নি !

তরলা ॥ আসেন নি ?

ডাক্তার ॥ না—!

তরলা ॥ সর্ব্বনাশ ! তবে উপায় ? এবার জাগলে···কিম্বা···ভোর হলে··· কি বলব ?···আমি কি বলব ?

ডাক্তার ॥ এর পরের গাড়ী কটায় ?

তরলা ॥ সকাল বেলায় !···ডাক্তার বাবু···আপনি এই মুহূর্ত্তে আপনার বাড়ী ফিরে যান ।···আমার কথা রাখুন ।···যদি আপনার রোগীকে অন্ততঃ এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান···তবে আপনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যান···

ডাক্তার ॥ সে কি !···আপনি একলা !

তরলা ॥ হাঁ···আমি একলা···একাকী···ঐ মুমূর্ষুকে শান্তি দিতে পার্ব্ব··· আপনি তাতে বাধা দেবেন না···আপনি যান···আমি আলো নিবিয়ে দিলুম··· [দীপ নির্ব্বাণ]

ডাক্তার ॥ [আর তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন। তরলা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিলেন]

সুধীর ॥ মা !

[উত্তর হইল "এই যে আমি"]

[ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৩৪]

লক্ষহীরা

চন্দনদত্ত ॥ —এই তার অভ্যর্থনা কক্ষ।

অদিতি ॥ অথচ আজ আমি এই প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে কতবারই না যাতায়াত করেছি! ···আমার মনেই হয়নি, আমি ধারণাই কর্ত্তে পারিনি যে এ প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ না হয়ে···

চন্দন দত্ত ॥ —কোন বার-বিলাসিনীর প্রণয়ের পণ্যশালা হতে পারে!

অদিতি ॥ আমি ভেবেছিলুম এ রাজপ্রাসাদ!

চন্দন দত্ত ॥ —বিদেশী সকলেই এমনি ভুল করেছে। রাজপ্রাসাদের চাইতেও এ প্রাসাদ সুন্দর। এ প্রাসাদ অনুপম। ···এই প্রাসাদ দেখে রাজার হিংসা হওয়াতে···রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজা এই প্রাসাদেই দিবস যামিনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

অদিতি ॥ ···রাজ কার্য্য?

চন্দন দত্ত ॥ —এই সুন্দরীর চরণপদ্মে অর্ঘ্যদান। রাজার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই সুন্দরী।

অদিতি ॥ পৃথিবী সুন্দর হ'ত, আরো সুন্দর হ'ত···সংসার সার্থক হ'ত, যদি এই প্রেম বিবাহের ফুলটি হয়ে ফুটে উঠ্‌ত।

চন্দন দত্ত ॥ ···পৃথিবী সুন্দর হয়নি, আরো কুৎসিত হয়েছিল, সংসার অসার্থক হ'ল···"যে দিন এই প্রেম বিবাহের বন্ধনে কারারুদ্ধ হ'ল!"—এই নারী এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। তার নিজের মুখেই শুনেছি সে যুগে যুগে মানবের প্রিয়া, জায়া নয়। সে কথা যাক।···তোমার স্বামী কি ঘুমিয়েই আছেন?

অদিতি ॥ —হাঁ ঘুমিয়েই রয়েছেন।…কেন, লক্ষহীরা দেবীর কি দর্শনদানের সময় উপস্থিত ?

চন্দন দত্ত ॥ না এখনও প্রাসাদে ফিরে আসেনি। সে যখন ফিরবে, রাজপথ জয়ঘণ্টায় মুখরিত হবে। সে প্রত্যহ রাজার সঙ্গে বৈকালে নদীবক্ষে নৌকা বিহারে যায়। ঐ প্রাসাদশীর্ষেও প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল !…ঐ সন্ধ্যাদীপের আলোতে প্রাসাদগাত্রের লক্ষ হীরা ঝল্‌মল্‌ কর্চ্ছে !…জানো, এই লক্ষ হীরার প্রাসাদ থেকেই এর অধিশ্বরীর নাম লক্ষহীরা দেবী ?

অদিতি ॥ —হীরা আজ আমি এই প্রথম দেখলুম !

চন্দন দত্ত ॥ অদিতি ! তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তুমি তোমার রুগ্ন স্বামীকে সারাটি দিন পিঠে বহন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ ! ঝোলাটি না হয় এখন নামাও…

অদিতি ॥ …না।…তাতে তিনি জেগে উঠতে পারেন !…এখন আর অনর্থক জাগাবো না। জাগ্‌লেই তাঁর যন্ত্রণার আগুন জ্বলে উঠ্‌বে…ব্যথাটা আজ বেশী বলছিলেন, আজ সারাটি দিন বড়ই কষ্ট ভোগ করেছেন।

চন্দন দত্ত ॥ —কিন্তু তোমারো বিশ্রাম আবশ্যক ভগিনি !

অদিতি ॥ …উনি ঘুমুচ্ছেন !…আমার এত ভালো লাগছে !…ঘুমের মধ্যে ওঁর আর কোন ব্যথা বোধ নাই !…শুধু এই শান্তিটুকু উনি পান সেই জন্যেই আমি কত কামনা করি !…ওঁর এই শান্তিতে আমার মনে হচ্ছে আমিই যেন ঘুমিয়ে পড়েছি !…আমার আর এতটুকু অবসাদ নেই !…আমি যেন স্বপ্ন দেখছি লক্ষহীরা দেবী ওঁকে গ্রহণ করেছেন !…ওঁর ঘুমন্ত মুখে কি হাসি ফুটে উঠেছে ?…আজ আমার এত ভালো লাগছে !

চন্দন দত্ত ॥ ঘুমিয়ে থাকা ভালো।…স্বপ্ন দেখা আরো ভালো !…আমার ঘুম হয় না !…কতকাল স্বপ্ন দেখি না !…তোমার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ, ঘা… পুঁজ।…আমারো মনে অমনি জ্বালা !…কিন্তু, আমার চোখে ঘুম নেই !

অদিতি ॥ আমিও সারাটি দিন সারাটি রাত্রি প্রায় চেয়েই থাকি !…চেয়ে না থাক্‌লে মাছি পোকার দৌরাত্ম্য থেকে ওঁকে রক্ষা কর্ত্তে পারি না ! হাঁ, আমি

ওঁর পানে চেয়ে রাত কাটাই !···সে আমার বেশ লাগে···আমি ওঁর ঘুম মনে মনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি !···উনি তা পারেন না। ঘুম যে সুন্দর ; সে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বোঝা যায় ?

চন্দন দত্ত ॥ গুরুদেব যখন তোমাদের ভার আমার হাতে সঁপে দিলেন, তখন তোমার পরিচয়ে বলেছিলেন তুমি দেবী। আমি আজ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন করলুম !

অদিতি ॥ আমি দেবী নই। আমিও তাঁরই মন্ত্রশিষ্যা।···আপনি আমার গুরু ভ্রাতা।···দেবীই যদি হতুম, তবে কি উনি এত কষ্ট পান ?···দেবীই যদি হতুম, তবে আমার মনের চক্ষুতে ওঁর যে রূপটি দেখে আমি মুগ্ধ, সেই রূপটি ওঁর দেহে ফুটিয়ে বল্‌তুম—দেখ তুমি কি সুন্দর ! লক্ষহীরা দেবীকে দেখে উনি পাগল হ'য়েছেন, আমার দেওয়া ওঁর সে রূপ দেখ্‌লে এই লক্ষহীরা দেবীই আজকে ওঁর জন্যে আমারি মত পাগল হতেন !···হাঁ,···হতেন ; আমি জোর গলাতেই বলতে পারি।···না, না আমি দেবী নই। দেবী হ'লে কি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে, দাসীবৃত্তি করে কোনদিন না খেয়ে, কোনদিন শুধু জল খেয়ে লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী শত মুদ্রা সংগ্রহ কর্ত্তে হয় ?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ···বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ।···আমার বড় ভয় হচ্ছে !···আমি শুধু প্রার্থনা কচ্ছি তোমার স্বামীর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তোমার এই দেহপাত সফল হোক্···সার্থক হোক্।···

অদিতি ॥ ওঁর খেয়াল !···কিন্তু খেয়াল তো আমারো কম নয় ! শত স্বর্ণ মুদ্রা ওঁকে লক্ষহীরা দেবীর চরণে দর্শনী দিতে হবে···সে তো আমার আঁচলেই বাঁধা রয়েছে !···এলেই খুলে দেব।···কিন্তু, তারপর কি দেখ্‌ব !···দেখ্‌ব, উনি রোগ যন্ত্রণা ভুলে গেছেন ! মনের আনন্দে লক্ষহীরা দেবীর গান শুনছেন ! তাঁর নৃত্য দেখছেন ! এক রাত্রির জন্য আমার ঐ দরিদ্রনারায়ণ রাজরাজেশ্বরীর সেবা পাচ্ছেন !···আনন্দে ওঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে !···আর আমি ?··· আমি চুরি করে দেবতার সেই আরতি দেখ্‌ব !

চন্দন দত্ত ॥ ···কিন্তু অদিতি ! আমার বড় ভয় হচ্ছে !···ভগবান তোমার এই অপূর্ব্ব সেবা, অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠা জয়যুক্ত করুন !

অদিতি ॥ আপনি বারবার ঐ সেবা আর নিষ্ঠার কথা বলে আমাকে অবাক্ করছেন !···শুনুন ! আপনি এই বয়সেই সংসার-বিরাগী হয়ে ভালো করেন নি ! আপনি বিবাহ কর্লে আমারি মত আর একটি নারী সেবা করে সুখী হ'ত, ভালবেসে ধন্য হ'ত ।

চন্দন দত্ত ॥ আমার কথা থাক্ অদিতি !···হাঁ সে থাক্ ।···তুমি শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করেছ বল্লে । কিন্তু লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী এক শত এক স্বর্ণ মুদ্রা ।

অদিতি ॥ সে কি ?···তবে উপায় ?···আমি যে শত স্বর্ণ মুদ্রার কথাই শুনেছিলুম !

চন্দন দত্ত ॥ ভুল শুনেছ ।

অদিতি ॥ —সর্ব্বনাশ !

চন্দন দত্ত ॥ ···কিন্তু আমি সে কথা ভাবছিনে !···আমি ভাবছি—

অদিতি ॥ —বেশ, আমি একশত এক স্বর্ণ মুদ্রাই দেব । আমি আর এক স্বর্ণ মুদ্রা এখনই নিয়ে আসছি···হাঁ আমি আনতে পার্ব্ব···সেই সজ্জাকরের কথায় আমি তখন সম্মত হইনি···এখন হ'ব ।···আপনি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যথাশীঘ্র ফিরে আসব । সেই সজ্জাকর আমাকে এক স্বর্ণ মুদ্রা দেবে···

চন্দন দত্ত ॥ শোন অদিতি—

অদিতি ॥ না, আর কোন কথা নয় ।

চন্দন দত্ত ॥ ···চলে গেল !···পতিভক্তির ঐ গঙ্গাকে গোমুখীতে রুদ্ধ করা দেবতারও অসাধ্য । ···পৃথিবী ধন্য হোক্···সংসার পবিত্র হোক···সমাজ শিক্ষা লাভ করুক ! কিন্তু কী আশা এই নারীর !···অথবা দুরাশা ?···লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দর্শনী দিলেও সেই যৌবন-মদ-মত্তা লক্ষহীরা ঐ কুষ্ঠরোগীকে দর্শন দান করবে না । ···আমি তাকে চিনি, জানি ।···কিন্তু তবু গুরুর আদেশ—, ···ঐ তার জয়ঘণ্টার জয়ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে !···ঐ···ঐ···সে ! পাশে রাজা !···ঐ···রাজা সোপান পথে দ্বিতলে বিশ্রাম-কক্ষে উঠে গেলেন !···সে একা এখানে আসছে··· কতদিন পরে আজ তাকে দেখছি !···আজো তার ঐ রূপচ্ছবি আমাকে মুগ্ধ কর্ছে !

কি অপরূপ ঐ রূপ !···কিন্তু, কিন্তু, আজ তার মুখখানি অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে আবৃত কেন ?···না, না,···মুখের ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর দেবী !

লক্ষহীরা ॥ —জানি, এ স্পর্দ্ধা শুধু এক তোমারি হ'তে পারে।···কিন্তু সন্ন্যাসীপ্রবর, হে যোগেশ্বর ! সুন্দরীর মুখ-পদ্ম দর্শন সন্ন্যাসের কোন স্তর ? যোগের কোন অঙ্গ ?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে···

লক্ষহীরা ॥ কিন্তু সে আজ নয়···

চন্দন দত্ত ॥ আমি সেদিন না এসে আজ এলুম !

লক্ষহীরা ॥ আজ আর তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু তোমাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে !

লক্ষহীরা ॥ শোন ! আমি তোমার উপদেশ শুনব না। আলাপ কর্ত্তে পার, কিন্তু দোহাই—কোন উপদেশ দিও না।

চন্দন দত্ত ॥ ···এসো, গল্প করি···

লক্ষহীরা ॥ সে মন্দ হবে না, কিন্তু সাবধান···নীতিমূলক গল্প করছ বুঝলেই আমি শপথ করে বলছি—উপর থেকে রাজাকে নিচে আনিয়ে, তোমারি সম্মুখে দুইজনে এক পাত্রে সুরাপান ক'রে—মাতাল হব ! হাঁ···?

চন্দন দত্ত ॥ আমি তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।···কিন্তু তোমার স্বরে সে উচ্ছ্বাস কই ? তোমার চোখে মুখে অবসাদের আভাস পাচ্ছি !···কেন ?··· কুশলে আছ তো ?

লক্ষহীরা ॥ ···অর্থাৎ···দোকানদারি কেমন চলছে, এই কথাতো ?

চন্দন দত্ত ॥ দোকানদারি !

লক্ষহীরা ॥ সাধু ভাষায়, গণিকা বৃত্তি।

চন্দন দত্ত ॥ তাতে তোমার জয়জয়কার ! প্রাসাদগাত্রে ঐ লক্ষহীরা তার জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন, আর উপরে প্রতীক্ষমান রাজা তার জয়-নিশান !···কিন্তু আমি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি ! আমি তোমার কুশল প্রশ্ন করেছিলুম।

লক্ষহীরা ॥ গণিকার জন্য অতখানি দরদ কি সংসার-বিরাগী সাধুর শোভা পায় ?

চন্দন দত্ত ॥ ভেবে দেখ···একদিন তুমি আমার···একান্তই আমার ছিলে। তোমার আত্মা, তোমার সত্ত্বা, তোমার দেহমনের সকল সম্পদ আমার অধিকারে ছিল। পুরোহিত অগ্নি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করেছিল—আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী!

লক্ষহীরা ॥ মানুষ তখনো সভ্য হয়নি। অসভ্যদের মধ্যেই 'স্ত্রী' পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। বিবাহের অনুষ্ঠান পুরুষের সেই সম্পত্তি-লাভ ঘোষণা কর্ত্ত। এখনকার বিবাহ আদিম যুগের সেই অসভ্য প্রথার স্মৃতি।

চন্দন দত্ত ॥ তবু ভালো, সেই স্মৃতিটুকুও বিস্মৃত হওনি!

লক্ষহীরা ॥ না, তা হইনি বটে!···ঐ স্মৃতিটুকুর মূল্য আছে। ঐ স্মৃতিটুকু আছে বলেই আজ পরিমাণ কর্ত্তে পারি যুগ থেকে যুগান্তরে আমরা কতখানি এগিয়ে চলেছি! কিন্তু আমি আর পার্চ্ছিনে, বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে।···বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে,···এই জ্যোৎস্নায় আমার পদ্ম-কুঞ্জ স্নিগ্ধ শান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে!··· যাবে?

চন্দন দত্ত ॥ না।

লক্ষহীরা ॥ কোন আবেদন আছে?

চন্দন দত্ত ॥ আছে।

লক্ষহীরা ॥ নিবেদন কর···

চন্দন দত্ত ॥ এক হতভাগ্য তোমার রূপ দেখে মোহার্ত্ত হয়েছে।

লক্ষহীরা ॥ লক্ষহীরার রূপ দেখে লক্ষ হতভাগ্য কামার্ত্ত হয়েছে!

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু এর বিশেষত্ব আছে···

লক্ষহীরা ॥ উন্মত্ততা? না···বিকার? না···আত্মহত্যার জন্য অভিমানে ছুরিকা গ্রহণ?···কি?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি তা শুনলে শিউরে উঠবে!

লক্ষহীরা ॥ কি?···বিষ ভক্ষণ? না···জলে ঝম্প প্রদান?

চন্দন দত্ত ॥ সে কুষ্ঠ রোগী। গলিত কুষ্ঠ! সর্ব্বাঙ্গে ঘা, পুঁজ!

লক্ষহীরা ॥ হাঁ···, বিশেষত্ব আছে বটে! তা আমাকে কি কর্ত্তে হবে?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি ঐ হতভাগ্যকে গ্রহণ ক'রে আদরে আলিঙ্গনে অভিষিক্ত করবে।

লক্ষহীরা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

চন্দন দত্ত ॥ কল্পনা কর এ সেই আদিম অসভ্যযুগ। মানুষ তখন কামকে জয় কর্ত্তে শেখেনি। মনে কর আমি স্বামী তুমি আমার স্ত্রী। আমার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়েছে···নারী !···তখন ?

লক্ষহীরা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

চন্দন দত্ত। ও অট্টহাস্য শ্মশানেই শোভা পায় নারী ! যখন শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, তখন আমি নিজেই ঐ অট্টহাস্যে শৃগাল শকুনীকে চমকিত করে মড়ার মাথার খুলি কেড়ে নি।···সে যাক্ !···মণিমালিনীকে মনে পড়ে ?

লক্ষহীরা ॥ একদিন সে আমার প্রতিদ্বন্দিনী ছিল বটে ! যোগ্যা প্রতিদ্বন্দিনীই ছিল !

চন্দন দত্ত ॥ রাজা তাকে কি ভালই না বেসেছিল ! তার প্রেমার্ত্ত হয়ে কত কবি—কত কাব্যই না রচনা করেছে !

লক্ষহীরা ॥ আমরা রয়েছি বলেই তো কবিরা বেঁচে আছে !

চন্দন দত্ত ॥ একদিন রাজা লক্ষ্য করলেন তাঁর প্রিয়তমা সেই প্রেয়সীর কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত !

লক্ষহীরা ॥ চন্দন দত্ত ! তারপব ?

চন্দন দত্ত ॥ তার পরদিনই লোলচর্ম্ম মণিমালিনীর সকল মণিমাণিক্য আঁধার করে নগরীর আর এক কুটিরে লক্ষহীরা জ্বলে উঠল। সেই থেকে তুমি "লক্ষহীরা !"

লক্ষহীরা ॥ আমার সুরাপানের সময় হয়েছে—আমাকে ক্ষমা কর···

চন্দন দত্ত ॥ কিছুদিন পরে, আমি শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখলুম একটি গলিত শব নিয়ে শৃগাল আর শকুনিতে কি নিদারুণ যুদ্ধ ! সহসা মনে পড়ে গেল—তোমাদের নিয়ে মানুষে মানুষে যুগে যুগে এমনি লড়াই-ই হয়েছে বটে !···যাক্··· খোঁজ নিয়ে পরে জানতে পারলুম···মণিমালিনী···

লক্ষহীরা ॥ সুরা ! সুরা ! সুরা আনো, পেয়ালা আনো !

চন্দন দত্ত ॥ শুনলুম বারবিলাসিনী বারবণিতা মণিমালিনীর শব দাহের জন্য নগরীর লক্ষ নাগরিকের এক নাগরও মোহার্ত্ত বা কামার্ত্ত হয়নি !

লক্ষহীরা ॥ চন্দন দত্ত ! চন্দন দত্ত !

চন্দন দত্ত ॥ হাঁ···, কোন কুষ্ঠ রোগীও না !

লক্ষহীরা ॥ [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] উঃ উঃ [সহসা] হাঃ হাঃ হাঃ···আমি কি মাতাল হয়েছি ! আমি কি পাগল !··· এ যে স্বপ্ন !···দুঃস্বপ্ন ! [কপালের ঘাম মুছিয়া]···কে তুমি ?

চন্দন দত্ত ॥ আমি চন্দন দত্ত। আমি তোমার সেই আদিম অসভ্য যুগের স্বামী।

লক্ষহীরা ॥ সে যুগের স্বামীরা স্ত্রী নিয়ে কি কর্ত্ত ?

চন্দন দত্ত ॥ সম্পত্তিরূপে পরম আদরে রক্ষা কর্ত্ত। ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ কর্ত্ত ! সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবের জয়যাত্রায় সৈন্য সরবরাহ কর্ব্বার জন্য বংশবৃদ্ধি কর্ত্ত, বংশ রক্ষা কর্ত্ত। ভাল বাস্‌তো। জীবন যাত্রার বিষ এবং মধু, সুখ এবং দুঃখ সমভাগে ভাগ করে নিয়ে জীবনযাত্রাকে সহজ সরল সুন্দর কর্ত্ত। পরস্পরের অক্ষমতার দিনে পরস্পরকে সাহায্য কর্ত্ত, সেবা কর্ত্ত, লালন-পালন, ভরণ-পোষণ কর্ত্ত। জরাতে বার্দ্ধ্যকে, এবং মৃত্যুতেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ কর্ত্ত না। তাদের শবদেহ সৎকার কর্ত্তেও লোকের অভাব হত না। মৃত্যুর পরও তাদের জন্য মর্ত্ত্যে চোখের জল পড়তো।

লক্ষহীরা ॥ উপদেশ ! উপদেশ !···তুমি আমাকে তোমার সদুপদেশ শোনাচ্ছ ! আমি আমার শপথ রক্ষা কর্ব্ব। আমি এখনি আমার মদের ভাণ্ডারীকে ডাকৃব···

চন্দন দত্ত ॥ ক্ষণেক অপেক্ষা কর···। শোন নারী, গত বসন্তপূর্ণিমায় তুমি কামদেবের মন্দিরে আলুলায়িত-কুন্তলা হয়ে বেদীমূলে প্রণাম করেছিলে। পাশেই ছিলুম আমি। মুগ্ধনেত্রে আমি তোমার সেই কৃষ্ণ-কেশদাম দর্শন করছিলুম।

লক্ষহীরা ॥ সে তো প্রণাম নয়···সে আমার কৃষ্ণ-কেশদামের বিজ্ঞাপন।··· আমরা ঐ ছলেই ফাঁদ পাতি।···কিন্তু সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে।

চন্দন দত্ত ॥ কেন ?

লক্ষহীরা॥ তুমি আমার পাশে ছিলে আমি জানতুম না। প্রণাম করছি, এমন সময় পাশে এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনলুম। আমি চমকে উঠে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম।—ভাবলুম আর্ত্তনাদ স্বাভাবিক। তবু, এক সুযোগে তোমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। তুমি কিন্তু কারণ বললে না।

চন্দন দত্ত। হাঁ, বলিনি। কিন্তু আজ কি বলব?

লক্ষহীরা॥ বল···

চন্দন দত্ত॥ না, থাক।

লক্ষহীরা॥ আমার লতাকুঞ্জে চারুদত্ত এক মর্ম্মর ঝর্ণা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে সেই ঝর্ণার নৃত্য ইন্দ্রজালেব সৃষ্টি করে। স্বপ্নমধুর সেই দৃশ্য!··· যাবে?

চন্দন দত্ত॥ না, আমি তোমার পরিণাম ভাবছি।

লক্ষহীরা॥ আবার পরিণামের কথা?···না, আমি রাজাকে ডাকি···সুরা আর পানপাত্র আসুক!

চন্দন দত্ত॥ যে মুহূর্ত্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ করবেন সেই মুহূর্ত্তে···

লক্ষহীরা॥ হ্যাঁ, সেই মুহূর্ত্তে···?

চন্দন দত্ত॥ আমি সেদিন কেন আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলুম, তার কারণ বলব!

লক্ষহীরা॥ বেশ, তখনো না হয় ব'লো, এখনো না হয় একবার বলো!··· ওগো বলো না শুনি! কি বলবে তুমি রাজার কাছে?

চন্দন দত্ত॥ বলব "দেবী! তোমার ঐ অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।"

লক্ষহীরা॥ ওহো-হো! [আর্ত্তনাদ করিয়া সুখাসনে লুটাইয়া পড়িলেন]

চন্দন দত্ত। ভয় নেই।···তোমার অসভ্য যুগের সেই স্বামী তোমাকে হাত ধরে···যেখানে জরা-মৃত্যুর ভয়ে মানুষ কেঁপে ওঠে না, যেখানে লোল চর্ম্মের বা তোমার অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের অন্তবালে লুকায়িত সেই একগুচ্ছ শুক্ল কেশের জন্য আশঙ্কা নেই, উদ্বেগ নেই···আমি তোমাকে আমার সেই সংসার আশ্রমে নিয়ে যাব। তুমি আমার পুনর্ভু বধূ হবে। আমার বধূকে অবগুণ্ঠন দিয়ে তার শুক্ল কেশ লুকিয়ে রাখতে হবে না। সংসারে কেশ যত শুক্ল হয়, প্রেম তত শুভ্র হয়, তোমার ঐ

শুভ্র কেশগুচ্ছ, তোমায় সঙ্গে আমার পরিচয় যে কত দীর্ঘ কালের···তারই সুপ্রাচীন সাক্ষী। ভয় কি? ক্ষোভ কেন?

লক্ষহীরা॥ আমার হাত ধর···আমায় নিয়ে চল।

চন্দন দত্ত॥ কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে দিয়ে দাম্পত্যপ্রেমের আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে রেখে যেতে চাই। পতিভক্তি যে কত উর্দ্ধে উঠতে পারে তা যদি দেখতে চাও···, তবে, আমার অনুরোধটি রক্ষা কর···

লক্ষহীরা॥ বল···শীঘ্র বল···। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। তুমি আমায় নিয়ে চল—তুমি আমায় নিয়ে চল···

চন্দন দত্ত॥ নিয়ে যাব, আজই, এই রাত্রিতেই। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে সেই কুষ্ঠ রোগীর সর্ব্ব কামনা পূর্ণ কর্ত্তে হবে···

লক্ষহীরা॥ তাতে কার কি লাভ?

চন্দন দত্ত॥ সংসারের লাভ! সংসারাশ্রমে···পতিভক্তির এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা!

লক্ষহীরা॥ সে তুমি ভালো জানো। কিন্তু দেহমনের এই দোকানদারি থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। সাজসজ্জা ক'রে মুখে রং মেখে শুভ্র কেশগুচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢেকে ঢেকে আমি এত ক্লান্ত, এত শ্রান্ত···যে···আমি তাই মদ ধরেছি। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ রোগী? শেষ কর···ইতি কর। আঃ··· তারপর মুক্ত জীবন! তোমার সেই শান্ত-স্নিগ্ধ সংসার! সেখানে আবার আমি সেই বধূটি! যৌবন গেল, তাতে কি বা এল গেল! স্বামী! প্রভু! প্রিয়!··· সত্যি?···আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ রোগী? আমি আমার সেই বিলাস-কক্ষেই চল্লুম···তুমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও! হাঁ, এ জ্বালাময় জীবনের শেষ হোক্, ইতি হোক। তুমি এইখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা কর···যেমন যুগে যুগে করে এসেছ! আমি ফিরে এলে তোমার চরণ দুখানি এগিয়ে দিয়ো! হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ো।···

চন্দন দত্ত॥ চলে গেল, মনে হচ্ছে রাত্রি শেষে চন্দ্রমা অস্ত গেল। তার পরই কি নব জীবনের প্রভাত-সূর্য্য উঠবে!···ও কে আসে? অদিতি?··· হাঁ অদিতি।—অদিতি! ভগিনি, সার্থক তোমার স্বামি-সেবা! সার্থক

তোমার নিষ্ঠা!…লক্ষহীরা তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর্ত্তে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু এ কি!

অদিতি॥ কি ভদ্র?

চন্দন দত্ত॥ তোমার কেশপাশ কই? তুমি মুণ্ডিত মস্তক কেন ভগিনী?

অদিতি॥ সজ্জাকর কালই বলেছিল…কিন্তু হাত দিয়েও তো ওঁর পা ধুয়ে তৃপ্তি পেতুম না, পাখা দিয়ে বাতাস করেও আশ মিটতো না! ওঁর পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিয়েছি, মুখে চোখে বাতাস করেছি! তাই সজ্জা-করের স্বর্ণ মুদ্রার প্রলোভনেও আমি ভুলিনি!…কিন্তু আজ এল আমার সব চাইতে বড় পরীক্ষা! সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে এলুম!…এই সেই সজ্জাকরের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা…

চন্দন দত্ত॥ আজ যদি সত্যযুগ হ'ত, তবে তোমার ঐ মুণ্ডিত মস্তকে স্বর্গ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হ'ত! কিন্তু সে যাক্।…আর বিলম্ব নয়…দর্শনী সে নেবে না… সে তার বিলাস-কক্ষে তোমাব স্বামীর প্রতীক্ষা করছে।…ঐ সোপানপথ দিয়ে উঠে নির্ভয়ে তোমার স্বামীকে সেখানে রেখে এসো…

অদিতি॥ ওগো! জাগো! জাগো!

…জাগোগো, জাগো!

* * * *

চন্দন দত্ত॥ সবাই চলে গেল! পড়ে রইলুম আমি! সে সত্যই বলেছে, যুগে যুগে আমি তার জন্য এমনি করেই প্রতীক্ষা করেছি! আজ আমার সেই প্রতীক্ষার অবসান হবে!…অদিতি! দেবি! তুমিই আজ আমাদের এই নব জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছ! তোমার পাতিব্রত্যের ভিত্তির উপর লক্ষহীরার নূতন সংসার গড়ে উঠুক…যুগে যুগে সীতা সাবিত্রীর মত তোমার জয়গান হোক্…কে! তুমি!

লক্ষহীরা॥ হাঁ আমি। জয়গান হবে কার?

চন্দন দত্ত॥ জয়গান হবে সতীর!…জয়গান হবে তোমার…তুমি রাজ-

রাজেশ্বরী হয়েও অদিতির অলৌকিক পাতিব্রত্যকে জয়মণ্ডিত করেছ, তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীকে আলিঙ্গন দিয়ে···

লক্ষহীরা ॥ না···না···না···

চন্দন দত্ত ॥ সে কি !

লক্ষহীরা ॥ এই বা কি ! সঙ্গে তার স্ত্রী ! স্ত্রী নিজে দেহপাত ক'রে স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছে তার স্বামীর কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ! এই তোমাদের সতী ? এই 'সংসারের আদর্শ' ?···তুমি সরে' দাঁড়াও—তুমি চলে যাও···আমি বমি করব !···রাজা কোথায় ? সুরা কই, পেয়ালা আনো···ঢালো !

[ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩৩]

উইল

—ডাক্তার ডেকে আনি···

—না মুখার্জ্জি !···অনর্থক ডাক্তারকে টাকা দেওয়া কিছু নয়। এ যন্ত্রণাটুকু আমি সহ্য করতে পার্ব্ব।

—মুখে বলছেন বটে সহ্য কর্ব্বেন, কিন্তু যন্ত্রণা সে কথা মেনে নিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না। দেখুন, আপনি আর টাকাব মায়া কর্ব্বেন না। চিরটা কাল কুমারই থেকে গেলেন ; স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আপনার অবর্ত্তমানে আপনার এ অগাধ সম্পত্তি বারো-ভূতে লুটে খাবে···অথচ আজ ডাক্তারের ওষুধটুকু খেতে আপনার টাকার মায়া! ছিঃ—

—টাকার মায়া কর্ব্বনা আমি !···তুমি জানোনা মুখার্জ্জি, যে যত কষ্টে টাকা রোজগার কবে, টাকা খরচ করা তাব পক্ষে তত কষ্ট! ও আমার কষ্টের ধন বলেই ওর ওপর আমাব মায়া মমতার অন্ত নেই! উঃ কী দিনই গেছে !···জন্মে অবধি মা বাপের মুখ দেখতে পাই নি, জীবনে দুটো স্নেহের কথা শুনতে পাই নি, মামার বাড়ীতে মামার গলগ্রহ হয়ে ছিলুম, মামী তাড়িয়ে দিলেন···একবস্ত্রে চলে এলুম রাণীগঞ্জে··কুলীর কাজে যোগ দিলুম···তারপর···তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধীরে ধীরে তোমাদের কারবারের বড়বাবু হয়ে আজ কেমন করে আমি লক্ষপতি হয়েছি সে ইতিহাস তোমরা না জানো এমন নয়।···আমার সেই রক্ত-জল-করা টাকা !···তারই মায়ায় বিয়ে করি নি, তারি মায়ায় স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করেছি।

—কিন্তু আপনার অভাবে এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ কর্ব্বে কে, সে কথা অন্ততঃ আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

—এসেছে,···শুধু আমার নয়···আরো বহু লোকের।···নিচের ঘরে সেই ভাবনা নিয়ে কত মহাত্মাই না বসে রয়েছেন খবর পেলুম !···কী হবে এই সম্পত্তির, আমি মর্লে কী হবে এই সম্পত্তির···এই ভাবনায় আজ দেখছি দেশের লোকের ঘুম নেই।···দুর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের তো কথাই নেই, আবার শুনছি কংগ্রেসের লোক, সভা-সমিতির সভ্য···তাঁরাও এ কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলেন !

—আপনার মামাতো ভাই আজকে সকালের ট্রেনে এসেছেন। আপনার অসুখের সংবাদে তিনি বড়ই চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছেন···

—এসেই আমায় কি বলে জানো ? বলে "ঘুমের ভেতর নাকি দৈব স্বপ্নাদ্য ওষুধ মেলে, মা বলে দিয়েছেন।" আমি বললুম হাঁ ভাই, সেইটে একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি। বড় সুবোধ আমার ভাইটি ! কখনও কথার অবাধ্য নয়।··· ছুটে চলে গেল ঘুমুতে।···ঐ শুনছ না—ওঘরে তার নাকের ডাক !···সে যাক্। একটু জল দিতে বল দেখি !

—দিচ্ছি···

না, তুমি না।···তুমি আপিসে যাও···বড় কর্ত্তারই না হয় অসুখ, কিন্তু ছোটকর্ত্তাও সেই সঙ্গে আপিসে না গেলে কাজ চলবে না মুখার্জ্জি !

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাজ শেষ করেই এসেছি···এই নিন জল···

—আঃ, লখিয়া কোথায় ?

—লখিয়া কে ?

—আঃ, সেই কুলি মেয়েমানুষটা !

—তাকে দিয়ে কি হবে ?

—আমাকে জল দেবে।···ওরাই যে আমায় দেখছে শুনছে !

—কেন, আমিই জল দিচ্ছি—

—না মুখার্জ্জি, তুমি আর দেরী ক'রোনা···আপিসে যাও···তাকে যদি ডাকতে পার ডেকে দাও···না হয় চলে যাও—

—হাঁ, সে বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে।…এই যে সর্দ্দার কুলি!…ডেকে দাও তো লখিয়াকে…

—সর্দ্দার এসেছে?…মুখার্জ্জি! তুমি ভাই নিচে গিয়ে ভদ্রবৃন্দকে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় দাও তো ভাই! ওঁদের চাঁদার খাতাগুলি আমার মানসপটে ভেসে উঠ্‌ছে…আর আমার মাথা ঘুরছে!

—বেশ, আমি যাচ্ছি।…কিন্তু আপনার জ্বরটা কি আবার বেগ দিল?… একবার ডাক্তারকে খবর দিলে…

—আমার হার্টফেল কর্ব্বে…বুঝলে মুখার্জ্জি! ডাক্তারকে ষোল মুদ্রা দর্শনী দিতে গেলেই আমার হার্টফেল হবে…বড় হিতৈষী দেখছি তোমরা আমার!

—আমি চললুম।…নমস্কার

—সর্দ্দার!

—মহারাজ!

—ডাক্তার চলে গেছে, না?

—হাঁ মহারাজ!

—আমায় জল দেবে কে?

—কেন, লখিয়াকেই তো পেয়েছেন!

—ওকে দেখলুম। ও নয়।…সে যে কোথায় জানিনে, হঠাৎ যদি এক মিনিটের জন্যও একটিবার দেখতে পেতুম, চিনতুম, নিশ্চয়ই চিনতুম…কিন্তু কোথায় সে!

—কে?

—আমার চোখের ঘুম।…ঘুম নেই, ঘুম নেই, আমার চোখে ঘুম নেই, আজ একটি মাস ব্যারাম হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু এক মিনিট ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না!

—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পার্চ্ছি না মহারাজ!…কি চান আপনি?

—শান্তি ভাই শান্তি।…জানো, আমার কত টাকা?

—লাখ লাখ…

—প্রায় দশ লাখ।…আমি আর দু' একদিনের মধ্যেই মরব…এই দশ লাখ টাকা আমায় ধরে রাখতে পার্বে না…কিন্তু তার পর? তার পর?

—মহারাজ!

—যখের কথা শুনেছ সর্দ্দার?…আমাকে সেই যখ হয়ে আমার এই দশ লাখ টাকা আগ্‌লাতে হবে!…আমার মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। আমার কি হবে সর্দ্দার?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ!

—ঘুম নেই, চোখে ঘুম আসে না। এই টাকা আমার বোঝা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে আমায় পিষে মারছে।

—কিছু না হয় বিলিয়ে দিন।

—বিলিয়ে দেব! বিলিয়ে দেব! কাকে বিলিয়ে দেব? তোমাকে? ওরে হারামজাদা তোকে?

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে?

—কংগ্রেসকে দিয়ে দিন…

—তোকে আমি জেলে দেব পাজী!

—তবে কি হবে মহারাজ? যখ হলে তো বড়ই মুস্কিল হবে…

—যখ হতে হবে ভয়েই তোরা বিয়ে করিস, না? তোরা মর্লে তোদের ছেলেরা বিষয় পায় তোদের আর ভাবনা থাকে না! আঃ এ কথাটা তখন মনে হয় নি তাই আজ…আঃ, গলাটা শুকিয়ে গেল—জল দেবে কে?

—দেব?

—খবরদার।

—লখিয়াকে ডাকব?

—না।

—তবে?

—তোদের পাড়ার আর কেউ আসে নি আমার কাছে?

—কেউ আর আসতে চায় না !

—আসতে চায় না সে বহুদিন শুনেছি। কিন্তু টাকা পেয়েও আসতে চায় না সে কথা আজ শুনছি !

—টাকা পেয়েও আসতে চায় না। আগে এমন ছিল না। তখন যাকে বলেছি সে-ই উপরি রোজগারের লোভে আসতে চাইতো, এসেও ছিল কয়েকজন··· কিন্তু···

—কিন্তু ?

—কিন্তু এখন তারা সন্দেহ করে ! মেয়েমানুষ কিনা ? ওদের সন্দেহটা একটু বেশী !

—আমি তো ওদের কোন অনিষ্টই করি নে ! শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখি। থাকে, হাওয়া করে, জল দেয়। একদিন থেকেই চলে যায়···এই তো যত কাজ !···এতেও আপত্তি ?

—হাঁ মহারাজ···

—ঐ লখিয়া তো এল !

—সবার মানা না মেনে এসেছে !

—এসে আবার ঘুমুচ্ছে !···ওকে তুলে আন সর্দ্দার !

—এই হারামজাদী !

—চুপ হারামজাদা ! এসো লখিয়া, আমার সমুখে এস।···কোন ভয় নেই ·· হাঁ···এস···এগিয়ে এস···

—আমার লাল টুকটুকে শাড়ী ?

—দেব লখিয়া দেব।···সর্দ্দার···আমি চোখেও আর ভালো দেখি নে ··তুমি দেখ তো···লখিয়ার চোখের মণি দুটি কেমন ?

—কালো !···আলকাতরার ফোঁটা !

—তিল নেই ? ও মণিতে তিল নেই ?

—না। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার···তিল থাকলেও হারিয়ে গেছে।

—তিল নেই ! তবে তো ওর চোখ ভালো নয় !···তবুও ওর পয়বের অন্ত

নেই! হারামজাদী আবার শাড়ী চায়!…সর্দ্দার! ওকে পাঁচ জুতি মেরে তাড়িয়ে দে—

—মহারাজের জয় হোক্…চল হারামজাদী!…আবার শাড়ী পরতে সাধ!… চল পেত্নী!…আরে, তিল কি সবার চোখের মণিতে থাকে!…তিল দেখবি তো আমার মেয়ের চোখ দেখগে যা…হাঁ…চোখ বটে। পুটপুট করে যখন চেয়ে থাকে!…তখন—

—সে কি সর্দ্দার! তোমার মেয়ের চোখের মণিতে তিল আছে?

—আছে মহারাজ!

—সেই খুকী?

—মঙ্গলি!

—অতটুকু মেয়ের…

—সাত বছর বয়স হ'ল মহারাজ!

—একটু জল দাও সর্দ্দার!…লখিয়া পালিয়েছে?

—ছুটে পালিয়েছে মহারাজ।

—তুমিই দাও।

—নিন্।

—আঃ…জুড়িয়ে গেল!…কি তেষ্টাই পেয়েছিল!—আঃ।

—আচ্ছা সর্দ্দার! তুমি এমন বাঙলা কথা শিখলে কোথায়?

—আমি যে মহারাজ কলকাতায় ছিলুম!

—কবে?

সে অনেক দিন হবে।…বিয়ে করে নাকি আমি বৌ-পাগলা হয়ে গেলুম…বাবা একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে…বৌকে বললুম চল্…কিন্তু গেল না। একাই গেলুম কলকাতায়…সেইখানেই আমার কাজকর্ম্ম শেখা…তাইতো আজ মহারাজের দয়ায় আমার এই উন্নতি!

—বৌ গেল না কেন?

—বাবার ভয়ে।…ভারী ভীতু ঐ মঙ্গলির মা!

—মঙ্গলিকে ফেলে কলকাতায় মন্ টিকতো ?

—তখন মঙ্গলি হয়নি মহারাজ !···ফিরে এসে দেখি দুবছরের একটি মেয়ে··· তখন আরো ফুটফুটে ছিল···যেন্ গোবরে পদ্মফুল।···বাবা বললেন তোর মেয়ে মঙ্গলবারে হ'ল···তাই নাম রেখেছি মঙ্গলি !···এই বলে আমার কোলে তুলে দিলেন !

—মঙ্গলিকে দেখেছি, বেশ মেয়ে !···সর্দ্দার···কিন্তু, মঙ্গলির মাকে কি আমি কোনও দিনই দেখিনি !

—সে যদি আগে দেখে থাকেন ! আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর তার যা দেমাক হ'ল মাটিতে পা পড়ে না আর কি !···বলে আমি খাটতে পার্ব্বনা··· আমি মঙ্গলিকে নিয়ে শুধু খেলে দিন কাটাব।

—তবে মঙ্গলিকে বড্ড বেশী ভালোবাসে সে।

—হাঁ মহারাজ।···আমি জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।···মেয়ে নিয়ে এমন অস্থির··· যে আমার দিকে তার তাকাবারও ফুর্সৎ নেই।

—তাই বুঝি আর ঘরেরও বের হয় না ?

—ঘরের বের তো আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই হয় না···। যার অবস্থা ভালো···সেই তার বৌঝি ঘরেই রাখে। কয়লার খনির বাবুদের স্বভাব চরিত্রির তো আর সুবিধের নয়···।

—নয়ই বটে।···হাঁ, সে কথা বুঝি।···কিন্তু সর্দ্দার, তোদের দেশের মানুষদের মনে দয়ামায়া নেই···হাঁ, নেই, নইলে···

—নইলে ?

—এই আমি বিদেশের একটী মানুষ···মর্ত্তে বসেছি,···কেউ তো একবার উঁকিও দিয়ে যায় না যে আমার কি লাগবে···একফোঁটা জল কি···এক দাগ ওষুধ···কি একটু পথ্য—।

—কেন, আপনার দাসদাসীরা তো রয়েছে···

—সে তো আমার রয়েছে···কিন্তু···তোমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে···

—আমি তো রাত্তির-দিন হাজির—

—কিন্তু তোর বৌ ?

—না মহারাজ।

—তবেই দেখ।···আমাদের দেশে ওটি হ'তনা। অমন স্নেহ অমন মায়া··· অমন মমতা···তোদের ওরা ভাবতেও পারে না। সে যাক্। সর্দ্দার, আমার জ্বরটা খুবই বাড়লো। সর্দ্দার, আর বুঝি বাঁচি নে !···সর্দ্দার ! আমার কাছে কেউ নেই ! কেউ নেই ! একটা ছেলে নেই যে জড়িয়ে ধর্ব্ব···স্ত্রী নেই যে সেবা কর্ব্বে···আমার ভালো লাগবে !···সর্দ্দার, তোর বৌ আর মঙ্গলিকে আমার এখানে একবার নিয়ে আসবি ? শুধু দেখব···চোখের দেখা দেখব ! ওদের দেখলেও আমি শান্তি পাব !···আজ এই বিদেশে মর্ত্তে বসে আমার দেশের কথা মনে পড়েছে···মেয়েদের কাজল চোখের কালো ছায়ায় আমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে !···কোথায় পাব ? কোথায় পাব ?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ !

—কাকে দেব ? আমি আমার এই অগাধ সম্পত্তি—দশলাখ টাকা···কাকে দেব ?

—কংগ্রেস···

—খবরদার সর্দ্দার। রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করেছি···সে টাকা দান কর্ত্তে পার্ব্বনা···খয়রাত কর্ত্তে পার্ব্বনা। সে টাকা আমি নিজে ভোগ কর্ত্তে কষ্ট পেয়েছি···পরকে দিতে পার্ব্বনা—না—না— কখ্খনো না···

—কিন্তু, আপনারও তো আর কেউ নেই !

—তা ঠিক্।···কেউ নেই···তবু···

সর্দ্দার, টাকা নেবে ?

—মহারাজ আপনি ভালো হয়ে উঠুন—

—না সর্দ্দার, আমি জানি আমি মলে তোমরা খুশী হবে···আমি যে কৃপণ !··· কিন্তু সর্দ্দার, খুশী আমি বেঁচে থেকেই তোমাকে করে যাচ্ছি···এই দেখ আমার হাতে হাজার টাকার নোট···নেবে ?

—মহারাজ !

—নেবে সর্দ্দার ?···শুধু একটি কাজ করতে হবে !

—কি মহারাজ ?

—ঐ মঙ্গলির কথা আমার আজ বড় বেশী মনে পড়েছে !···কি সুন্দর মেয়েটি !···ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল···কালো দুটি চোখ···মুখে আধ আধ বুলি।···ওকে একটিবার আমার এখানে নিয়ে আসবে ? আমি ওকে বুকে নেব !

—মঙ্গলির মা মঙ্গলিকে ছেড়ে দেবে না।

—বেশ তো !···তাকেও সঙ্গে আনো !

—আমাদের দশের নিষেধ আছে !

—দশের নিষেধ কি আমার আদেশের চাইতেও বেশী ভজন সর্দ্দার !

—মহারাজ !

—আসবে না সে ?

—না।

—না ?

—······

—শোন সর্দ্দার···আমার আদেশ···কয়লার খনির মালিকের হুকুম···তাকে তুমি এখানে এখনি আনবে···বুঝলে ?

—······

—সর্দ্দার ! সর্দ্দার !

—সর্দ্দার তো নেই দাদা !···সর্দ্দার যে এইমাত্র ছুটে বের হয়ে গেল !

—কে ? বিমল ?

—হাঁ দাদা।···এত চেষ্টা করলুম···স্বপ্নও দেখলুম···কিন্তু ওষুধ পেলুম না !

—টাকার স্বপ্ন কোনদিন দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কত টাকা পর্য্যন্ত স্বপ্নে একসঙ্গে দেখেছ ?

—এক হাজারও একবার দেখেছিলুম কিন্তু···

—কি ?

—কিন্তু সেই সঙ্গে জেলে চাবুক খাচ্ছি সেটাও দেখা বাদ যায় নি···

—বেশ।···চাবুক খেতে হবে না···হাজার টাকাই মিলবে···যদি একটা কাজ কর্ত্তে পার।

—বলুন, আমি তো আপনার শেষ দশায় শেষ কাজ কর্ত্তেই এসেছিলুম···

—হাঁ ভাই, আমার শেষ দশায় শেষ কাজ কর···ঐ জানলা দিয়ে নিচে দেখতে পাচ্ছ কুলী-সর্দ্দারদের কুটীর-পল্লী। দেখছ ?

—ঐ তো দেখছি !

—কাছে এসো···আরো কাছে।···পরিহাস নয় ভাই···যা বলব এর চাইতে গুরুতর কথা আমি জীবনে বলি নি ! যদি টাকা চাও···যদি এই হাজার টাকার চকচকে নোটখানি চাও···তবে···

—তবে ?

—তবে ঐ কুটীর-শ্রেণীতে এই মুহূর্ত্তে আগুন দিয়ে এস !—আর আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন আগুন নেভাবার ছল করে চেঁচিয়ে বলবে···যদি বাঁচতে চাও···ছেলে পুলে নিয়ে বড়কুঠীতে যাও···বুঝলে ?

—দাদা সত্যি ?

—সত্যি···সত্যি···সত্যি ! এই নোটখানি যেমন হাজার টাকার সত্যি··· তেমনি সত্যি।

—হাজার টাকা !···কিন্তু দাদা···একখানা মটর গাড়ীর বড় সখ ছিল আমার !

—বেশ···যদি আমার মনস্কামনা পোরে···তাও হবে···তাও হবে···

—মটর ! মটর ! মটর ! ভ্যাস্···ভ্যাস্···ভ্যাস্···

—মটরের শব্দ মুখে করে আর কি কর্ব্বে···মটর নিজেই ও শব্দ করবে !···তুমি আর বিলম্ব করো না···কোন ভয় নেই···যাও···

—গেলুম।···ভ্যাস্ ভ্যাস্···ভ্যাস্···

—বিমল !

—* * * * * ···

বিমল !

—বিমলবাবু আমাদের ঘরে আগুন দিতে ছুটে গেল···

—কে ? তুমি কে ?

—আমি সর্দ্দার।···আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলুম।···আমিও চললুম বিমলবাবুকে বাধা দিতে···কিন্তু যাবার আগে বলে যাই···যদি এই আগুনে আমার বৌ কি মঙ্গলি পুড়ে মরে···তবে···

—তারা পুড়ে মর্ব্বে কেন ! মর্ব্বে না···মর্ব্বে না···শুধু ঘর থেকে বের হয়ে এসে আমার কুঠীতে সবাই আশ্রয় নেবে···আমি তাদের শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব···

—মঙ্গলিকে বুকে নিয়ে মঙ্গলির মা ঘুমিয়ে আছে। সেই ঘরেই যদি আগুন আগে পড়ে···তবে আচ্ছা, সে ফিরে এসে হবে—

সর্দ্দার ! সর্দ্দার !

—··· ··· ··· ··· ···

—সর্দ্দার ছুটে চলে গেল মহারাজ !···কিন্তু আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই ?

—কে ? লখিয়া ?

—হাঁ লখিয়া !···আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই মহারাজ ?

···—ওরে লখিয়া ! দেখ দেখি···তোদের পাড়ায় কি আগুন লেগেছে ?

আগুন ! সে কি মহারাজ !···আগুন নয়, আমি চাই সেই লাল টুকটুকে শাড়ী ! হাঁ, আগুনের মত লাল টকটকে !

—বড়কর্ত্তা ! বড়কর্ত্তা !

—কে ! মুখার্জ্জি ? এসো···শীগগীর এস···

—কি হয়েছে বড়কর্ত্তা ?···সর্দ্দার কুলী বিমলবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে ! কি হয়েছে বড়কর্ত্তা ?

—কুলীপাড়ায় কি আগুন লেগেছে ?

কই, না !

—সর্দ্দার কুলীকে তবে এখানে নিয়ে এস···

—আমি এসেছি মহারাজ।

—বিমল কোথায়?

—নিচের ঘরে পড়ে আছেন।

—সর্দ্দার! তোমায় আমি এই হাজার টাকার নোট দান কলুম।···নাও—

—কেন? আমি তো আর মামলা মোকদ্দমা কর্ব্ব না! তবে কেন এই ঘুস।

—ঘুস নয়। আমি খুশী মনে তোমায় দিলুম—তোমার মঙ্গলি বেঁচেছে, মঙ্গলির মা মরে নি সেই আনন্দে দিলুম—

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে তোমার মঙ্গলিকেই দিয়ো···

—সেও নেবে না। তার মা তাকে নিতে দেবে না।

—আচ্ছা সর্দ্দার!—মঙ্গলির মার চোখ দুটি কেমন? তার চোখের মণিতেও কি একটি তিল আছে?

—সে তো আমি অত ভালো করে দেখি নি! আর তাতে আপনার কি?

—আমার আছে কি না, তাই।

—কই? দেখি?

—এই দেখ।

—হাঁ, তাই তো!

—দয়া কর—দয়া কর সর্দ্দার—

—মঙ্গলিকে একটিবার আমার বুকে এনে দাও—

লখিয়া তোর মেয়েটা কই? মহারাজের বুকে তুলে দে—

—না···না সর্দ্দার আমি কাউকে চাইনে···আর কাউকে চাইনে, চাই মঙ্গলিকে।

—হাঃ হাঃ হাঃ—কুলীপাড়ার কোন মেয়ে আপনার কাছে আসবে না! আপনি তাদের ঘরে আগুন দেওয়াচ্ছিলেন···সে কথা আর যেই ভুলুক···আমি ভুলব না!

—মুখার্জি! সর্দ্দারকে ডিসমিস কর···এই মুহূর্ত্তে!

—তাই হবে বড়কর্ত্তা। সর্দ্দার···তুমি অন্যপথ দেখ।

—মুখার্জ্জি !···আমার যেন কেমন কর্চ্ছে !

—ডাক্তার ডাকি ?

—ডাক্তারকে পয়সা দিতে পার্ব্ব না !

—আচ্ছা, আপনি না দিলেন···

—না, ও কিছুতেই হবে না। নিচের ঘরে বড় গণ্ডগোল হচ্ছে—

—তাঁরা সব চাঁদার খাতা নিয়ে আবার এসেছেন !

—তাড়িয়ে দাও···তাড়িয়ে দাও ওদের !

—বেশ, আমি যাচ্ছি···কিন্তু···ডাক্তার···

—ডাক্তারকে পয়সা দেব না। ওদের বলে দাও···ওদেরও আমি একটি পাই পয়সা দেব না···আর শুনিয়ে দাও যে···আমি এখনি আমার সম্পত্তির উইল কর্ব্ব।

—কি উইল করবেন বড়কর্ত্তা ?···বিমলবাবুকে বুঝি···

—বিমলবাবুকে নয়। একলা কাউকেই নয়। যাকে দিতুম, আমি যে খুঁজে তাকে বের কর্ত্তে পারলুম না ! সর্দ্দার চলে গেছে ?

—হাঁ চলে গেছে।

—মঙ্গলি কোথায় রে লখিয়া ?

—ওরা সব ভিন্ গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে ধরে এনেছিস খবর শুনে মরদরা সব মেয়েদের ভিন্‌গাঁয়ে চালান দিয়েছে। আমি পড়ে আছি আমার লাল টুকটুকে শাড়ী নেব বলে।

—মুখার্জ্জি ! হল না ! হল না !···আমার অমনি এক মঙ্গলি···অমনি এক মঙ্গলির মা···ঐ কুলী-পল্লীর মাঝে লুকিয়েছিল, এখন হারিয়ে গেছে, খুঁজে আর বের কর্ত্তে পার্লুম না। উইল লেখো মুখার্জ্জি—আমি আমার সম্পত্তি ঐ কুলীদেরই দিয়ে গেলুম। যদি আমার মঙ্গলি বেঁচে থাকে, জনগণের মধ্যে দিয়ে সে তা ভোগ কর্ব্বে। লখিয়া ! একটু জল ! আঃ···আর ভালো কথা···ঐ লখিয়াকে একখানা লাল টুকটুকে শাড়ী দিতে হবে—উইলে লিখতে ভুলো না !

[ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৩৪]

মাতৃ-মূর্তি

[গৌড়পতি মহীপাল দেবের রাজপ্রাসাদ-মধ্যস্থ শিল্পভবন। শিল্পভবনের অঙ্গনে প্রস্তর নির্মিত ছয়টি নারী-মূর্তি পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে; এবং তাহার পরেই অসমাপ্ত-সপ্তম-মূর্তির-জন্য-নির্দিষ্ট একটি শূন্য বেদী রহিয়াছে। মূর্তিগুলি মহারাণীর প্রতিমূর্তি, প্রত্যেকটির মূলতঃ একই রূপ কিন্তু ভঙ্গি বিভিন্ন। মূর্তি-শিল্পী এই ভাস্করের নাম শ্রীমান, নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য ধীমানের এক বিখ্যাত তরুণ শিষ্য।

সবে মাত্র জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আকাশে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে, অদূরবর্তী "রূপসাগরের" জলে তাহারি আলো-ছায়া এক স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিতেছে। এই আলো এবং আঁধারের মাঝে ঐ মূর্তিগুলি রহস্যময়ীর মতো অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গনের মধ্যভাগে শ্বেত পাথরের গোল বেদীর উপর স্থাপিত একটি ফোয়ারা। বেদীর উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া শ্রীমান দূরের ঐ মূর্তিগুলির পানে তাকাইয়া কি ভাবিতেছেন। নির্ঝরের মৃদু কলগান এবং দূরাগত ঝিল্লিরব ঐ আলোছায়া, ঐ নীরব নিথর মূর্তিগুলি···শিল্পীর অন্তর-বাহিরকে স্বপ্নময় করিয়াছে।

শ্রীমান তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন, তাঁহার সেই তন্ময়তা দূর করিল কাহার পায়ের নূপুর-ধ্বনি।

শ্রীমান পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন রাজদাসী অঞ্জনা। অতিক্রান্ত যৌবনের আরাধনা-লব্ধ রূপসম্পদে গরিমাময়ী অঞ্জনা চোখেমুখে কি এক শঙ্কা এবং উদ্বেগ বহন করিয়া আসিয়াছে আজ]

অঞ্জনা॥···শেষ হয়নি? আজো শেষ হয়নি!

শ্রীমান॥ কি?

অঞ্জনা॥ কি, সে কি তুমি বুঝছ না? না, জানো না?

শ্রীমান॥ শেষ তো অনেক কিছুই হয়েছে, হচ্ছে—

অঞ্জনা॥ তার মানে আমার বয়স গেছে, এই বলতে চাও তো?···তা দেখে নেব···সহজে মরছি না—দেখে নেব কার রূপ-যৌবনই বা চিরকাল থাকে হাঁ—

শ্রীমান॥ বাঃ, আমি বুঝি তাই বলতে গেছি? তুমি ত বেশ!

অঞ্জনা॥ দর্প চূর্ণ হবে গো, দর্প চূর্ণ হবে।···শোন, আর রসিকতায় কাজ নেই। রাজার আদেশ এনেছি আমি।···হাঁ!

শ্রীমান ॥ সে আমি জানি। জানি না শুধু এই পাগল রাতে মাতাল হয়ে কে কার কুঞ্জে অভিসারে চলেছে!—সত্যি!

অঞ্জনা ॥ আসিনি গো, আসিনি, তোমার কুঞ্জে অভিসারে আসিনি।···তাই বা কেন! আমি যে অভিসারে যাই, দেখেছ? দেখেছ? দেখেছ তুমি কোন দিন? তবে?···বলে দেব আমি রাণীকে···তুমি এমনি করে আমায় যা-তা বল!···আর তোমারই বা লুকিয়ে লাভ কি? যার মনে যা, জগৎশুদ্ধ তা' —সে আমি বেশ বুঝি।···নিজেই যাবে···না···কেউ আসবে?

শ্রীমান ॥ সেতো এসেছে—

অঞ্জনা ॥ কে?

শ্রীমান ॥ তুমি!

অঞ্জনা ॥ এই করে তুমি আমায় ভুলিয়ে, রাজার আদেশ শুনবে না এই বুঝি তোমার মতলব?···শোন গো শোন, তোমাকে যেতেই হবে—

শ্রীমান ॥ কোথায়?

অঞ্জনা ॥ আমার সঙ্গে—

শ্রীমান ॥ তোমার সঙ্গে? দোহাই তোমার—চেয়ে দেখ অঞ্জনা, কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! দেখেছ অঞ্জনা, ঐ অমন যে চাঁদ—কালো মেঘের আড়ালে তাও ঢাকা পড়লো! ঘোমটার আড়ালে অমনি করেই চাঁদমুখ ঢাকা পড়ে। সেই জন্যই তো বলি "ঘোমটা খোল, খোল ঘোমটা!"

অঞ্জনা ॥ [মুখে ঘোমটা টানিয়া] তুমি আমার মুখ দেখো না।—হাঁ—

শ্রীমান ॥ কিন্তু এতক্ষণ তো দেখেছি! একটিবার দেখতে পেলেই জীবন-ভরে দেখা হয়, জন্মজন্মান্তর মনে থাকে —ঐ তো তোমাদের রাণীকে প্রতিমাসে শুধু একটিবার দেখতে পাই, তাতেই প্রতিমাসে তাঁর এক একটি করে ছয়টি প্রতিমূর্তি গড়েছি,—হয় নি ঠিক্?—হয় নি?

অঞ্জনা ॥ ভালো কথা মনে করে দিয়েছ।···রাজার কথা শোন। রাজা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন রাণীর সপ্তম প্রতিমা শেষ হয়েছে কি?

শ্রীমান ॥ [শূন্য বেদীর প্রতি হস্ত নির্দেশ করিয়া] ঐ সপ্তম বেদী—!

অঞ্জনা॥ শুন্য! এখনো শেষ হয় নি?—সর্বনাশ!

শ্রীমান॥—আরম্ভই করি নি যে অঞ্জনা! এইবার সর্বনাশটা কি শুনি?

অঞ্জনা॥ আজ তোমার সপ্তম প্রতিমা শেষ হওয়ার কথা শিল্পীবর—

শ্রীমান॥ তা বেশ মনে আছে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় তার জন্য তাগিদ এসেছে। শুধু তাই নয়, আজ এই সপ্তম প্রতিমা শেষ হবে এই ব্যবস্থায় রাজা আসছে-কাল বাসন্তী পূর্ণিমায় রাণীর সপ্তম প্রতিমা উন্মোচন-উৎসবের বিরাট আয়োজন করেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি দেশ-বিদেশের বন্ধু-রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। জানি, সব জানি। এও জানি যে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ সেই উপলক্ষে আজ রাজধানীতে উপস্থিত। আমি না জানি কি?—সব জানি। —জানি না?

অঞ্জনা॥ [চঞ্চল হইয়া উঠিয়া] তবে?—কেন তবে ঐ সপ্তম প্রতিমা শেষ কর নি?...কেন জেনে শুনে এই মহা সর্বনাশ বরণ করলে?

শ্রীমান॥ মহা সর্বনাশটা যে কি, তাই তো এখনো জানলাম না অঞ্জনা!

অঞ্জনা॥ তুমি এখনো সহজ ভাবে কথা কইতে পারছ? বুঝতে পারছ না যে তোমার অদৃষ্টে আজ কি নিদারুণ অমঙ্গল লেখা?

শ্রীমান॥ অঞ্জনা! অঞ্জনা! তবে তুমি কি রাণীর ঐ ছয়টি মূর্তির একটি মূর্তিরও মুখপানে চেয়ে দেখনি?...দেখনি কি তার চোখ দুটি?

অঞ্জনা॥ ও মূর্তি দেখতে হয় পথের লোকে দেখুক, আমি দেখতে যাবো কেন? আমি তো তাঁকে রক্তে মাংসেই দেখছি!

শ্রীমান॥ তবে আমার চোখ নিয়ে তুমি দেখনি অঞ্জনা। আমি ঐ পাথরের মূর্তিতেও দেখি কি অপরূপ স্নেহ-স্নিগ্ধ চোখ দুটি!...যেন এই পৃথিবীর সকল আনন্দ ঐ চোখ দুটি থেকেই ঝর্ণার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! যেন বিশ্বের সকল মঙ্গল, সকল কল্যাণ ঐ চোখ দুটিতেই জন্ম নিয়েছে! ঐ চোখের দৃষ্টির প্রসাদে আমি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি অঞ্জনা, আমার হবে সর্বনাশ?

অঞ্জনা॥ সর্বনাশ! সর্বনাশ!...আজ তোমার মহা সর্বনাশ!

শ্রীমান॥ তুমি আমার ঐ কল্যাণী রাণীর অপমান করো না অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ বীরভদ্র খবর নিয়ে গিয়েছে তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হয় নি। রাজা শুনে বললেন, তা যদি না হয়ে থাকে তবে শিল্পী শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে, আর হয়ে থাকলে···

শ্রীমান ॥ আর, হয়ে থাকলে ?

অঞ্জনা ॥ তুমি যে পুরস্কার চাইবে, সেই পুরস্কারই পাবে।

শ্রীমান ॥ যে পুরস্কার চাইব, সেই পুরস্কার ?

অঞ্জনা ॥ কি আশ্চর্য্য! রাণীও যে রাজাকে হেসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন!

শ্রীমান ॥ বটে! [মুহূর্তকাল থামিয়া] রাজা কি উত্তর দিলেন ?

অঞ্জনা ॥ রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তকাল ভেবে বললেন "অবশ্য সে পুরস্কার যদি অসম্ভব না হয়।"

শ্রীমান ॥ তারপর ?

অঞ্জনা ॥ তারপরই আমার দিকে চেয়ে বললেন, "অঞ্জনা, তুই গিয়ে দেখে আয়। যদি সপ্তম প্রতিমা শেষ না হয়ে থাকে, তবে, শিল্পীকে এখনি আমার বিচারশালায় ডেকে আনিস্। সঙ্গে সঙ্গে—[বিষম বিচলিত হইয়া] তুমি কি করবে! তুমি এখন কি করবে!—আমি যে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম!

শ্রীমান ॥ কি কথা অঞ্জনা ?

অঞ্জনা ॥ [চারিদিকে চাহিয়া, ভয়ে] তুমি পালাও! তুমি পালাও!

শ্রীমান ॥ পালাব কেন ?

অঞ্জনা ॥ কথা নয়, এখনো সময় আছে, তুমি পালাও—

শ্রীমান ॥ তবে কি সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকের আহ্বানও শুনে এসেছ অঞ্জনা ?

অঞ্জনা ॥ [আতঙ্কে] হাঁ···হাঁ···[সম্মুখ দিকে কাহাকে আসিতে দেখিয়া] ও কে ? চিনিতে পারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল] ও-হো-হো!

শ্রীমান ॥ কে ?

অঞ্জনা ॥ বীরভদ্র!

শ্রীমান ॥ সে কে ?

অঞ্জনা ॥ ঘাতকের সর্দার !

[বীরভদ্র শ্রীমানের সম্মুখীন হইল]

বীরভদ্র ॥ [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ হয় নি।

বীরভদ্র ॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া] চলে এস।

[অঞ্জনা ভয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল]

শ্রীমান ॥ কোথায় ?

বীরভদ্র ॥ রাজা তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বিচারশালায়।

শ্রীমান ॥ আর রাণী ?

বীরভদ্র ॥ দেখা যদি তাঁর নিতান্তই চাও, তোমার বধ্যভূমিতে দেখা হ'তে পারে। জানাবো তাঁকে তোমার প্রার্থনা ?

শ্রীমান ॥ হাঁ, সেটা নিতান্তই প্রয়োজন। রাজার পুরস্কার তো মিলল ভাই, কিন্তু রাণীর পুরস্কার···

বীরভদ্র ॥ জীবনের পরপারে ?

শ্রীমান ॥ হাঁ, ভাই, জীবনের পরপারে। তুমি শুধু আমায় ঐ দয়াটুকু কর, আর কিছু না,···দাঁড়াও !···আমার বাঁশী নিতে হবে—[বেদীর উপর হইতে বাঁশীটি তুলিয়া নিলেন] এইবার চল।

বীরভদ্র ॥ বাঁশীটিও কি তোমার পরপারেরই সাথী ? [অগ্রসর হইল]

শ্রীমান ॥ হাঁ ভাই। শুধু পরপারের নয়, জন্ম-জন্মান্তরেরও। কিন্তু ঘাতকের সর্দার হয়ে এত কথা তুমি জানলে কেমন করে ভাই ?

বীরভদ্র ॥ [প্রস্থান কালে] জানি, জানি, জানি। জীবন-মরণের কথা আমরা যত জানি, তোমার রাণীও জানেন না,—হাঁ—

[উভয়ের প্রস্থান]

* * * *

আকাশে বিশাল একখণ্ড কালো মেঘ চাঁদকে পরিপূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিল। তাহারি অন্ধকারে চোরের মতো এক রমণীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল। রমণীমূর্তি কাহাকে খুঁজিতে লাগিল, পরে চঞ্চল হইয়া ডাকিল "অঞ্জনা !"]

অঞ্জনা ॥ [ভয়জড়িত স্বরে] কে ?

রমণীমূর্তি ॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার পাশে গিয়া] অঞ্জনা !···তুই ?

অঞ্জনা ॥ [অর্ধোত্থিতা হইয়া] কার স্বর ?···কে তুমি ?

রমণীমূর্তি ॥ না না এটা শ্মশান নয়, কিন্তু, তার বুঝি আর বিলম্বও নেই অঞ্জনা !

অঞ্জনা ॥ রাণী ! [উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমণীমূর্তি ॥ চুপ !···চুপ !

অঞ্জনা ॥ তুমি ! এখানে ! এত রাত্রে !

রাণী ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] হয় নি, আমার সপ্তমমূর্তি হয় নি, না ?

অঞ্জনা ॥ না।···তাকে ধরে নিয়ে গেছে রাণী !

রাণী। আমি জানতাম, সে শেষ করবে না। গত মাসে যখন সে ষষ্ঠমূর্তি গড়বার সময় আমাকে দেখ্‌ছিল, তখনি বলেছিল যে, আর আমার সপ্তম প্রতিমা গড়বে না,—আমি জানতাম, তখনি জানতাম।

অঞ্জনা ॥ কেন—কেন গড়েনি তোমার সপ্তম প্রতিমা ?

রাণী ॥ পাগল, পাগল ঐ শিল্পী।···সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হলে সে আর আমার দেখা পাবে না, সেই ছিল তার ভয়।···আমি এত করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু, পাগল···পাগল সে।···পাগলের মতো শুধু প্রলাপ বকে যেতে লাগল। বল্‌লে, সে যতই মূর্তি গড়ছে, যতই দিন যাচ্ছে···ততই আমি নাকি তার চোখে তার ধ্যানে তার কল্পনায় আরো—আরো অপরূপ, আরো অপূর্ব হ'য়ে উঠ্‌ছি !···আমার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ মূর্তি সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দানে গড়ে তুলবে, এই ছিল সেই পাগলের প্রতিজ্ঞা—

অঞ্জনা ॥ রাজাকে তুমি বলনি কেন সে কথা রাণী।

রাণী। তার মানে কি এই নয় অঞ্জনা, যে, রাজাকে কেন বলিনি ঐ শিল্পী আমাকে পাগল হয়ে ভালোবাসে ?

অঞ্জনা ॥ এখন উপায় ?

রাণী ॥ কি যে উপায় জানিনে। রাজা গেছেন বিচারশালায়। আমি পালিয়ে এসেছি তোর খোঁজে।···অঞ্জনা···তার শিল্পশালা কোথায় জানিস ?

অঞ্জনা ॥ [অদূরবর্তী শিল্পশালা দেখাইয়া] ঐ তার শিল্পশালা। কিন্তু সে তো সেখানে নেই !

রাণী ॥ জানি, নেই। জানি সে এতক্ষণ বধ্যভূমিতে চলেছে। কে না জানে রাজার ক্রোধ !···কিন্তু তা নয়, তা নয়···অঞ্জনা, ঐ বুঝি সেই শূন্য সপ্তম-বেদী ?

অঞ্জনা ॥ হাঁ।

রাণী ॥ ঐ যে আর ছয় মূর্তি। [এক মূর্তির কাছে গিয়া] অবগুণ্ঠন নেই ; সে আমায় বলেছে যে, অবগুণ্ঠন সে ভালবাসে না।

অঞ্জনা ॥ শুধু কি অবগুণ্ঠনই নেই রাণী ? বুকেই বা বসন কই ?

রাণী ॥ সে বলেছে, সে আমায় বলেছে, সন্তান যেমন জননীকে ভালোবাসে এমন ভালোবাসা আর কেউ বাসে না। প্রিয়তম সন্তান প্রিয়তমা জননীর বুকের বসন টেনে ফেলে দেয়।···সে বলেছে এও তাই ! এও তাই!···যাক্ সে কথা। ···হাঁ, আমি দেখে নিয়েছি।···শোন অঞ্জনা, দোহাই তোর আমার কথা রাখ—

অঞ্জনা ॥ কোন দিন রাখি নি ?

রাণী ॥ রেখেছিস, চিরদিন রেখেছিস, কিন্তু আজ চিরদিনের মধ্যে একটি বিশেষ দিন, বিশেষ রাত্রি !···আমি শিল্পশালায় চললাম। এক মুহূর্তে আমি ঐ সপ্তম প্রতিমা গড়ব। গড়ব···আমি গড়ব ! তুই শুধু ছুটে রাজার কাছে যা। গিয়ে বল···শিল্পী সপ্তম প্রতিমা গড়ে রেখে এসেছে, রাজা এসে এখুনি দেখুন। শিল্পী পাগল···তার মাথার ঠিক নেই, কথার ঠিক নেই—

অঞ্জনা ॥ তোমারও যে আছে, আমার তো তা মনে হচ্ছে না রাণি !

রাণী ॥ [ক্রুদ্ধ হইয়া]···যা···তুই যা···[পুনরায় মিনতিতে] যা অঞ্জনা, যা—দোহাই তোর, যা—

[অঞ্জনা চলিয়া গেল। রাণীও পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শিল্পশালার চলিয়া গেলেন। তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হইয়াছে। হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দূর হইতে কাহার আকুল-করা বাঁশীর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমেই সেই মুরলি-ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। ক্রমে বংশীবাদক প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। বংশীবাদক আর কেহ নহে, শ্রীমান। সঙ্গে বীরভদ্র]

বীরভদ্র ॥ শিল্পি ! বাঁশী বাজানো তো শেষ হল, এইবার মৃত্যুর পূর্বে

তোমার হাতে-গড়া, ঐ রাণীর ছয় মূর্তি শেষ দেখা দেখে নেবে বলেছিলে, দেখে নাও—কিন্তু দেখবেই বা কেমন করে !…আলো কই ?

শ্রীমান ॥ আলো আমার চোখে।…ঐ দেখ সেই আলো…ঐ আকাশের কালো মেঘ সরিয়ে দিচ্ছে…ঐ দেখ ক্রমে চাঁদের চাঁদমুখ ফুটে উঠছে…প্রাণভরে বাঁশী বাজালাম কিন্তু, সপ্তম প্রতিমা যদি গড়তে পারতাম, তবে…তবে তো আমার প্রাণ ভরতো বীরভদ্র !

[অঞ্জনাসহ রাজার প্রবেশ]

রাজা ॥ অঞ্জনা ! অঞ্জনা ! হয় তুই পাগল, না হয়, সেই শিল্পী পাগল—

অঞ্জনা ॥ রাণী বলেছেন সেই শিল্পীই পাগল। সে সপ্তম প্রতিমা গড়েও মিথ্যা বলেছে—

রাজা ॥ কোথায় শিল্পি, তোমার প্রতিমারাজি ? কোথায় তোমার সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ আমি গড়িনি…আমি গড়িনি !

রাজা ॥ এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—

অঞ্জনা ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিল] ঐ সাত—

রাজা ॥ সাত !

[দেখা গেল শূন্য বেদীতে সপ্তম মূর্তি]

রাজা ॥ পাগল, সত্য সত্যই পাগল ঐ শিল্পী। বীর-ভদ্র, শিল্পী মুক্ত। কাল থেকে স্বয়ং রাজ-ধন্বন্তরি যেন ওর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। অঞ্জনা, তোরই কথায় বিশ্বাস করে ভাগ্যিস আমি এখানে এসেছিলাম, তাই এক নিরপরাধকে হত্যা করবার পাপ থেকে অব্যাহতি পেলাম ! এই নে তোর পুরস্কার—

[কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া অঞ্জনার হাতে দিতে গেলেন—কিন্তু অঞ্জনা তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না, শুধু "রাজা !…রাজা !" বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল]

রাজা ॥ তবে এ হার তুমি নাও বীরভদ্র, তুমি আমাকে ঐ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যের অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করতে অনুরোধ করেছিলে, তারি ফলে ঐ নিরপরাধ হতভাগ্যের জীবনহরণের পাপ থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি—

[বীরভদ্র সশ্রদ্ধ চিত্তে জানু পাতিয়া রাজ-কণ্ঠহার গ্রহণ করিল]

এইবার ঐ সম্পূর্ণ সপ্তম মূর্তি আজ রাত্রেই আমার উদ্যান-ভবনে স্থানান্তরিত কর, কাল প্রভাতেই মূর্তি উন্মোচন উৎসব। স্মরণ থাকে যেন—

[বীরভদ্র সম্মতি জানাইল]

শ্রীমান॥ [তিনি কিন্তু এ সব কথায় কান না দিয়া সপ্তম প্রতিমা দর্শন মাত্র, পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া, বিস্ময়বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে প্রতিমাটি স্পর্শ করিবামাত্র ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তখনি ছুটিয়া আসিয়া রাজার চরণে পড়িয়া কহিলেন] আমি গড়িনি, আমি গড়িনি···ও মূর্তি আমি গড়িনি—[কিন্তু এই কথাতে কি এক বিষম অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়া দেহ-মনের পরিপূর্ণ আকুলতায় কহিতে লাগিলেন] না—না—, গড়েছি, আমিই গড়েছি, ওর প্রতিটি অণু পরমাণু আমি গড়েছি, আমার জীবনের শেষ দিন বলে আমারি মানসী-প্রতিমা মূর্তিমতী হয়েছে আজ!···তুমি যাও রাজা, তুমি যাও—আমার এই নিভৃত অঙ্গনে তোমরা কেন? কেন তোমরা? যাও, যাও, তোমরা যাও—

রাজা॥ ওরে উন্মাদ! সরে দাঁড়া! বীরভদ্র, নিয়ে চল ঐ সপ্ত প্রতিমা আমার রাজোদ্যানে—

শ্রীমান॥ না—না—না! [রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন]

রাজা॥ ছিঃ শিল্পী!

শ্রীমান॥ [রাজার চরণে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে] আমি গড়েছি, সপ্ত প্রতিমাই আমি গড়েছি, আমার পুরস্কার কই? দাও—দাও—আমায় আমার পুরস্কার দাও—

রাজা॥ সেদিকে দেখছি ভুল নেই! পুরস্কার [হাসিয়া]···কি পুরস্কার তুমি চাও শিল্পীবর?

শ্রীমান॥ তোমার প্রতিজ্ঞা···তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর—

রাজা॥ কি তোমার পুরস্কার? শুনি!

শ্রীমান॥ শুধু একটি প্রার্থনা।

রাজা॥ প্রার্থনা?···কি প্রার্থনা?

শ্রীমান ॥ মূর্তি সম্পূর্ণ হ'লে শিল্পী তাকে পূজা করে। আমার সেই মূর্তিপূজা হয়নি রাজা! আজ রাত্রে, নিশীথে···আমি মূর্তিপূজা করব। পূজা শেষে, কালপ্রভাতে ঐ মূর্তি স্থানান্তরিত করো। আজ নয়, আজ এই রাত্রে নয়—শুধু এই। শুধু এই!

রাজা ॥ শুধু এই? অর্থ নয়, মণি-মাণিক্য নয়, শুধু এই?

শ্রীমান ॥ [পরম মিনতিতে] শুধু এই! শুধু এই!

রাজা ॥ বেশ তাই হোক। এস বীরভদ্র, অতিথিনিবাসে নিরাশ রাজন্যবৃন্দের নিকট সপ্তম প্রতিমা সম্পূর্ণ হবার শুভ সংবাদ আমি স্বয়ং বহন করব।

[বীরভদ্রসহ রাজার প্রস্থান। শ্রীমানও তখনি সপ্তম প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইলেন। অঞ্জনা, রাজা ও বীরভদ্র অঙ্গনের বাহিরে গিয়াছেন কিনা চোরের মতো চুরি করিয়া দেখিয়া লইয়া, ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমানের হাত ধরিল]

অঞ্জনা ॥ শিল্পি!

শ্রীমান ॥ [চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখেন অঞ্জনা]—অঞ্জনা?

অঞ্জনা ॥ হাঁ।···শীগ্‌গির আমার সঙ্গে এস···

শ্রীমান ॥ কোথায়?

অঞ্জনা ॥ তোমার শিল্পশালায়—

শ্রীমান ॥ কেন?

অঞ্জনা ॥ কথা নয়, কথা নয়, কোন কথা নয়। রাণীর বিষম বিপদ। যদি তাঁকে বাঁচাতে চাও, আমার সঙ্গে এস···দেরিনয়···এক মুহূর্ত দেরি নয়—

[শিল্পশালার দিকে ছুটিল]

শ্রীমান ॥ রাণী কোথায় আমি জানি।

[ছুটিয়া সপ্তম প্রতিমার সম্মুখে গিয়া তাহার চরণে মাথা রাখিয়া]

—এ তোমার কি খেলা দেবি!

[সপ্তম প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল]

শ্রীমান ॥ তুমি পালাও···তুমি পালাও! রাজা এখনো শয়নাগারে ফেরেন নি, তিনি গেছেন অতিথি-নিবাসে, এই অবসরে তুমি পালাও—

সপ্তম প্রতিমা ॥ [কোন কথা কহিল না, শুধু শ্রীমানের সম্মুখে হস্ত দুখানি প্রসারিত করিল]

শ্রীমান ॥ নামো, নামো, ঐ বেদী থেকে নেমে এস।

সপ্তম প্রতিমা ॥ আমার হাত ধর—

[শ্রীমান হাত ধরিলেন] এইবার চল—

শ্রীমান ॥ কোথায় ?

সপ্তম প্রতিমা ॥ রাজার শয়নাগারে নয় তোমার কুঞ্জে। তোমার যন্ত্র-পাতি নাও, তোমার বাঁশী নাও। তারপর চল দূরে—দূ—রে, আ—রো দূরে! সমুদ্রের পারে কিম্বা পাহাড়ের ধারে—যেখানে রাজা নেই, প্রাচীর নেই, অবগুণ্ঠন নেই, আবরণ নেই—

শ্রীমান ॥ [হাত ছাড়িয়া দিয়া] তোমার মুখে এ কি কথা! তোমার চোখে ও কিসের আগুন ?

সপ্তম প্রতিমা ॥ লোভের আগুন! কি লোভেই লুব্ধ করেছ তুমি শিল্পি —যে আমার অবগুণ্ঠন খসে গেছে, পাষাণেও কথা ফুটেছে!

শ্রীমান ॥ লুব্ধ করেছি—আমি ?—তোমায় ?

সপ্তম প্রতিমা ॥ হাঁ,—তুমি!—আমায়। জানি আমি সুন্দর, কিন্তু কে আমায় সুন্দর করেছে ? রাজা নয়, তুমি। তোমার চোখের···তোমার হাতের ···তোমার বুকের আলো আমার চোখে মুখে বুকে আলো জ্বেলেছে! সেই আলোর মদে মাতাল হয়েছি আমি! আলো কই ? আলো দাও! আরো আলো—আরো—আরো!

শ্রীমান ॥ হাঁ, দেবো ; কিন্তু আজ নয় এ জন্মে নয়—পরজন্মে।

সপ্তম প্রতিমা ॥ পরজন্মের কথা মিথ্যা! কে তার খোঁজ রাখে! আমি জানি—শুধু আজ! আজ আমাকে রূপ দাও, রস দাও, গান দাও, গন্ধ দাও— আজ আমার মাঝে তোমার মনের কামনা মূর্তিমতী হোক্, সপ্তম প্রতিমা সার্থক হোক!

শ্রীমান ॥—পরজন্মে, পরজন্মে। আমার এ জন্মের কাজ শেষ হয়েছে, ক্ষমতা

শেষ হয়েছে। মূর্তির পর মূর্তি গড়ে তোমার যে রূপের পরিকল্পনা করেছি, ঐ ছ'টি মূর্তিতে তার এক বিন্দুও আভাস দিতে পারি নি! গড়বো, আমি তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়বো, কিন্তু আজ নয়; সেই দিন—যে দিন তুমি আমি এক দেহ এক মন, এক প্রাণ হব—সে আজ নয়—আজ নয়—আজ তুমি যাও—

সপ্তম প্রতিমা॥ এক দেহ! এক মন! এক প্রাণ!

শ্রীমান॥ হাঁ, এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ···সেই দিন যেদিন তোমাতে আমাতে কোন ব্যবধানই রইবে না; রাজা না, প্রাচীর না, ঐ অবগুণ্ঠন না; বুকের বসন, দেহের আবরণও না···কিন্তু সে আজ নয়, আজ নয়, আজ তুমি যাও—

সপ্তম প্রতিমা॥ [আকুল আবেগে] আজ! আজ! এখনি।

[বেদী হইতে তখনি নামিয়া ব্যগ্র বাহুতে শ্রীমানকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন। দেখা গেল সপ্তম প্রতিমা রাণী স্বয়ং]

শ্রীমান॥ না—না—না—[সরিয়া গেলেন]···তুমি যাও···তুমি তোমার শয়নাগারে যাও। আর মুহূর্তের বিলম্ব বিষম বিপদ ডেকে আনবে। দোহাই তোমার তুমি যাও—যাও—যাও—যাও—

রাণী॥ [হাঁ, বৃথা সময় যায়।—তারা কেউ এলেই দেখবে সপ্তম বেদী শূন্য। তখনি—তখনি—মহা সর্বনাশ। এসো—তার পূর্বেই আমরা—

[হাত বাড়াইয়া দিলেন]

শ্রীমান॥ [শেষ চেষ্টায়] আমি তবে এখনি চীৎকার করে রাজাকে ডাকবো!

রাণী॥ সাবধান! শোন। এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন তুমি আমায় চেয়েছিলে?

শ্রীমান॥ আমি তোমাকে চাই নি রাণি!

রাণী॥ চাও নি?

শ্রীমান॥ না।

রাণী॥ মিথ্যা কথা। নারী সব ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু ভুল বোঝে না

শুধু ঐখানে। ঐখানে কেউ কোনোদিন তাকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তুমি আমায় চেয়েছ, তুমি আজও আমায় চাও—

শ্রীমান ॥ হাঁ, চাই। কিন্তু তোমার ও মূর্তি নয়। তোমার যে মূর্তি আমি চাই, সে মূর্তি আমি এ জীবনে চেয়ে দেখতে পারব না বলেই আমি সে মূর্তি গড়ি নি।

রাণী ॥ তার অর্থ ?

শ্রীমান ॥ তোমার সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা যে-চোখে দেখতে হয় আমি সে চোখ হারিয়েছি। হারিয়েছি বলেই সে মূর্তি গড়ি নি—গড়্‌ব না।

রাণী ॥ সেই হেঁয়ালিই রয়ে গেল শিল্পি! তুমি আমায় পাগল করলে! তুমি আমায় মাতাল করলে! [আবেগে] শিল্পি! শিল্পি! আমার সে মূর্তি কি তোমার চোখ ঝল্‌সে দেবে ?

শ্রীমান ॥ না, রাণী না। আজ যদি তোমার সে মূর্তি গড়তাম, তবে তা চোখ ঝল্‌সে দিত না, আমার দেহ মনে আগুন জ্বালতো!

রাণী ॥ অলঙ্কার না হয় তাতে নাই দিতে!

শ্রীমান ॥ অলঙ্কার সে মূর্তির কলঙ্ক। অলঙ্কার নয়, অলঙ্কার নয়—

রাণী ॥ একটিমাত্র কণ্ঠহার, এক জোড়া বলয়, এক জোড়া চরণপদ্ম—তাও না ?

শ্রীমান ॥ [বিরক্ত হইয়া] না—না না!

রাণী ॥ কিন্তু এই অবগুণ্ঠন ?

শ্রীমান ॥ অবগুণ্ঠন দূরে থাক, কোন আবরণই না।

রাণী ॥ [এইবার বোধ হয় বুঝিয়া উঠিয়া] বুঝেছি, বুঝেছি,—তবে কি—তবে কি—

শ্রীমান ॥ চুপ!

রাণী ॥ [আকুল আবেগে] তাই হোক্—তাই হোক্। ওগো শিল্পি, তাই হোক্!

শ্রীমান ॥ [পরিত্রাহি চীৎকারে] রাজা !

রাণী ॥ বটে !

শ্রীমান ॥ হাঁ।

রাণী ॥ [স্তম্ভিত হইলেন। ওদিকে শ্রীমান দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে রাণীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাতে তাকাইয়া আছেন] উত্তম !—তবে একবার রাজাকে ডাকব আমি। রাজা ! রাজা !

[দূর হইতে অঞ্জনার কণ্ঠ শোনা গেল]

অঞ্জনা ॥ রাজা ! রাজা ! এই দিকে—ঐ—রাণীর কণ্ঠস্বর—

রাণী ॥ এইবার ? [শ্রীমানের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন]

শ্রীমান ॥ [পরম মিনতিতে] পালাও ! এখনো পালাও ! এখনো সময় আছে !

রাণী ॥ [হাত দুখানি পুনরায় তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া] হাত ধর··· নিয়ে চল···

শ্রীমান ॥ [মুখ ফিরাইলেন]

রাণী ॥ না !

[রাজা ও বীরভদ্রসহ আলো হস্তে অঞ্জনার প্রবেশ]

রাণী ॥ [সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া শ্রীমানকে] আমার সপ্তম প্রতিমা ?

অঞ্জনা ॥ রাণি রাণি ! তুমি এখানে !

রাজা ॥ এখানে, এ অসময়ে কেন রাণি ? অঞ্জনা তোমাকে কোনোখানে খুঁজে না পেয়ে আমার কাছে ছুটে গেছে অতিথি-নিবাসে। অতিথি-নিবাসেই শুনতে হ'ল রাণী এই নিশীথে রাজান্তঃপুরে নেই। এ কি লজ্জার কথা রাণি ?

রাণী ॥ [রাজার কথায় কান না দিয়া শ্রীমানের প্রতি] আমার সপ্তম প্রতিমা ?

[উত্তর না পাইয়া রাজার প্রতি]

কোথায় আমার সপ্তম প্রতিমা ? [ক্ষোভে রোষে কাঁদিয়া ফেলিলেন]

[সকলে তাকাইয়া দেখেন সপ্তম বেদী শূন্য]

রাজা ॥ [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ [নির্বাক]

রাজা ॥ [ক্রুদ্ধ স্বরে] কোথায় সেই সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ [অন্তরযুদ্ধে কাতর হইয়া] রাণি ! রাণি !

রাজা ॥ এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, কোথায় রাণীর সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ রাণীকেই জিজ্ঞাসা করুন রাজা ।

রাজা ॥ [রাণীর প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে] রাণি ?

রাণী ॥ শয়নাগারে খবর পেলাম ঐ উন্মাদ আমার সপ্তম প্রতিমা—ঐ—ঐ রূপসাগরের জলে নিক্ষেপ করেছে—খবর পেয়েই আমি—

রাজা ॥ বীরভদ্র, ঐ দুর্বৃত্তকে বধ কর—এখনি—এই মুহূর্তে—

[বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিল]

রাণী ॥ [রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া] না—না ।

রাজা ॥ বধ কর বীরভদ্র, বধ কর—

রাণী ॥ না রাজা, না—

[রাজার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন]

শ্রীমান ॥ না রাজা, না—আমায় বধ কর । যদি রাণীর সপ্তম প্রতিমা চাও, তবে আমায় বধ কর ।

রাণী ॥ উন্মাদ ! উন্মাদ ! শিল্পী আজ উন্মাদ ! রাজা ! রাজা ! কোন দিন কি শুনেছ শিল্পীর মৃত্যুতে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ?

শ্রীমান ॥ হয় । সপ্তম প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় । কেন হবে না ? [রাণীকে] দুইটি আত্মার প্রতি-মুহূর্তের কামনায় তোমারি গর্ভে হবে আমার স্থান । দুজনের হবে এক দেহ এক মন এক প্রাণ । আমি, আমি হব তোমার পুত্র, তুমি হবে আমার মা !

রাজা ॥ উন্মাদ ! পরিপূর্ণ উন্মাদ !

রাণী ॥ শিল্পি ! শিল্পি !

শ্রীমান ॥ পুত্র হয়ে সন্তানের চোখ দিয়ে শিল্পী তোমার সপ্তম প্রতিমা

গড়বে!—প্রাণভরে দেখবে। সেই মূর্তি, যার কোন অলঙ্কার নেই, আভরণ নেই, আবরণ নেই।

রাজা॥ নগ্নমূর্তি?

শ্রীমান॥ হাঁ, নগ্নমূর্তি, মাতৃমূর্তি।—কিন্তু এ জন্মে তো তা পারব না রাণি! তাই চাই মৃত্যু, দাও মৃত্যু। ওগো রাণি, তোমার শূন্য বুকে আমায় তুলে নিয়ো, অমৃত দিয়ো, স্নেহ দিয়ো—

রাজা॥ [বীরভদ্রের প্রতি] মায়াবী ঐ শিল্পী—বধ কর—

[বীরভদ্র অসি হানিল, রাণী নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই ছয় মূর্তির পাশে এক অপরূপ মহিমায় মর্মরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন]

[কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৫]

অপরাজিতা

পরিচয় :

সূর্যকান্ত চৌধুরী এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী দুর্গাদহ পরগনার জমিদারদ্বয়। প্রত্যেকের আট আনা অংশ। সম্বন্ধে জ্ঞাতি ভ্রাতা। সূর্যকান্ত বড় তরফ এবং বিশ্বজিৎ ছোট তরফ নামে আখ্যাত। পূর্বপুরুষদের একই বাড়ী ছিল, এক্ষণে তাহা বিভক্ত।

সূর্যকান্তের স্ত্রীর নাম অপরাজিতা দেবী। সূর্যকান্তের একমাত্র পুত্র, নাম চন্দন, বয়স সাত।

ব্লাড-প্রেসারে সূর্যকান্ত চৌধুরী মরণাপন্ন কাতর। বিশ্বজিতের পরিবার দার্জিলিংএ, কিন্তু তিনি নিজে পূজা-উপলক্ষে বাড়ীতেই আছে।

[সূর্যকান্তের শয়ন-গৃহ।

শয়ন-কক্ষ। কক্ষ-সংলগ্ন সুবিস্তৃত বারান্দা।

বারান্দায় অর্কিড ঝুলিতেছে। গৃহপার্শ্বে শেফালি গাছে অজস্র শেফালিকা ফুটিয়া শরতের আগমনী ঘোষণা করিয়াছে। বারান্দার রেলিং বাহিয়া একটি মাধবীলতা কাছে আসিতে চায়।

দুর্গাপূজা আসন্ন। আজ শারদীয়া পঞ্চমী। সন্ধ্যা।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান সূর্যকান্ত চৌধুরী, জীবনসংশয়কাতর। পার্শ্বে স্ত্রী অপরাজিতা দেবী। দূরে দাসী মল্লিকা, আদেশের অপেক্ষায় আছে।

জমিদার বাড়ীর স্বাভাবিক কোলাহল ডাক্তারের আদেশে স্তব্ধ]

অপরাজিতা ॥ [স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইলেন] সন্ধ্যা হ'ল আর বাইরে নয়, ঘরে চল।

সূর্যকান্ত ॥ ঘরে আমার ভালো লাগে না। বাইরে বেশ লাগছে। আজ আমি ভালো বোধ করছি। হয়ত এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারি। তুমি কি মনে কর বৌ?

অপরাজিতা ॥ যে রকম তোমার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে—[থামিয়া গেলেন।]···সিন্দুক থেকে সব গয়না টেনে বের করেছিলুম।

সূর্যকান্ত ॥ কেন?

অপরাজিতা॥ গায়ে দিয়ে ঠাকুর-পোকে দেখালুম। যে রকম তোমার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তা'তে মনে হল ঠাকুর-পোর চোখ ঝল্‌সে দেবার সুযোগ হয়ত আর মিলবে না।

সূর্যকান্ত॥ দেখে কি বলল ?

অপরাজিতা॥ দেখ্‌লই না। মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে আকাশপানে চেয়ে রইল।

সূর্যকান্ত॥ তুমিই পরাজিতা হ'লে অপরাজিতা!

অপরাজিতা॥ না সে! আমাকে চেয়ে দেখবার ক্ষমতাই কি তার হ'ল ?

সূর্যকান্ত॥ আমার অসুখে সে খুবই সুখী, কি বল অপরাজিতা ?

অপরাজিতা॥ চন্দন থাকতে সে কথা আর কি করে ওঠে! যখন চন্দন ছিল না, তখন তোমার সম্পত্তির লোভে ঐ জ্ঞাতি শকুন উড়তো, কিন্তু, ঐ চন্দন সে শকুন তাড়িয়েছে।

সূর্যকান্ত॥ ঠাকুরপোকে অনেক সম্বোধনেই আপ্যায়িত করেছ, কিন্তু শকুন—

অপরাজিতা॥ ঠাকুরপো শকুন নয়, শকুন হচ্ছে তোমার সম্পত্তির ওপর তার লোভটা।

সূর্যকান্ত॥ কিন্তু, তবু, চন্দনকে একটু চোখে চোখে রেখো। কোথায় সে ?

অপরাজিতা॥ তার সম্বন্ধে আমি নির্ভয়। সে খেলা করছে।

সূর্যকান্ত॥ অতটা নির্ভয় হওয়া—

অপরাজিতা॥ মায়ের চেয়েও যে তোমার বেশি দরদ দেখছি!

সূর্যকান্ত॥ ও যে আমার কী তপস্যার ধন, তা তো তোমার অজানা নেই। কিন্তু, তবু নতুন করে সে কথা মনে করতে ইচ্ছে হচ্ছে অপরাজিতা। নিঃসন্তান ছিলুম বলে মনের দিক দিয়ে যে খুব রিক্ত ছিলুম, তা নয়। মনের সকল কামনাকে তুমিই পূর্ণ করেছিলে। কখন কখন এমন খেলাও তোমার সঙ্গে খেলেছি যেন তুমিই আমার সন্তান। সন্তানের মতো তোমার আদর করতে গিয়ে তোমার হাতে যে লাঞ্ছনা পেয়েছি, চন্দনের তা সাধ্যও নেই! একটু

জল দাও অপরাজিতা। [জল পান করিয়া] তোমার হাতে সেই লাঞ্ছনার দুখ পুত্রহীনতার সকল দুঃখ দূর করেছিল। কিন্তু অপরাজিতা, পুত্র চাই বলে আমার সকল মনপ্রাণ কেঁদে উঠল সেই দিন—যেদিন তোমার ঠাকুর-পো আমার মুখের ওপর শুনিয়ে গেল, মোকদ্দমা জিতে লাভ কি? চোখ বুজলেই তো ও সম্পত্তি আমার।

অপরাজিতা॥ এই বার ঘরে চল। বাইরের এ হাওয়া তোমার সইবে না।

সূর্যকান্ত॥ সে দিনও এমনি সন্ধ্যা ছিল, দমকা হাওয়ার মতোই আমি ঘরে ঢুকলুম। তুমি পিছু পিছু ছুটে এলে। আমি তোমার হাত দুখানি চেপে ধরলুম, বললুম—

অপরাজিতা॥ মল্লিকা, দেখে আয়, মন্দিরের আরতি এখনো সুরু হল না কেন।

মল্লিকা? আরতি তো হচ্ছে মা।

সূর্যকান্ত॥ আমি তোমার হাত দুখানি চেপে ধরে বললুম—

অপরাজিতা॥ [মল্লিকাকে] হচ্ছে হোক্, তবু তুই দেখে আয়।

সূর্যকান্ত॥ "হচ্ছে হোক তবু তুই দেখে আয়?"

অপরাজিতা॥ চন্দন যে এতক্ষণেও ফিরলনা সে খেয়াল কি তোর নেই মল্লিকা? [মল্লিকা চলিয়া গেল]

সূর্যকান্ত॥ তোমার হাত দুখানি বুকে নিয়ে আমি তোমায় সব বললুম। তুমি কাঁদতে লাগলে।

অপরাজিতা॥ সেই জন্যে আমি কেঁদেছিলুম?

সূর্যকান্ত॥ তবে?

অপরাজিতা॥ কি কাজ আজ সে কথায়? তুমি কি ঘরে যাবে না?

সূর্যকান্ত॥ না অপরাজিতা, সেদিনকার কথা আমি ভুলি নি। তুমি পোষ্যপুত্র নিতে বললে। কিন্তু…অপৌরুষের অত বড় জয়ধ্বজা আমার মাথার তুলে দিতে চেয়েছিলে ভেবে আজ কি তোমারই লজ্জা হচ্ছে না অপরাজিতা?

অপরাজিতা॥ লজ্জা যে কার, তোমার না আমার—সে কথা এক শুধু

ভগবানই জানুন। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] হাঁ, আজ আমার দুঃখই হচ্ছে— কেন আমি তোমাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে বারণ করেছিলুম। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] লজ্জা যে কার সেই দ্বিতীয় পক্ষই তোমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিত।

সূর্যকান্ত॥ তাই নাকি! রাগের মাথায় আজ তোমার মুখে কিছুই বাধছে না দেখছি! কিন্তু সেদিন অত দুঃখেও আমার মাথা ঠিক ছিল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গিয়েও, করব না ঠিক করলুম, শুধু তোমার মুখের দিকেই চেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করলেই যে তোমায় একতিল কম ভালোবাসতুম তা নয় অপরাজিতা, সে সন্দেহ বোধ করি তোমারও ছিল না। কিন্তু—

অপরাজিতা॥ কিন্তু?

সূর্যকান্ত॥ তাহলে তোমার বন্ধ্যাত্বের অপবাদটাই সংসারময় রাষ্ট্র হত। তোমায় আমি সেই অপমান থেকেই বাঁচিয়েছিলুম অপরাজিতা এবং ভুল যে আমি করিনি, পরে তো তা বুঝেচ!

অপরাজিতা॥ ভুল যে তুমি করনি, তোমার এই ধারণাই অক্ষয় হোক অটুট থাক!···হাঁ, ঐ গৌরব তোমায় দিতে আজ আমার এতটুকু আপত্তি নেই, কারণ,—

সূর্যকান্ত॥ কারণ?

অপরাজিতা॥—দেখচি ঐ জয়-গৌরব কবিরাজের কস্তুরীর মতোই তোমায় মুমূর্ষু দেহে ক্রিয়া করছে! [মল্লিকা আসিয়া দাঁড়াইল]

মল্লিকা॥ মা, সর্বনাশ!

সূর্যকান্ত॥ কি—কি সর্বনাশ?

মল্লিকা॥ দাদাবাবু যে কোথায় কেউ বলতে পাচ্ছে না।

অপরাজিতা॥ ছোট তরফ দেখে এসেছিস?

মল্লিকা॥ না মা, তা তো দেখিনি!

অপরাজিতা॥ আজ সেখানে পুজোর সং এসেছে। চন্দন শোনা অবধি ছটফট্ করছিল। সেখানে দেখে আয় [মল্লিকা ছুটিয়া গেল]

সূর্যকান্ত ॥ ছোট তরফে গেছে চন্দন! আজ আমি ঝি-চাকর সব ডিসমিস করব।

অপরাজিতা ॥ কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই।

সূর্যকান্ত ॥ ভয় নেই, তুমি বল কি অপরাজিতা?

অপরাজিতা ॥ না, ভয় নেই। অনর্থক তুমি উত্তেজিত হয়ে ব্লাড-প্রেসার বাড়িয়োনা, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে শোও দেখি।

সূর্যকান্ত ॥ তুমি—তুমি জানোনা বৌ, ছোট···ওর জন্যে ওৎ পেতে আছে। বাড়ীশুদ্ধ্ সবাইকে দার্জিলিং পাঠিয়েছে, কিন্তু তবু নিজে যায়নি। কেন? আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে?

অপরাজিতা ॥ হতেও পারে। সেদিন তো সেই কথাই বলে পাঠিয়েছিল। আমি আসতেও বলেছিলুম।

সূর্যকান্ত ॥ এসেছিল?

অপরাজিতা ॥ না।

সূর্যকান্ত ॥ জলের গ্লাসে টুক্ করে একফোঁটা বিষ মিশিয়ে দেবার এমন স্থবর্ণ স্থযোগটা—

অপরাজিতা ॥ কেন যে পায়ে ঠেল্‌ল, সেই জানে।

সূর্যকান্ত ॥ উপরো-উপরি দু-দুটো পাপ করতে ওর ভয় বুঝলে? এ মরার ওপর তাই ও খাঁড়ার ঘা দেয় নি। ওর লক্ষ্য ঐ চন্দন। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন] কই চন্দন? কোথায় চন্দন? [ছুটিয়া ভৈরব চাকর আসিয়া দাঁড়াইল]

ভৈরব ॥ তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না মা।

সূর্যকান্ত ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] চন্দন—চন্দন—[অপরাজিতা তাঁহাকে ধরিলেন]

অপরাজিতা ॥ ছোট তরফ—ছোট তরফ—[ছুটিয়া মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ সেখানেও তাকে পেলুম না মা।

সূর্যকান্ত ॥ চ—ন্—দ—ন! [মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন]

অপরাজিতা ॥ ডাক্তার—ডাক্তার—

[ভৈরব "ডাক্তার ডাক্তার" চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। চীৎকারে অন্তঃপুরের লোকজনেরা ছুটিয়া আসিল। একজন ডাক্তারও আসিলেন। সকলেরই মহাব্যস্ততা। কোলাহল। ক্রন্দন। ডাক্তারের কথামত রোগীকে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পথেই রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইল]

ভৈরব ॥ [চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইল—] জ্ঞান হয়েছে—জ্ঞান হয়েছে।

ডাক্তার ॥ চুপ। সকলে একেবারে চুপ। এখানে ভিড় করলে চলবে না।

[ভৈরব আগন্তুকদিগকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। এদিকে রোগীকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া অন্যান্য লোকেরাও চলিয়া গেল। ঘরে শুধু ডাক্তার, অপরাজিতা এবং মল্লিকা রহিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল ভৈরব। ক্ষণকাল পরে অপরাজিতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অপরাজিতা ॥ ভৈরব, চন্দনকে আমি এখনি চাই।

ভৈরব ॥ দেওয়ান মশাই থেকে সুরু করে সবাই তাকে খুঁজছেন। কর্তা ভালো আছেন তো ?

অপরাজিতা ॥ কর্তার জীবন ঐ চন্দন। চন্দনকে যদি না পাও ভৈরব, কর্তাকে আজ হারাবে। ছোট—ছোট তরফের কর্তা কোথায় ভৈরব ?

[বিশ্বজিৎ চৌধুরীর প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ ॥ সশরীরে হাজির বৌদি। দাদার নাকি—

[দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার দেখা দিলেন]

ডাক্তার ॥ আবার উনি মূর্ছিত হয়েছেন। ইনজেকশন দেওয়া কর্তব্য। দি ?

অপরাজিতা ॥ কর্তব্য মনে হলে অবশ্য দেবেন। [ডাক্তার দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিলেন]

অপরাজিতা ॥ [বিশ্বজিতের চোখে চোখে চাহিয়া] চন্দন ?

বিশ্বজিৎ ॥ চন্দন ! কোথায় ?

অপরাজিতা ॥ [ভৈরবকে] চন্দনকে চাই ভৈরব, এখনি। এবং যে তাকে লুকিয়ে রেখেছে তার মাথা চাই। বুঝলে ?

ভৈরব ॥ তোমাকে আমি কোনদিনই ভুল বুঝি নি মা—[ছুটিয়া চলিয়া গেল]

বিশ্বজিৎ ॥ চন্দন কি তবে হারিয়ে গেল ?

অপরাজিতা ॥ [নীরব রহিলেন]

বিশ্বজিৎ ॥ তবে আমিও যাই—খুঁজে দেখি—

অপরাজিতা ॥ —না।

বিশ্বজিৎ ॥ না! কেন ?

অপরাজিতা ॥ আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়।

বিশ্বজিৎ ॥ কিন্তু তোমারও কি ইচ্ছা নয় ?

অপরাজিতা ॥ স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা।

বিশ্বজিৎ ॥ বটে! [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] স্বামীর ইচ্ছানুযায়ীই তুমি সব···স—ব কাজ কর, না ?

অপরাজিতা ॥ হাঁ।

বিশ্বজিৎ ॥ এখানেও যে দেখচি মাধবীলতা! তোমাদের বাগানে সেই দীঘির ধারে সেই বেদী-পীঠে ওর চাঁদোয়া দেখেছিলুম। সেই যে···সেই দিন··· সেদিনও এমনি কাঁচা জ্যোৎস্না ছিল মনে পড়ে ?

অপরাজিতা ॥ হাঁ, সেখানেও মাধবীলতা আছে। এটা তারি চারা। আমিই তার পরদিন এখানে এনে বারান্দায় তুলে দিয়েছি। ও ঘরের ভেতর যেতে চায়। আমি ঐ জানালা তাই বন্ধ রাখি। আর কিছু শোনবার আছে ?···আমি এখন স্বামীর কাছে যেতে পারি বোধ হয় ?

বিশ্বজিৎ ॥ স্বামীরই ইচ্ছা বুঝি ?

অপরাজিতা ॥ আজ্ঞে হাঁ!···কিন্তু ঐ কথাটাই বা বারেবারে তোলা কেন ? [ক্ষণেক থামিয়া] এই প্রশ্ন তুলেই তো আমায় লজ্জা দিতে চাইছ যে সাত বছর পূর্বে···সেই-যে-হঠাৎ-একদিন···তোমায় সেই মাধবীলতার কুঞ্জে ডেকে এনেছিলুম ···'সেও কি স্বামীরই ইচ্ছায়' ?

বিশ্বজিৎ ॥ তা কেন ? তোমার স্বামী তো সে দিন গৃহে ছিলেন না, কলকাতা গিয়েছিলেন। একলা থাকতে তোমার ভয় পেয়েছিল, বিশেষ···রাত্রে, —তাই। হাঁ, তাই তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে। সে আবাহনকে স্বামীর ইচ্ছা বলে ভুল করবার লোক তো আমি নই!

অপরাজিতা॥ স্বামী আমায় ডাকছেন, তাই সংক্ষেপেই বলে যাচ্ছি—

বিশ্বজিৎ॥ স্বামী তোমায় ডাকছেন! আমি যে বধির, একথা তো জানা ছিল না!

অপরাজিতা॥ মনে মনে···মনেরও অজ্ঞাতে যে ডাকা যায় এবং মনে মনেই যে, সে ডাক শোনাও যায়, এ তো শেখাবার কথা নয় ঠাকুর পো! এ কথাই বা তোমায় কি করে বোঝাই যে স্বামীর অজ্ঞাত ইচ্ছাতেই আমি তোমায় সেই-এক-রাতে আবাহন করেছিলুম···স্বামী কামনা করেছিলেন ঐ চন্দনকে, কিন্তু তা'কে গঠন করবার শক্তি তাঁর ছিল না বলেই—

বিশ্বজিৎ॥ —তুমি আমাকে···

অপরাজিতা॥ চুপ!···তুমিই না মুখের ওপর একদিন শুনিয়েছিলে—যত পারুন মোকদ্দমা জিতুন—চোখ বুজলেই তো ও সম্পত্তি আমার? আমি তাঁকে পোষ্যপুত্র নিতে বললুম। তিনি বললেন বরং মৃত্যু ভালো, তবু অপৌরুষের ঐ অপবাদ,···বলেই প্রস্তাব করলেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবেন।

বিশ্বজিৎ॥ করলেন না কেন?

অপরাজিতা॥ আমি জানতুম, তাই বাধা দিলুম। শুধু তাও তো নয়, তিনি যদি অপৌরুষের সত্য অপবাদ মাথায় তুলে নিতে রাজী নন, আমিই বা কেন বন্ধ্যাত্বের মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নেব? আমি বাধা দিলুম। বাধা দিলুম বটে, কিন্তু নিরুপায় স্বামীকে যে তুমি অমনি অপমান করবে এ অপরাজিতা তো তাও সইতে পারল না। আরো সইতে পারল না স্বামীর সেই বুভুক্ষিত বুকের হাহাকার···"আমার বুকে সন্তান দাও অপরাজিতা।"

বিশ্বজিৎ॥ তাই!

অপরাজিতা॥ হাঁ তাই তাঁর স্ত্রীর বুকে যে সক্ষমা নারী ঘুমিয়েছিল, সে জেগে উঠল। তাঁর স্ত্রী ছিল সতী, কিন্তু এ নারী ছিল মা।

বিশ্বজিৎ॥ অনেক নতুন কথা শিখছি বলে মনে হচ্ছে!

অপরাজিতা॥ শিখবে বই কি! আমার স্বামীর সম্পত্তিতে তোমার ছিল অন্যায় লোভ। তোমার সেই লোভ চূর্ণ করবার জন্যে তোমাকেই আমার

অস্ত্র করলুম। [হাসিয়া উঠিলেন] কাঁটা দিয়েই যে কাঁটা তুলতে হয়, এ শিক্ষাটাও আজ তোমার হোক্!

বিশ্বজিৎ॥ বটে! আমাকে দিয়েই তুমি আমাকে জয় করে অ-পরাজিতার মাল্যচন্দন পরিয়ে দিলে তোমার ঐ স্বামীর কণ্ঠে! [উত্তেজিত হইয়া] আমি এ ভাবে পরাজিত হব না অপরাজিতা। কোথায় চন্দন—কোথায় সে—[ছুটিয়া যাইতেই ভৈরবের প্রবেশ। তাহার বুকে ঘুমন্ত চন্দন]

ভৈরব॥ পেয়েছি মা—, [দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তারের মুখ বাহির হইল]

ডাক্তার॥ [অপরাজিতাকে] শীগ্‌গীর আসুন তো—[অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ ঘরে গেলেন]

ভৈরব॥ সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজে অবশেষে পেলুম কিনা ঠাকুরঘরে প্রতিমার পেছনে—কি ঘুমই না ঘুমুচ্ছে, কিছুতেই জাগল না!

বিশ্বজিৎ॥ [অস্বাভাবিক আগ্রহে চন্দনকে দেখিতেছিলেন, উগ্র ব্যগ্রতায়] আমাকে একটিবার দাও তো ভৈরব···আমাকে একটিবার দাও—

ভৈরব॥ না কর্তা—[সভয়ে সরিয়া গেল]

[অপরাজিতা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অপরাজিতা॥ আমার বুকে দাও ভৈরব! [ভৈরব দিলে] ঘরের ভেতর যাও ভৈরব। [ভৈরব গেলে] তুমি চন্দনকে বুকে নিয়ে এই ইজিচেয়ারে শুয়ে থাক।···বিস্মিত হচ্ছ যে? ওকে তোমার বুকে তুলে দিতে আমার এতটুকু ভয় নেই ঠাকুর পো। দার্জিলিংএ তোমার যে খোকা আছে তাকে যেদিন গলা টিপে মারবে সেই দিন তোমায় আমি ভয় পাবো, আজ নয়। নাও—দেরী ক'রো না—[চন্দনকে তাঁহার বুকে দিয়া] হাঁ, আর ঐ মাধবীলতাটা—

[ভৈরব বাহিরে আসিল]

ভৈরব॥ জ্ঞান হয়েছে মা। তোমায় ডাকছেন।

অপরাজিতা॥ যাচ্ছি। ঐ মাধবীলতাটা সরিয়ে দাও ভৈরব, ওতে সাপ থাকে।

[পূর্বাশা (কুমিল্লা) আশ্বিন, ১৩৩৯]

বিদ্যুৎপর্ণা

[দৃশ্য : নাটমন্দির। দেবদাসিগণের সন্ধ্যারতির নৃত্যগীত। নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে যাইবে, এমন সময়, দ্বিতলের অলিন্দ হইতে মন্দির-পুরোহিতের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম শিষ্য ইন্দ্রজিৎ সোপান-পথে ছুটিয়া নিম্নে আসিয়া সেই যবনিকা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন—"বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!"]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ [অন্তরাল হইতেই] না!···না!···না!

ইন্দ্রজিৎ ॥ একটি কথা! একরত্তি একটি কথা! দাঁড়াও···শোন···

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হয় না! হয় না!···এখন নয়, এখন নয়!

ইন্দ্রজিৎ ॥ কখন? কখন?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ইঁদুর যখন সাপ ধরবে তখন! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[পূর্বোক্ত সোপান-পথে পুরোহিত ত্বরিৎ-পদে নামিয়া আসিয়া ইন্দ্রজিৎ-হস্তধৃত যবনিকা-প্রান্ত-দ্বয় মুক্ত করিয়া দিয়া ইন্দ্রজিৎকে মুখোমুখি দাঁড় করাইলেন]

পুরোহিত ॥ ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ ॥ [অপরাধীর মত চমকিয়া উঠিয়া, পরে, সংযতভাবে মাথা নিচু করিয়া] পিতা!

পুরোহিত ॥ এই বার বার তিনবার আমার উপদেশ—আমার আদেশ—তুমি লঙ্ঘন করলে!···করলে কি না বল!

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নতমুখে নীরব রহিলেন]

পুরোহিত ॥ আমার আদেশ ছিল তুমি পাতাল-গুহার নির্জনে একমনে তিনমাস যোগাভ্যাস করবে। কিন্তু, তার প্রথম তিন দিনেই তুমি তিনবার তোমার আসন ত্যাগ করে ছুটে এসেছ ঐ কালনাগিনীর পাশে!

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নতমুখে নীরবই রহিলেন]

পুরোহিত ॥ আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি জানো ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [তথাপি নীরব রহিলেন]

পুরোহিত ॥ নীরব কেন ? উত্তর দাও ! আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ প্রাণদণ্ড।

পুরোহিত ॥ আমি কিভাবে সে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ ক্ষুধিত সর্পের দংশনে অপরাধীর মৃত্যু-ব্যবস্থা হয়।

পুরোহিত ॥ এখন ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার আপত্তি নেই। আমি প্রস্তুত। তবে···

পুরোহিত ॥ তবে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ তবে মৃত্যুর পূর্বে একটি প্রার্থনা !

পুরোহিত ॥ বল !

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে···

পুরোহিত ॥ বল—

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন নিবেদন করে যাব !

পুরোহিত ॥ বটে !

ইন্দ্রজিৎ ॥ হাঁ। মরতে যখন বসেছি, তখন ভয় নেই, লজ্জা নেই ! হাঁ··· একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন !···একরত্তি একটি চুম্বন !

পুরোহিত ॥ ওরে নির্লজ্জ ! আমি না তোর পিতা ! তবু তোর এত অসংযম !

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নীরব রহিলেন]

পুরোহিত ॥ ওরে অবোধ ! বিদ্যুৎপর্ণা কে জানিস ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হয়ত জানি···হয়ত জানিনে ! নিমিষের দেখা···তাই দেখি ! কে···জানতে চাইও নে ! শুধু চাই ঐ আলোর একটি ঝলক্ ! কত সহস্র জনের রঙীন কামনা, রঙীন কল্পনায় ঐ রূপ ঐ মূর্তি গড়ে উঠেছে···আমার একটি

চুম্বনে, একরত্তি একটি চুম্বনে···ঐ মূর্তি, ঐ রূপ, আরো এক তিল সুন্দর হবে··· আমি তাই চাই, আমি তাই চাই···

পুরোহিত॥ ওরে উন্মাদ! ও মানুষ নয় ও কালনাগিনী।···হাঁ কালনাগিনী। ···জানিস?···এক বৃদ্ধ বেদে ওকে কোলে করে তিনটি সাপের চুপড়ি নিয়ে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমাদের মন্দিরে এসে উপস্থিত—সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমি আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিলুম। শুনলুম বেদেনী সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে, রেখে গেছে ঐ শিশুকন্যা। মেয়েটি মায়ের মত সাপের হাতে মারা না যায় এই ভয়ে বেদে এক রকম পাগল হয়ে গেছে। মেয়েকে দুধ খেতে দিলুম, বেদে সে দুধ সাপ দিয়ে খাওয়ালে। মেয়েকে কি খাওয়ালে জানো?

ইন্দ্রজিৎ॥ কি?

পুরোহিত॥ বিষ। একতিল পরিমাণ বিষ। আমি অবাক! সে বললে 'ওকে সাপের বিষ তিল তিল করে খাইয়ে মানুষ করেছি। সাপের বিষে আর ওর মরণ নেই!'—ও হচ্ছে সেই বিদ্যুৎপর্ণা। তার পর বেদেও কিছুদিন পরে মারা গেল। কি এক খেয়ালে কালনাগিনীকে আমিও ওর পিতার মতই বিষ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি,···কিন্তু···আজ বুঝছি···আজ কেন? প্রতিদিন প্রতিরাত্রে প্রতিমুহূর্তে বুঝছি···আমি আমার আশ্রমে নিজ হাতে ঐ বিষ-বৃক্ষ রোপন করেছি···ওর ঐ নিষিদ্ধ ফল আমার স্বর্গকে নরক করেছে···আজ শয়তান শুধু তোমাদেরি স্কন্ধে ভর করে না···ও-হো-হো···আমি কি করেছি! [কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন]

ইন্দ্রজিৎ॥ আকাশের বিদ্যুৎকে আপনি পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন!

পুরোহিত॥ [সস্নেহে ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিয়া] ওরে অবোধ! [নিম্নস্বরে] ওর চুম্বনে মরণের ছায়া পড়ে, ওর স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আড়ষ্ট হয়, ওর আলিঙ্গনে মৃত্যু আলিঙ্গন দেয়!···সাবধান! অভিশাপে অভিশপ্তা ঐ নারী!··· সাবধান!

ইন্দ্রজিৎ॥ ঐ অভিশাপই আমার আশীর্বাদ!

পুরোহিত ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বজ্র-কঠোর স্বরে] তুমি তিন তিনবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ ! তার শাস্তি নিজমুখেই স্বীকার করেছ—মৃত্যু !

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার প্রার্থনাও পূর্ণ হোক্ !…একরত্তি একটি চুম্বন…তার পর মৃত্যু !…জীবনের সুধায় আমার মৃত্যু স্নান করে উঠুক !

পুরোহিত ॥—বটে !

ইন্দ্রজিৎ ॥ [পুরোহিতের মুখের পানে হঠাৎ মুখ তুলিয়া] হাঁ !

পুরোহিত ॥ এই কি আমার শিক্ষা ? আদর করে বুকে তুলে নিয়ে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সে কি এই শিক্ষা ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমি ভেবে দেখেছি। আপনার শিক্ষা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আমি চাই জেগে থাকতে, আমি চাই আমার রক্তের তালে তালে নাচতে…যেমন নাচ ঐ বিদ্যুৎপর্ণা নেচে গেল ! আমি কি জন্মেছি ঘুমিয়ে থাকতে ?

পুরোহিত। এত অসংযম ! এত অসংযম !

ইন্দ্রজিৎ ॥ সংযম তাদের জন্যে যারা বিপদকে ডরায়, যারা মরতে ভয় পায়, যারা গণ্ডীর মধ্যে থেকে সুখ-শান্তিতে জীবন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে চায় ! জীবনের ষোলআনা তারা চায়ও না, পায়ও না ! আমি ঠক্‌বার পাত্র নই, আমি জীবন-মৃত্যু পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চাই। আমি চাই ঐ বিদ্যুৎ !… মাথায় আমার বজ্র ভেঙ্গে পড়বে, জানি, কিন্তু বিদ্যুৎ ! অমন আলো কি কেউ কখনো দেখেছে ?

পুরোহিত ॥…বটে !…আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনলুম পুত্র ! [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ। [ক্ষণকাল পরে] তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করব বুঝছি নে !

ইন্দ্রজিৎ ॥…আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক্ !

পুরোহিত ॥ [নীরব রহিলেন]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে ডেকে আনি ! সে এসে নৃত্য করুক ! রূপে-রসে-গানে-গন্ধে জীবন ভরপুর মাতাল হয়ে উঠুক !

পুরোহিত ॥ তার পর ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ মরণ ! আমার সোনার মরণ ! সার্থক মরণ !

পুরোহিত ॥ কিন্তু···কিন্তু সে কি তোমাকে ভালোবাসে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হয়ত বাসে,···হয়ত···না। কিন্তু, সে ভালো না বাসলেই আরো ভালো ! আমার প্রেম আরো কামনা বুকে নিয়ে আরো সাধনা করবে ! আমার অর্ঘ আরো ফলে ফুলে ভরে উঠবে ! আমার আরতির আলো আরো ভালো করে জ্বলে উঠবে। আমার ধূপ আরো ভালো করে পুড়বে !···তবু যদি বর না পাই আবার নতুন করে তপস্যা আরম্ভ করব !···তপস্যায় তপস্যায়, আমি সুন্দর থেকে সুন্দরতর হব। তার পর কোনদিন হয় ত ঐ নীলাকাশে একটি তারা হয়ে আমি আকাশের বুকে স্থান পাব—ঐ বুকে, যে বুকে বিদ্যুৎ খেলে ! যে বুকে বিদ্যুৎ নাচে !

পুরোহিত ॥ কিন্তু রাজাও যে তাকে কামনা করে ! আজ রাত্রির এই শৃঙ্গার উৎসবে রাজার যোগদানও ঐ উদ্দেশ্যেই বৎস !···সে কি বুঝছ না ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে কে না কামনা করে পিতা !

পুরোহিত ॥ কিন্তু, তুমিই বা তা কেমন করে সহ্য করবে !

ইন্দ্রজিৎ ॥ আকাশের ঐ চাঁদ···ঐ বিদ্যুৎ···ভালোবাসে সবাই, কিন্তু তা নিয়ে কি হিংসা চলে কথনো ?

পুরোহিত ॥ তর্ক নয়, তর্ক নয়। বৌদ্ধ ঐ রাজা আমাদের এই লুপ্ত-প্রায় হিন্দুধর্ম্মের শেষ চিহ্ন এই মন্দিরটুকু ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে আমার কাছে ঐ দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণাকে তার সেবাদাসী করবার অন্যায় প্রস্তাব করেছেন। আমি অসম্মত হলে—যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আর সম্মত হলে আমাদের ধর্ম্মের যুগযুগান্তব্যাপী অপমান, অপযশ। দশ বৎসর হ'ল ঐ হিন্দুদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে। এই দশ বৎসর আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এমনি অপমান অপযশ আশঙ্কা করেছি !

ইন্দ্রজিৎ ॥ প্রতিকার থাকে, প্রতিকার করুন !···কিন্তু···

পুরোহিত ॥ কিন্তু ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ কিন্তু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

পুরোহিত ॥ প্রতিকার আছে। শুনবে, কি প্রতিকার ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নিরুপায় হইয়া] বলুন—

পুরোহিত ॥ প্রতিকার ঐ বিদ্যুৎপর্ণা !

ইন্দ্রজিৎ ॥ [চমকিয়া উঠিয়া উত্তেজিত বিস্ময়ে] বিদ্যুৎপর্ণা ?

পুরোহিত ॥ হাঁ ! বিদ্যুৎপর্ণা। দশ বৎসর পূর্বে···যেদিন ঐ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে, সেইদিন থেকেই আমি এই প্রতিকারের উপায় ঠিক করতে পেরেছিলুম ঐ শিশুকন্যা বিদ্যুৎপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঐ শিশুর রূপলাবণ্য দেখে···তপস্বী আমি···সন্ন্যাসী আমি···আমি অকুতোভয়ে বলব ···আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম ! তার পর থেকে আমি তাকে নিজহাতে নিজমনে গড়ে তুলেছি আমার হাতের সুদর্শন অস্ত্রের মতো !

ইন্দ্রজিৎ ॥ অস্ত্র কিনা জানিনে, কিন্তু, সুদর্শনা বটে !···সুদর্শনা, সত্য সত্যই প্রিয়দর্শনা আমাদের প্রিয়তমা ঐ বিদ্যুৎপর্ণা !

পুরোহিত ॥ আবার প্রগল্‌ভতা ! তবে শোন—

ইন্দ্রজিৎ ॥ বলুন···আপনি বলুন—

পুরোহিত ॥ বড় ভালোবাসি আমি তোমায় পুত্র ! তুমি যদি আমার অবাধ্য হও, আমার জীবনের সর্ব আশা, সর্ব কামনা, সকল সাধনা ব্যর্থ হবে ! আমি তোমাকে রাজা করব বৎস···তুমি শুধু ঐ বিদ্যুৎপর্ণার আশা ত্যাগ কর।

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমি রাজ্যের ভিখারী নই।

পুরোহিত ॥ [স্তম্ভিত হইলেন। পরে উত্তেজিত হইয়া] বেশ তাই হবে ! তাই হবে !

ইন্দ্রজিৎ ॥ হবে ? হবে ?

পুরোহিত ॥ হবে। কিন্তু তার পূর্বে—

ইন্দ্রজিৎ ॥ তার পূর্বে···?

পুরোহিত ॥ হাঁ, তার পূর্বে ঐ রাজাকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নাট-মন্দিরে নিয়ে এস। তাঁর আসবার সময় হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তার পরই—

পুরোহিত ॥ না। তার পর বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য হবে। নৃত্য শেষে রাজাকে বিদ্যুৎপর্ণার শয়নকক্ষে নিয়ে যাবে। তার পর—

ইন্দ্রজিৎ ॥ হাঁ, তার পর ?

পুরোহিত ॥ তার পরই তোমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে বিদ্যুৎপর্ণাকে গ্রহণ করা না করা তোমার অভিরুচি !

ইন্দ্রজিৎ ॥ অভিরুচি ! হাঃ হাঃ হাঃ !

পুরোহিত ॥ হেসো না উন্মাদ ! তোমার কি পরীক্ষা শুনেছ ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ বলুন···আপনি বলুন।

পুরোহিত ॥ রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে আলিঙ্গনে চুম্বনে গ্রাস করছে, সেই দৃশ্য তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। আকাশের চাঁদ, আকাশের বিদ্যুৎকে বিশ্বশুদ্ধ লোকে ভালোবাসে, কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হিংসা করে না। তুমিও আজ এখানে রাজাকে হিংসা করতে পারবে না। প্রতিবাদে একটি কথাও বলতে পারবে না·

ইন্দ্রজিৎ॥ প্রতিবাদ করতে চাইও না! বিদ্যুৎপর্ণা, বিশ্বের বিদ্যুৎপর্ণা! সমগ্র পৃথিবী তাকে অভিনন্দন করছে দেখলে আমার বুক ভরে উঠ্‌বে! সে ধরণীর বুক জুড়ে বাস করছে। আমারি বুকের বিদ্যুৎ বিশ্ব-হিয়ায় তার নৃত্যের তালে তালে খেলা করছে সে তো আমারি গর্ব, আমারি গৌরব !

পুরোহিত। যা বলতে হয় বল, কিন্তু ঐ তোমার পরীক্ষা। আমার এই সর্ত্ত তোমাকে পালন করতে হবে। তুমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে। তার পরও যদি তুমি ঐ বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা কর—

ইন্দ্রজিৎ ॥—আমি করি! আমি করি!

পুরোহিত ॥ তখন আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না। তুমি তাকে গ্রহণ ক'রো।

ইন্দ্রজিৎ ॥—আমি চললুম। আমি চললুম! আমি রাজাকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসি! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানিনে, কিন্তু আমার

সেই অজ্ঞাত ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশে, প্রণাম···শত কোটি প্রণাম ! আমি চললুম, আমি চললুম ! [প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পুরোহিত ত্বরিৎপদে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সহসা স্পর্শ করিয়া ফিরাইলেন]

পুরোহিত ॥ রাজ্য চাও ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ চাই !

পুরোহিত ॥ দাঁড়াও। ওরে আমার অবোধ পুত্র ! তোর জন্যই যে আমার এই প্রচণ্ড সাধনা ! যদি রাজ্য চাস্···বিদ্যুৎপর্ণাকে ভুলে যা ! আর যদি বিদ্যুৎপর্ণাকে চা'স্ তবে—

ইন্দ্রজিৎ ॥—তবে ?

পুরোহিত ॥ আমার হৃদয়-শ্মশানে তোর চিতা জ্বলবে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ [সহসা রুদ্র-আনন্দে অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ ! বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান]

পুরোহিত ॥ [বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে ইন্দ্রজিতের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে লীলায়িত গতিতে চঞ্চল চরণে বিদ্যুৎপর্ণা আসিয়া তাঁহার সেই নির্বাক বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তখনি ছুটিয়া গিয়া পুরোহিতের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন]

পুরোহিত ॥ কে ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমি ! হাঃ হাঃ হাঃ···ভয় পেয়েছ ! চম্‌কে উঠেছ ! হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত ॥ তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে ?

বিদ্যুৎ ॥ "বিদ্যুৎ" "বিদ্যুৎ" বলে এখনি আমাকে ডাকলো কে !

পুরোহিত ॥ কে ডাকলো ?

বিদ্যুৎ ॥ আমায় ভালোবাসে···যে !

পুরোহিত ॥ আমি তোমার রসিকতার পাত্র নই বিদ্যুৎ। আজ কিছুদিন হ'ল তোমার মধ্যে আমি দেবদাসীর সংযম দেখতে পাইনে।···পরিণাম অতি কঠোর···বুঝলে ?

বিদ্যুৎ ॥—নির্জনে কারাবাস ?

পুরোহিত ॥ হ'তে পারে !

বিদ্যুৎ ॥—হয় না ! নির্জন কারাবাস আমার হতে পারে না ! কারাগারে তোমার রক্ষী আমার রূপের স্তব করবে। শুধু কি তাই ? কারাগারের আশে-পাশে অন্ধকারে মৃদু গুঞ্জন উঠবে…

"কালো কালো ভোম্‌রা করে হায় হায় !
বধূর অধরে মধু কোথা পাওয়া যায় !"

পুরোহিত ॥ দুর্বিনীত অসংযমী তবে শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়—

বিদ্যুৎ ॥—না আমি তার এক ধাপ উঁচু। সে নাচতে জানে না। আমি জানি। এমন নাচ নাচতে জানি, যা দেখলে—

পুরোহিত ॥ এখনো তুমি সেই নাচ নাচো বিদ্যুৎ ? আমার নিষেধ তবে তুমি আগ্রহ্য করবার স্পর্ধা রাখো ?

বিদ্যুৎ ॥ "রক্তের ডাক" ! "রক্তের ডাক" ! আমি কি করব ! আমার মা নেচেছে, আমি নাচব না ?

পুরোহিত ॥ কিন্তু…আমি তোমাকে "মানুষ" করেছি, সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছি—

বিদ্যুৎ ॥ তারি ফলে আমার দেহে এই মিথ্যা আবরণ উঠেছে ! কারাগার ! কারাগারে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ ! ঢেকে রেখেছ !…ভালো লাগে না ! আমার ভালো লাগে না ! কোন্ দিন তোমরা বলবে এই যে আমার চোখ দুটি— এরাও নরকের দুয়ার…ঢাকো…ঢাকো ওদের—কোথায় ঠুলি ! কোঠায় ঠুলি !

পুরোহিত ॥ পাপ ! মূর্তিমান পাপ তোমার চোখে মুখে—

বিদ্যুৎ ॥ শুধু চোখে মুখে কেন ? বল…এই বুকে—!…সন্তানও যেন বুকের দুধ চোখ বুজে খায় !…হাঁ ! ভয় নেই, আমার বসন সংযতই রয়েছে !

পুরোহিত ॥ আর আমি বিস্মিত হচ্ছি নে ! এর আভাব আমি ইন্দ্রজিতের মাঝেই পেয়েছি ! তোমাদের দুজনকে নিয়ে যে আমি কি করব বুঝতে পারছি নে !

বিদ্যুৎ ॥ সেই কথা বলতেই আমি এসেছি। আমাদের দুজনকে মুক্তি

দাও। আর হাতে তুলে দাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি "বক্ররাঙ্গ" "শঙ্খচূড়" আর "দুধসাগর" ঐ সাপ তিনটি! আমরা সাপ খেলিয়ে জীবন কাটাব! দেশে দেশে বেড়াব! নাচব! গাইব! মজ্‌ব! মজাব।

পুরোহিত॥ আমি তোমাদের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি!

বিদ্যুৎ॥ নরক?

পুরোহিত॥ [মুহূর্তকাল, রোষে নির্বাক রহিয়া] হাঁ, নরক।

বিদ্যুৎ॥ তবে আমি একা যাবো না! বোধ করি ইন্দ্রজিৎও যাবে। যাবে না?

পুরোহিত॥ সে তোমার সাথী, তোমার দোসর। যাবে বই কি?

বিদ্যুৎ॥ সেও যাবে আমিও যাব। নরক গুলজার হয়ে উঠ্‌বে! সেই নরকই তবে আমাদের মিলন-স্বর্গ!···কবে যাব?

পুরোহিত॥ তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করবার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই। রাজার আসবার সময় হয়েছে, আমাকে তার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে একটি কথা বলে যাই। রাজার সম্মুখে তুমি তোমার ঐ বর্বর বেশভূষা, ঐ ইতর আচরণ, ঐ অসভ্য বন্য নৃত্যগীত নিয়ে বের হয়ো না, তিনি তোমাকে দেখলে বড়ই বিরক্ত হবেন, হাঁ—

বিদ্যুৎ॥ তিনি আমাকে দেখলে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বেন, হাঁ—

পুরোহিত॥ আমি না হেসে থাকতে পারছি নে! হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ॥ তুমি হাস্‌ছো! তুমি হাস্‌ছো!

পুরোহিত॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ॥ গুরু!

পুরোহিত॥ কি?

বিদ্যুৎ॥ যদি সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, যদি আমি তা পারি,··· তবে?

পুরোহিত॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ॥ আমাকে ক্ষেপিয়ো না তুমি॥ সন্ন্যাসী যদি আমার জন্যে ঘুমুতে না পারে, তবে···সে তো বিলাসী—তার কথা···

পুরোহিত ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] তুমি কি বলছ ?

বিদ্যুৎ ॥ হাঁ…আমি সন্ন্যাসীর কথাও বলছি।

পুরোহিত ॥ সন্ন্যাসী ?

বিদ্যুৎ ॥ হাঁ, সন্ন্যাসী ! যে জীবনরসে ভরপুর, যে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে, যে ঘুমিয়ে নেই, যে জীবনের দুঃখ-সুখের উচ্ছলিত মদিরা পান করে মত্ত মাতাল, শুধু সে নয়…শুধু সে নয়…

পুরোহিত ॥ তবে আর কে ?

বিদ্যুৎ ॥ যে জীবনকে অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর বৈরাগ্য বরণ করে নিয়ে মনে করে পরমার্থের পথে চলেছি, হৃদয়কে শুষ্ক রেখে মরণকে তপস্যা করে জড়িয়ে ধরতে চায়,…কিন্তু মনের এক কোণে, ঘুমের ঘোরে, অতি সংগোপনে কোনদিন বা স্বপ্ন দেখে চম্‌কে ওঠে যে—সে হয় ত ঠকল…

পুরোহিত ॥ [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] কে সে ?

বিদ্যুৎ ॥ যে জাগরণে ঘোষণা করে যে আত্মসংযম চিত্তসংযম…সকল রকমের সংযম সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু, ঘুমের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হয়ে নিজেরি অজ্ঞাতে অসংযমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—

পুরোহিত ॥ তার মানে ? তার মানে ?

বিদ্যুৎ ॥ তার মানে অনেকের সুনিদ্রা হয় না !

পুরোহিত ॥ [সন্দিগ্ধ ভাবে] বটে !

বিদ্যুৎ ॥…তোমারো !…তুমি ঘুমের ঘোরে মনের কথা বিড় বিড় করে বল।

পুরোহিত ॥ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে]…কি বলি ?

বিদ্যুৎ ॥ ঠিক ঐ ইন্দ্রজিৎ যা বলে…তাই !

পুরোহিত ॥ কন্যার স্নেহে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি, সাবধান…

বিদ্যুৎ ॥ সে আমার বাল্যে।…কিন্তু—আজ সেজন্যে হয় ত অনুতাপই হচ্ছে !

পুরোহিত ॥ বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎ ॥ তাই বলছিলুম…সন্ন্যাসী যদি আমার জন্যে ঘুমুতে না পারে, রাজা তো বিলাসী ! তার কথা না বললেও চলে।

পুরোহিত ॥ মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার প্রলাপ আলাপ শুনলুম বিদ্যুৎ। কত কথাই না তুমি বলতে পার! হাঃ হাঃ হাঃ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন] যাক!

বিদ্যুৎ ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত ॥ হাসির কথা নয়। পারবে তুমি আমাদের ধর্মের···আমাদের দেবতার আমাদের তপস্যার সেই মহাশত্রুকে বশ করতে···জয় করতে···জয় করে ক্রীতদাস করে রাখতে?

বিদ্যুৎ ॥ [ক্ষণেক ভাবিয়া] পারব!···পারতুম!···কিন্তু করব না। হাঁ, করব না!

পুরোহিত ॥ কেন? কেন বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ ॥ সে তোমার শত্রু, কিন্তু তুমি আমার শত্রু!

পুরোহিত ॥ সে কি! সে কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ ॥ তুমি আমাকে কারাগারে রেখেছ। আমি যাদের ভালবাসি, তুমি আমার কাছ থেকে তাদের কেড়ে নিয়েছ, সরিয়ে রেখেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ!

পুরোহিত ॥ বল কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ ॥ কোথায় ইন্দ্রজিৎ? কোথায় বঙ্করাজ? কোথায় শঙ্খচূড়? কোথায় দুধসাগর?

পুরোহিত ॥ এই কথা!···তবে কি আমাদের চাইতে তোমার কাছে বিষধর সাপই প্রিয় হ'ল?

বিদ্যুৎ ॥ হ'ল। হাঁ, হ'ল···আমি তাদের ভালোবাসি। তারা আমায় ভালোবাসে। এ আমাদের রক্তের টান।···কোথায় তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে। তাদের আমি দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছি!

বিদ্যুৎ ॥ মিথ্যা কথা। তারা বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর যদিই বা বেঁচে থাকে, তাদের তুমি খেতে দাও না! বঙ্করাজ একবেলা কলা না পেলে ঢলে পড়তো! শঙ্খচূড় একবেলা ব্যাঙ

না পেলে গোসা করতে ! দুধসাগর একবেলা দুধ না পেলে আমার মার বুকের দুধ চুষে খেত ! সেই তারা ! আজ কোথায় তারা ?

পুরোহিত ॥ আছে, তারা···আছে।

বিদ্যুৎ ॥ ও কথায় আমি ভুলব না ! একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, একসঙ্গে আমরা খেলা করেছি, দুধ খেয়েছি, আদর পেয়েছি, বড় হয়েছি ! কই তারা ? কোথায় তারা ?

পুরোহিত ॥ আছে, তারা আছে, কিন্তু···অনশনে। আমি তাদের কিছুদিন হ'ল অনশনে রেখেছি !

বিদ্যুৎ ॥ বটে ! বটে ! কিন্তু, কেন ?

পুরোহিত ॥ মাঝে মাঝে ও-রকম প্রয়োজন হয়। কেন, তা কি জান না ?

বিদ্যুৎ ॥ জানতে চাইও না ! তুমি আমার শত্রু ! তুমি আমার শত্রু !

পুরোহিত ॥ যা বলতে হয়, পরে বোলো। আগে শুনে নাও···কেন। তারা আমার অস্ত্র।···কামন্দককে মনে পড়ে ?

বিদ্যুৎ ॥ কামন্দক !···কোথায় সে ? রসের গল্প অমন আর কেউ বলতে পারত না !···কোথায় সে ?

পুরোহিত ॥ এক দিন সে তোমার অধর দংশন করতে ছুটে গিয়েছিল। উপবাসক্লিষ্ট বঙ্করাজ তার অধর দংশন করে তৃপ্ত হ'ল।

বিদ্যুৎ ॥ সে কি ?

পুরোহিত ॥ হাঁ !···যুধাজিৎকে ভোল নি, না ?

বিদ্যুৎ ॥ শত যুদ্ধের বীর সেই যুধাজিৎ ! সে আমাকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল !

পুরোহিত ॥ এবং রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তোমার ভালে চুম্বন-তিলক এঁকে দিয়েছিল—

বিদ্যুৎ ॥ তুমি তা জেনেছ ?

পুরোহিত ॥ জেনেছিলুম বলেই তো অনাহারী শঙ্খচূড় যুধাজিতের মণি-মুকুট-মণ্ডিত ভালে বিষ-চুম্বন এঁকে দিয়ে জীবনরসে ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল !

বিদ্যুৎ ॥ সত্যি? সত্যি?

পুরোহিত ॥ তবে কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি?

বিদ্যুৎ ॥ কি করেছ! তুমি কি করেছ!…কেন তুমি তাদের এ শাস্তি দিতে গেলে?

পুরোহিত ॥ কেন তারা আমার নিষেধ মানে নি?

বিদ্যুৎ ॥ তোমার স্বপ্ন যে কতখানি সত্য, আজ তা বুঝছি! তুমি হিংসায় আকুল! তারা যে আমায় ভালবাসতো তুমি তা সহ্য করতে পার নি। এখন বুঝছি তোমার ঐ নিষেধাজ্ঞা, ঐ দণ্ডাজ্ঞার মূলে কোন্ প্রবৃত্তি জল সেচন করে! এখন বুঝছি কামনা বয়সের অপেক্ষা রাখে না! এখন বুঝছি আমার শক্তি কতখানি!…পুত্র আমার পদানত, পিতাও মনে মনে, স্বপ্নের সংগোপনে আমারি পদানত!

পুরোহিত ॥ বল কি?

বিদ্যুৎ ॥ হাঁ, পিতা হয়েও তুমি ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ প্রতিমূর্তি!…উভয়ের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত, না?

পুরোহিত ॥ [বিচলিত হইয়া] না…না…না! এ তুমি কি বলছ? ‥তা কি হয় বিদ্যুৎ, তা কি হয়?…না…না…না…তা নয়। তা কথনই নয়। তা হয় না। [ভাবিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ…না, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয়।…কি বল?…না…না…না…, হাঁ, আমরা যেন প্রথমে কি কথা বলছিলুম? —হাঁ, মনে পড়েছে। রাজাকে তোমার জয় করতে হবে বিদ্যুৎ! আমি তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। প্রতিদানে তুমি যা চাও…পাবে।— বাণী হতে চাও…রাণী হও…কিন্তু রাজাকে জয় কর—

বিদ্যুৎ ॥ তোমার এই আত্ম-প্রবঞ্চনা, তোমার এই অপ্রকৃতিস্থতা আমার বেশ লাগছে। কিন্তু আমি এ সুযোগ হারাব না। আমি চাই মুক্তি, যদি দাও তবে—

পুরোহিত ॥ তবে ঐ রাজাকে জয় করবে?

বিদ্যুৎ ॥ করব!

পুরোহিত ॥ রাজা তোমাকে কামনা করে।

বিদ্যুৎ ॥ কিন্তু…যদি তুমি—

পুরোহিত ॥—বল…

বিদ্যুৎ ॥ যদি তুমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে আমায় দান কর!… যদি তুমি ঐ বঙ্করাজ, শঙ্খচূড় আর দুধসাগরকে আমার হাতে তুলে দাও!

পুরোহিত ॥ তার পর?

বিদ্যুৎ ॥ তারপর আমরা এই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়ব। সমুদ্র আমাদের পথ চেয়ে আছে। পর্বত আমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বন-বীথি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। ইন্দ্রজিৎ আর আমি হাত ধরাধরি করে পথ চলব। ও বাজাবে ডমরু, আমি বাজাব বাঁশী। বঙ্করাজ আমার গলা জড়িয়ে আনন্দে দুলবে! শঙ্খচূড় আমার মাথায় উঠে খেলা করবে! দুধসাগর আমায় নাগপাশে বেঁধে দুধ খাবার জন্য বায়না করবে!…ঠিক্ তেমনি করে চলব…যেমনি করে আমার বাবা আর মা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিল!…বেদে আর বেদেনী! আমার জীবনের স্বপ্ন! আমার স্বপ্নের জীবন!

পুরোহিত ॥ সে না হয় হবে এখন! কিন্তু, রাজাকে বশ করা সহজ নয়। তোমার মত কত সুন্দরী তার ক্রীতদাসী! পারবে তো? তুমি পারবে তো?

বিদ্যুৎ ॥ আমি আমার শক্তি জানি। যা জানতুম না, তাও জানিয়েছ তুমি! [ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] রাজার মত কত সুন্দর আমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য ক্রীতদাস হয়েছে!…বেশি নয়! বেশি নয়। এই বেদেনীর একটি চুম্বন!…রাজা আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে!…আমি তা ভাবছি নে, আমি ভাবছি আমার স্বপ্নের জীবন! জীবনের স্বপ্ন!…কোথায় আমার সাথী?…কোথায় তার বাঁশী?…বঙ্করাজ কি ঘুমিয়ে আছে? শঙ্খচূড় কি কাঁদছে? দুধসাগর কি রাগ করেছে?

পুরোহিত ॥ সব আছে…সব পাবে! [বাহিরে ভেরীবাদ্য] ঐ শোন ভেরীবাদ্য!

বিদ্যুৎ ॥ [নাচিয়া উঠিয়া] সে এসেছে! সে এসেছে! এইবার বঙ্করাজ লাফিয়ে উঠবে! শঙ্খচূড় ফণা ধরবে! দুধসাগর নাচবে!

পুরোহিত ॥ রাজা এসে পড়েছেন। ও তারি আগমনী ভেরীবাদ্য। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আছে।

বিদ্যুৎ ॥ আমি জানি! আমি জানি! সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে! আমরা যাবো! ঐ সাগরের পারে···ঐ পাহাড়ের ধারে···ঐ বনের কোলে!

পুরোহিত ॥ উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! তুমি প্রস্তুত হও। রাজাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ ॥ আমি প্রস্তুত আছি! আয়! আয়! আয়! কে আসবি আয়!

"সাপের খেলা ভারি
যে না আসবে আড়ি!"

পুরোহিত ॥ উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! আজ দশ বৎসর হ'ল যে কামনা নিয়ে সসর্প গৃহে বাস ক'রে তোমাকে লালন পালন করেছি, আমার সে কামনা আজ সিদ্ধ কর!···ঐ রাজা!···ঐ রাজা! ওকে জয় কর, বশ কর। তোমার দেহের নাগপাশে ওকে জড়িয়ে ধর। চুম্বন দাও···আলিঙ্গন দাও! ও তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে! পড়বে, নিশ্চয়ই পড়বে···আমি জানি পড়বে।

বিদ্যুৎ ॥

আয় আয় আয়!
চুমু খাবো বঙ্করাজ
আয় আয় আয়!
দুধ দেব দুধসাগর
আয় আয় আয়!
শঙ্খ বাজে শঙ্খচূড়!
আয় আয় আয়!
মা মনসা মা মনসা!
আয় আয় আয়!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত ॥ হাঁ নাচো! ঐ নাচ নাচো! আর আমার নিষেধ নেই, নাচো বেদেনী, নাচো! ঐ রাজা···বীরদর্পে আসছে! ঐ অহঙ্কার চূর্ণ কর! নাচো! সৃষ্টির সেই আদিম নাচ নাচো! সাপের নাচ নাচো!—নাগপাশে বাঁধো! জয় কর! বশ কর! ক্রীতদাস কর!

বিদ্যুৎ ॥ কালনাগিনি! কালনাগিনি!
আজকে তুমি রাজরাণী।
মাথার মণির কিবা আলো!
বঁধু তোমায় বাসে ভালো!
তোমার মুখে আছে মধু!
লোভে লোভে আসে বঁধু!
রাণি রাণি ওগো রাণি!
কালনাগিনি! কালনাগিনি!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!···আমি···আমি···এ পৌরোহিত্য চাইনে! আমি রাজা! আমিই রাজা!···দেবে?···একটি চুম্বন···[বিদ্যুৎপর্ণার কাছে গেলেন]

বিদ্যুৎ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [পুরোহিতের মুখের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া অট্টহাস্য করিলেন]

পুরোহিত ॥ [সভয়ে পিছাইয়া গিয়া] বিষ! বিষ! বিষ!···ওগো আমার বিষকন্যা! ওগো আমার স্বহস্ত-রচিত বিষবৃক্ষ!···ক্ষুধায় প্রাণ যায়···পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু তোমার ঐ ফলফুল···আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি নে··· হায় হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ ॥ [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ। [পুনরায় সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া দণ্ডধারী পারিষদগণ সেনানীগণ পরিবৃত হইয়া নীরবে রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের নিমিষে যবনিকা উঠিয়া গেল। সহস্র-

দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্ব হইতে দুইদল দেবদাসী চকিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া রাজার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুৎপর্ণার সহিত তালে তালে নাচিতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ সকলও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। অপূর্ব ভঙ্গীতে নর্তকীগণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল]

বিদ্যুৎ ॥ একটি পয়সা রাজা একটি পয়সা! কে দেখবে সাপের খেলা! দুধসাগরের নষ্টামি! দেখবে যদি তাই বল···যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা ॥ [ইন্দ্রজিতের প্রতি] কে?

ইন্দ্রজিৎ ॥—সে!

রাজা ॥ [পুরোহিতের প্রতি]···সে?

পুরোহিত ॥ হাঁ···, সে!

বিদ্যুৎ ॥ শঙ্খচূড়, বঙ্করাজ!

নাই ভয় নাই লাজ!

দুধসাগর দুধ চায়

সামলানো হ'ল দায়!

দেখবে যদি তাই বল!

যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা ॥ ভালোবাসি! ভালোবাসি!

ইন্দ্রজিৎ ॥ দেখব! দেখব!

সকলে ॥ দেখব! দেখব!

[বিদ্যুৎপর্ণা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রদীপ দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দিল। হাতছানি দিয়া রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎপর্ণা যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ও ইন্দ্রজিৎ পুরোহিতের প্রসারিত হস্ত-সঙ্কেতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া চোরের মত যবনিকার এক প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। দীপের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেবদাসীদের একটি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। দীপ নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সঙ্গীত থামিয়া

গেল। দীপ নিভিয়া গেল। তখন দূরাগত এব বংশীধ্বনির মৃত্যু-মূর্ছনা শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া গেল।…হঠাৎ সেই অন্ধকারের অন্তর হইতে বিদ্যুৎপর্ণার স্বর শোনা গেল]

বিদ্যুৎ॥ জয়! জয়! জয়!…জয় করেছি! বশ করেছি!…রাজা…দেশের রাজা…ধরণীর ঈশ্বর…ক্রীতদাস হয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে! মাত্র একটি চুম্বন! একটি আলিঙ্গন!

ইন্দ্রজিৎ॥ কিন্তু তাকে কি হত্যা করে এলি পাষাণি!…ঐ শোন্ তার আর্তনাদ! উঃ, কি কাতর আর্তনাদ!

বিদ্যুৎ॥ মাতলামি! মাতলামি! ও তার মাতলামি! গুরু কোথায়? কোথায় তুমি? কোথায় আমার বঙ্করাজ! শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

ইন্দ্রজিৎ॥ ঐ শোন অসির ঝনঝনি! ঐ শোন রাজার মর্মভেদী আকুল মৃত্যু-যন্ত্রণা! ঐ শোন তার সেনানীদের ক্ষিপ্ত কোলাহল! ঐ আবার অসির ঝনঝনি! রাজাকে তুমি হত্যা করেছ, হাঁ, নিশ্চয়ই হত্যা করেছ। তার সেনানীরা ক্ষেপে উঠেছে! কিন্তু…কি নিদারুণ অন্ধকার! পিতা কোথায়! প্রভু কোথায়! আমার অসি কই?

বিদ্যুৎ॥ রাজাকে আমি চুম্বন করেছি, আলিঙ্গন দিয়েছি!

পুরোহিত॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ॥ কে ও? ঐ অট্টহাস্যে পরাণ কেঁপে ওঠে! কে তুমি!

পুরোহিত॥ আমি পুরোহিত!

বিদ্যুৎ॥ গুরু! গুরু! আমি জয় করেছি! আমি বশ করেছি!

পুরোহিত? বটে!

বিদ্যুৎ॥ এক চুম্বনে…এক আলিঙ্গনে…বেশি নয়; বেশি নয়,…তাতেই সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে।

পুরোহিত॥ ঐ এক চুম্বনে…ঐ একটি আলিঙ্গনেই রাজা পঞ্চত্ব লাভ করেছে! তার মৃতদেহ তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে! ওগো বিষকন্যা! প্রতিদিন তিল তিল করে বিষ খাইয়ে আজ দশ বৎসর হল আমি যে কালনাগিনী সৃষ্টি

করেছি, আজ সে আমার গোপন অভিলাষ পূর্ণ করেছে ঐ রাজাকে দংশন ক'রে।

বিদ্যুৎ ॥ সে মরে গেছে?

পুরোহিত ॥ মরে গেছে।

বিদ্যুৎ ॥ চুম্বনেই বিষ? আলিঙ্গনেও বিষ?

পুরোহিত ॥ ইন্দ্রজিৎ! তুমিই উত্তর দাও! স্বচক্ষে তুমি দেখে এসেছ!

বিদ্যুৎ ॥ ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ ॥ আমি কালনাগিনী? আমি কালনাগিনী?

পুরোহিত ॥ তুমি বিষকন্যা! তুমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। আমি নিজ হাতে তোমাকে গড়েছি।...কিন্তু...

বিদ্যুৎ ॥ বল! বল—

পুরোহিত ॥ কিন্তু ঐ যে রাজা—ও তো মরে বাঁচলো; আর আমি! আমি যে দিবানিশি অনুতাপে জ্বলে মরছি! কে জান্‌তো আমারি বিষকন্যার একটি চুম্বনের জন্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মাঝে কামনার বিষে জর্জরিত হবে! হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ ॥ আজ দেখছি সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমরা কি সবাই মাতাল হলে? কিন্তু আমি ঠিক্ আছি। আমি ভুলব না...ঠক্‌ব না! গুরু! রাজাকে জয় করেছি, এইবার আমার সাপ তিনটি দাও...ইন্দ্রজিৎ, কোথায় তুমি? কাছে এস। ঐ কাণ পেতে শোন সমুদ্রের গর্জ্জন! ডাক্‌ছে! আমাদের ডাক্‌ছে! গুরু! আর বিলম্ব নয়, কোথায় আমার বঙ্করাজ? শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

পুরোহিত ॥ আছে, তারা আছে; আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু...বিদ্যুৎ! ...আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বিদ্যুৎ ॥ না—! না! তুমি এই মন্দিরেই রইবে। আমরা আবার ফিরে আসব। ঠিক্ আমার বাবা সদল-বলে যেমন ফিরে এসেছিল। সঙ্গে আনব আমাদের খোকাখুকু। গুরু! কাছে এস...শোন। আমাদের খোকাখুকু আরো

সুন্দর হবে···আমার চাইতেও···ইন্দ্রর চাইতেও! তুমি তাদের আবার বুকে তুলে নিয়ো! আবার মানুষ ক'রো···আবার ভালোবেসো···

পুরোহিত॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ···ভুল! ভুল! ভুল! সব তোমার ভুল। আমি তোমার সর্বনাশ করেছি।···কাকে নিয়ে তুমি জীবনের স্বপ্ন দেখছ! স্বপ্নের জীবন কল্পনা করছ···তুমি কালনাগিনী! তুমি বিষকন্যা। রাজাকে হত্যা করেছ, ইন্দ্রজিৎকেও···

বিদ্যুৎ॥ আবার সেই কথা?

পুরোহিত॥ আরো প্রমাণ চাও?

বিদ্যুৎ॥ তুমি আমার সাপ দাও! কোথায় তারা?···আমি আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করব না, কোথায় তারা?

পুরোহিত॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে বিদ্যুৎ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! চুপড়ির আবরণ খুলে এই অন্ধকারে দুধসাগর বের হয়ে পড়েছে। আমি তাকে খেতে দিই নি, সে এইবার ছাড়া পেয়ে তার শোধ নেবে! ঐ শোন তার গর্জ্জন! বাঁচাও বিদ্যুৎ, আমায় বাঁচাও! তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধর। দুধসাগর বুঝবে আমি তোমার দেহলগ্ন। সে কাকে দংশন করতে গিয়ে কাকে দংশন করবে মনে করে আর দংশনই করবে না!

বিদ্যুৎ॥ কিন্তু···ইন্দ্রজিৎ?

পুরোহিত॥ সে আলো নিয়ে আসুক। যাও ইন্দ্রজিৎ···যাও···

ইন্দ্রজিৎ॥ হাঁ, আলো! আমি আলো নিয়ে আসছি [প্রস্থান]

বিদ্যুৎ॥ দুধসাগর! দুধসাগর! আমি বিদ্যুৎ! আমি তোর দুধবোন! আমি তোকে দুধ দেব!···কিন্তু আমার কাছে আসিস্ না! আমার গুরু আমার দেহ জড়িয়ে আছেন। বিশ্বাস না হয়···ঐ শোন আমি তাকে চুমু খাচ্ছি···সাবধান ···কাকে দংশন করতে কাকে দংশন করবি···ঠিক নেই কিন্তু···

পুরোহিত॥ [চীৎকার করিয়া উঠিয়া] দংশন করেছে···দংশন করেছে!

বিদ্যুৎ॥ সে কি! সে কি!

পুরোহিত॥ কিন্তু দুধসাগর নয়···

বিদ্যুৎ॥ তবে?

পুরোহিত॥ তুমি!···বিদায়! ইন্দ্রজিৎকে চুম্বন ক'রো না···আলিঙ্গন দিয়ো না!···আমি তোমার সর্বনাশ করেছি···যদি তোমার খোকাখুকু হবার কোন আশা থাকতো···তবে আমি এই মন্দিরে যেমন করেই হোক্ তাদের আশায় বেঁচে থাকতুম, কিন্তু···তা যখন নয়···তখন যাকে ভালোবেসে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তারি চুম্বন পেয়ে, আলিঙ্গন পেয়ে আনন্দে মরলুম! প্রতি রাত্রের দুঃস্বপ্নের চাইতে এক দিন এ-ক মু-হু-র্তে ম-রা ভালো! তৃ-প্ত হ-য়ে ম-রা ভা-লো! বি-দা-য়!

বিদ্যুৎ॥ গুরু!···গুরু! [উত্তর পাইলেন না]

* * * *

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। পরে আলো হস্তে ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করিয়া দেখেন বিদ্যুতের পদতলে পুরোহিতের মৃত-দেহ লুটাইয়া পড়িয়াছে! বিদ্যুৎ পাষাণ-মূর্তির মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন]

ইন্দ্রজিৎ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ॥ [চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন] দেখছ?

ইন্দ্রজিৎ॥ গুরু!

বিদ্যুৎ॥ গুরু নয়, গুরুর মৃতদেহ!···আমার একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে ···পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে···আর উঠ্‌বে না!

ইন্দ্রজিৎ॥ চলে এস বিদ্যুৎ···সেনানীরা উলঙ্গ অসি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে! এতক্ষণ অন্ধকারে নিরাপদে ছিলুম···এখন এই আলো···

বিদ্যুৎ॥ নিভিয়ে দাও···নিভিয়ে দাও···

ইন্দ্রজিৎ॥ বেশ!···দিলুম। [দীপ নির্বাপন] এইবার এস, চল··· তোমার সেই পাহাড়ের ধারে···সমুদ্রের পারে···বনানীর কোলে—

[কোন উত্তর পাইলেন না]

ইন্দ্রজিৎ॥ [আরো উচ্চৈঃস্বরে] বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! [দূর হইতে উত্তর আসিল]

বিদ্যুৎ ॥ ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ ॥ [আরো দূর হইতে] বিদ্যুৎ আকাশে!···বাইরে এসে দেখে যাও···

[দৃশ্যপট পরিবর্তন। মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ, মাঝে মাঝে মেঘ সরিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়িতেছে।···বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সরসীর বুকে কুমুদ, কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, বাতাসে তাহারা দুলিতেছে। সরসীর একপারে ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ ॥ [সরসীর অন্যপারে আবির্ভূত হইয়া] ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ ॥ অত দূরে নয়! কাছে এস! চল···চল···সেই পাহাড়ের ধারে, সমুদ্রের পারে, বনানীর কোলে—

বিদ্যুৎ ॥ [আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন] না—না—না!

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ ॥ আকাশের ঐ চাঁদ···দূরে · কতদূরে···তবু—সরসীর ঐ পদ্ম আনন্দে দুলছে! চুম্বন নয়! আলিঙ্গন নয়!···তবু দোলে! ঐ চাঁদ···আর এই পদ্ম ওর অর্থ জানো? আমি জেনে আসি!

[জলে ঝাঁপ দিলেন]

[ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৪]

উদ্ধার

[১৩৪৫ এর ভাদ্র।

বন্যাবিধ্বস্ত বাঙলা।

শত শত গ্রাম জলের তলায় চলে গেছে। গ্রামবাসীরা যারা পেরেছে পালিয়েছে, যারা পারেনি তারা ঘরের চালের উপর, কি কলাগাছের ভেলায় কিম্বা বাঁশের মাচানে আশ্রয় নিয়েছে। কত লোক কত শিশু কত গৃহপালিত পশু যে ডুবে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এমনি একটা বন্যাক্রান্ত গ্রাম থেকে যারা পালাতে পারেনি তাদের কথা বলছি।

বন্যার জল হু হু করে বাড়ছে। একটি বাঁশের মাচানে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা-প্রয়াসী কয়েকজন লোক এবং একটি পাঁঠা।

এইবার লোকগুলির পরিচয় দেই। রামহরি ভট্টাচার্য বয়স পঁয়তাল্লিশ, পৌরোহিত্য করতেন, জ্বরে অচেতন, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছেন, বন্যায় না মরলেও ব্যারামে মারা যাবেন, এ প্রায় জানা কথা।

সৌদামিনী দেবী রামহরির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়স কুড়ি বাইশ, বেশ সুন্দরীই বলা যায়, চোখে বিদ্যুৎ খেলে।

রামহরির প্রথম পক্ষের সন্তান নরু, বয়স সাত, পাঁঠাটির মালিক এবং বন্ধু। তার কান্নাকাটিতেই পাঁঠাটি এই মাচানে আশ্রয় পেয়েছে।

রামহরির প্রতিবাসী এবং যজমান প্রিয়লাল রায়, বয়স পঁচিশ, মহাজনী ব্যবসা।

পরাণসেখ—রামহরির ভাগচাষী—বয়স সাতাশ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ]

[শেষ রাত্রি। একটা বাঁশের আগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রামহরি অচেতন অবস্থায় মাচানের এক কোণে পড়ে রয়েছে। ছেলেটা (নরু) ঘুমোচ্ছে। পাঁঠাটি তার পাশে ধুঁকছে। পরাণ সেখ চোখ বুঁজে এক কোণে পড়ে রয়েছে—ঘুমিয়ে কি জেগে বলা যায় না। প্রিয়লালের হাতে এক তাড়া দলিল—লণ্ঠনের যথাসম্ভব কাছে গিয়ে সে নিবিষ্টচিত্তে দলিলগুলো দেখছিল। সৌদামিনী স্বামীর বিছানায় স্তব্ধ হয়ে বসে বন্যার ক্রমবর্ধমান জলের পানে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে]

সৌদামিনী ॥ বানের জল হু হু করে বাড়ছে!

[প্রিয়লাল নিবিষ্টচিত্তে গলিলের তাড়া দেখছিল—কথাটি তার কানে গেল না]

সৌদামিনী ॥ বানের জল হু হু করে বাড়ছে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ মাচানও তলিয়ে যাবে।

প্রিয়লাল ॥ [এবার শুনল। উঠে দাঁড়াল] রাতও পোহাবে না। এমনি করেই কি আমরা মারা যাব ?

সৌদামিনী ॥ আমি বুঝতে পারিনা আপনি এখনো কেন এখানে আছেন। আপনি চলে যান—

প্রিয়লাল ॥ কি করে যাই ?

সৌদামিনী ॥ কলাগাছের ভেলাটা…ও একজনের ভার সইবে বই কি !

প্রিয়লাল ॥ একজন নয়, দুজনই যাওয়া যায় ও ভেলায়।

সৌদামিনী ॥ সে আমি জানি। কিন্তু দুজন আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?

প্রিয়লাল ॥ তুমি আর আমি।

সৌদামিনী ॥ আমার স্বামী—

প্রিয়লাল ॥ সে তো ঘাটের মড়া—নিঃশ্বাস বইছে কিনা দেখতো !

সৌদামিনী ॥ আমার ছেলে—

প্রিয়লাল ॥ তোমার সতীনের ছেলে—

সৌদামিনী ॥ ঐ পরাণ সেথ…দশ বছরের ভাগচাষী—আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে থেকে গেল—পালাল না !

প্রিয়লাল ॥ ব্যাটা চাষা…ওদের তো এই-ই কাজ !

সৌদামিনী ॥ কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে কোন চাষাই এল না। ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরে জল ঢুকেছে…লোকজন কেউ নেই, সব পালিয়েছে।

প্রিয়লাল ॥ অথচ গ্রামের দশ আনা লোকের মহাজন আমি !…দশ আনা লোকের মাথা কিনে রেখেছিলাম আমি ! ব্যাটাদের আমি দেখে নেব।

সৌদামিনী ॥ হ্যাঁ, মাথাই কিনেছিলেন, পা-তো আর কেনেন নি ! তাই ওরা পালাতে পেরেছে। কিন্তু আপনি পালালেন না কেন বলুন দেখি ! এখনো —এখনো পালাতে পারেন !

প্রিয়লাল ॥ পালানো আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিলনা। বাড়ীর লোকজনদের তো মামার বাড়ী চালান দিলাম! কেন আমি থাকলাম!

সৌদামিনী ॥ দলিলের তাড়াগুলো হয়তো খুঁজে পাচ্ছিলেন না!

প্রিয়লাল ॥ সেগুলো হাতে নিয়েছিলাম সবার আগে—ঘুম থেকে জেগেই যে দেখলাম চারদিকে সমুদ্রের মতো জল থৈ থৈ করছে!...সেই যে হাতে নিয়েছি... এ পর্যন্ত তা নামাইনি, দেখছ তো! ছ হাজার টাকার খত তমস্মুক রেহান হ্যাণ্ডনোট্!...আর নিলাম রিভলবারটি।...নিয়ে ছুটলাম তোমাদের বাড়ী!

সৌদামিনী ॥ আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রিয়লাল ॥ তোমাদের নয়, তোমাকে।

সৌদামিনী ॥ রিভলবার নিয়ে!

প্রিয়লাল ॥ হ্যাঁ।

সৌদামিনী ॥ আপনার হাতে যখন রিভলবার আছে, আমরা নিশ্চিন্ত। কি বলেন?

প্রিয়লাল ॥ অনেকটা। জোর করে তোমায় আমি ভেলায় তুলব, এখন। দেখব কে বাধা দেয়।

সৌদামিনী ॥ আমাকে আপনি উদ্ধার করবেনই, কি বলেন?

প্রিয়লাল ॥ নিশ্চয়। একটা খাটের মড়া তোমার স্বামী।...উদ্ধারই আমি একে বলব।...হ্যাঁ, আর সময় নেই, ভেলায় ওঠ—

রামহরি ॥ [প্রলাপ বকছিল] গেল—গেল—আমার ঘর ডুবে গেল।

প্রিয়লাল ॥ [হেসে] সে তো ডুবেছে-ই। কিন্তু কী কঠিন প্রাণ! আজ একমাস ধ'রে তিন চার জ্বর উঠছে...তার ওপর এই ঝড় জল! ওষুধ নেই, পথ্য নেই। তবু...

সৌদামিনী ॥ আমার সিঁদুরের জোর আছে বলতে হবে! ওকি! ওকি!

প্রিয়লাল ॥ কি?

[দেখা গেল পরাণ সেখ হামা দিয়ে পাঁঠাকে টেনে নিয়েছে—এবং তার গলাটা চেপে ধরে একটা লম্বা ছুরি দিয়ে পাঁঠাটাকে জবাই করে আর কি !]

প্রিয়লাল ॥ এই ! ও কি হচ্ছে ?

পরাণ ॥ খাব ।

প্রিয়লাল ॥ ব্যাটা রাক্ষস, না পিশাচ ?

পরাণ ॥ চুপ !···তোমরা ভদ্দরলোক—বড়লোক—আজও ভাত খেয়েছ দুমুঠো । আমাকে দিয়েছিলে কি ? ক্ষিদেয় এমনি করে মরব নাকি !

[নরু পাঁঠা নিয়ে টানাটানিতে জেগে উঠেছে । এ দৃশ্য দেখেই চীৎকার করে উঠল]

পরাণ ॥ আজ তিন দিন একদানা ভাত পাইনি ! বাঁচতে হবে—আমাকে বাঁচতে হবে ।

নরু ॥ ভাত আছে—মা আমার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে—আমি দিচ্ছি—ওকে ছেড়ে দাও—

[পরাণের চোখে জল এল । সে পাঁঠাকে ছেড়ে দিলে]

পরাণ ॥ থাক । ও ভাত তুমিই খাও ।

নরু ॥ মা ! ভাত চারটি আমার পাঁঠাটাকে দি ! ও আজ কদিন কিছু খায় নি ! ও কী করে বাঁচবে !

সৌদামিনী ॥ দাও—সেই সঙ্গে তুমিও এক মুঠো খাও—

পরাণ ॥ আমি ভেলাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—

প্রিয়লাল ॥ খবরদার ! ও ভেলা আমার ।

পরাণ ॥ মানে ? তুমি মহাজন বলে ?

প্রিয়লাল ॥ আলবৎ ।

পরাণ ॥ তবে তুমি জানো না, তোমায় বলি । আজ সন্ধ্যাবেলা—তখন তুমি ঘুমিয়ে । ঠাকরুণ ভাত রাঁধবেন ! কাঠ নেই ! মাচান থেকে বাঁশ খুলে নিলে মাচান যাবে ! কি করা যায় ! ঠাকরুণ তখন এক তাড়া দলিল জ্বালিয়ে ভাত রেঁধেছেন ! জানো ?

প্রিয়লাল ॥ বটে ! [সৌদামিনীর দিকে রুদ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে] একথা সত্যি ?

সৌদামিনী ॥ কি জানি! ও আমাকে কতকগুলো কাগজ দিলে! তখন অত দেখবার সময় ছিলনা—আর দেখেই বা কি হত! খেতে হবে তো! বাঁচতে হবে তো!

প্রিয়লাল ॥ আমি দেখছি। যদি সত্যি হয়—[পরাণের প্রতি] আজ তোমার এক দিন কি আমার এক দিন! [দলিলের তাড়াগুলো বের করে দেখতে লাগল]

পরাণ ॥ [সৌদামিনীকে] আমি চললাম ঠাকরুণ! ভেবেছিলাম থাকব—মরতে হয় এক সঙ্গেই মরব—বাঁচতে হয় এক সঙ্গেই বাঁচব—কিন্তু···খিদের জ্বালা আর সইতে পারছি না!

সৌদামিনী ॥ ইচ্ছে করেই তুমি খাওনি পরাণ! আমি তো তোমায় খেতে বলেছি!

পরাণ ॥ হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু খাইনি—কেবলি মনে হয়েছে, আমি খেলে তোমাদের পেট ভরবে না! যতক্ষণ সইতে পেরেছি, সয়েছি। কিন্তু আর পারছি না!

সৌদামিনী ॥ কিন্তু যাবেই বা কোথায়? চারদিকে সমুদ্রের মতো জল।

পরাণ ॥ বাঁচতেই যে যাচ্ছি, তাই বা তোমাকে কে বললে ঠাকরুণ?

সৌদামিনী ॥ তবে যেয়ো না। এক সঙ্গেই মরব।

পরাণ ॥ কিন্তু সে আরও ভীষণ। এখনও চারটি চাল আছে। ভাতও হতে পারে—দেশলাই আছে—দলিল আছে।···কিন্তু ভাত হলেই তা না খেয়ে পারব না—ভাত দেখলেই এবার আর আমি নিজেকে রাখতে পারব না—কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলব।

সৌদামিনী ॥ বেশ তো, এ দুদিন আমরা খেয়েছি, আজ তুমি খাবে!

পরাণ ॥ তাও পারব না—না। আমাকে পালাতেই হবে—মরতে—তোমাদের চোখের আড়ালে!

সৌদামিনী ॥ কিন্তু বাঁচা কি কিছুতেই যায় না!

পরাণ ॥ না। আমি ভেবে দেখেছি, তুমিও দেখছ, জল যে রকম বাড়ছে···

বাঁচবার আর কোন উপায়ই নেই।...পাঁঠাটা জবাই করে কাঁচা মাংস খেতে যাচ্ছিলাম আমি! বাঁচবার কোন উপায় থাকলে কোন মানুষ এ পারত! ...না। মরতে এখন হবেই, তখন মানুষের মতই আমায় মরতে দাও ঠাকরুণ!

সৌদামিনী॥ [চুপি চুপি] তোমার মরা হবে না। তুমি চলে গেলে আমি মনে ব্যথা পাব পরাণ!

[পরাণ যেন কেমন হয়ে গেল। অভিভূতের মতো সে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে রইল]

সৌদামিনী॥ তুমি যাবে?

পরাণ॥ না।

[প্রিয়লাল কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে রিভলভার]

প্রিয়লাল॥ [পরাণকে] দু'হাজার টাকার দলিল তুমি আমার পুড়িয়েছ!

সৌদামিনী॥ চারটি ভাতের দাম এত...তা তো জানতাম না!

প্রিয়লাল॥ তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব!

[গুলি করতে রিভলভার তুলল]

পরাণ॥ [সৌদামিনীর দিকে চেয়ে] আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—তোমার সঙ্গে—কিন্তু—হ'লনা!

সৌদামিনী॥ তুমি বাঁচবে। সবাই বাঁচবে। কেউ মরবে না—যতক্ষণ আমি আছি।

প্রিয়লাল॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

সৌদামিনী॥ [মুচকি হেসে] গুলি কর। দেরী করছ কেন?

প্রিয়লাল॥ [হঠাৎ কি মনে হল। রিভলভারটা খুলে দেখে—গুলি নেই!]

প্রিয়লাল॥ [সৌদামিনীর প্রতি] তোমার কাজ?

সৌদামিনী॥ [মুচকি হাসতে লাগল]

প্রিয়লাল॥ কোথায় গুলি, বল—

সৌদামিনী॥ [জল দেখিয়ে দিল]

পরাণ ॥ [হেসে উঠল] আমারটি কিন্তু হাতেই আছে—[ছুরি তুলে ধরল]

সৌদামিনী ॥ তাহলে এবার ভাত রাঁধা যাক। বাঁচতে হবে—আমাদের সবাইকে বাঁচতে হবে। চাল আছে—কিন্তু কাঠ নেই—বাঁশও নেই।

পরাণ ॥ দলিল আছে। দেশলাই আছে।

প্রিয়লাল ॥ [দলিলের তাড়াগুলো সৌদামিনীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে] নাও। কিন্তু আমি চললাম।

পরাণ ॥ স্বচ্ছন্দে। ভেলাটি তোমাকে দিলাম মহাজন।

প্রিয়লাল ॥ [সৌদামিনীকে] আমি যাচ্ছি। কিন্তু একা যেতে হবে এ যদি জানতাম, আমি আসতাম না। আমি বাঁচতে পারতাম,—বাঁচতে পারতাম সৌদামিনী!

সৌদামিনী ॥ তুমি যেয়ো না। তুমি থাকো।

প্রিয়লাল ॥ আমি থাকব? কোথায় থাকব?

সৌদামিনী ॥ আমার সংসারে!

প্রিয়লাল ॥ তোমার সংসার! ঐ ঘাটের মড়া! এরি মাঝে!…সৌদামিনী! তুমি চলে এস! এখনো—এখনো—সময় আছে! এখনো হয়ত আমরা দুজনেই বাঁচতে পারব!

সৌদামিনী ॥ সবাইকে নিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে!

প্রিয়লাল ॥ কিন্তু আমি চাই, তোমাকে!

সৌদামিনী ॥ আমিও চাই—তোমাকে।…তুমি চলে গেলে আমার জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে।

প্রিয়লাল ॥ তবে তুমি কেন থাকছ? এসো—

সৌদামিনী ॥ কি করে যাই! আমার স্বামী! আমার ছেলে! কাউকেই আমি ছাড়তে পারছি না! যাদের পেয়েছি কাউকেই আমি ছাড়তে পারছি না! না, তোমাকেও না! তুমি যেয়ো না!

প্রিয়লাল ॥ বেশ, যাব না।…কিন্তু এখানে থাকা মানে মরা।

সৌদামিনী ॥ যদি মরি, এক সঙ্গেই মরব!

পরাণ ॥ [দূরে একটা বড় নৌকা দেখতে পেয়ে]—বেঁচে গেলাম। আমরা বেঁচে গেলাম! ঐ যে কত বড় একটা নৌকা এইদিকে আসছে!

প্রিয়লাল ॥ [দেখে] রিলিফ পার্টির নৌকা! ঐ যে নিশান! আমরা বেঁচে গেলাম! বেঁচে গেলাম!

সৌদামিনী ॥ আমরা বাঁচলাম···সবাই আমরা এক সঙ্গে বাঁচলাম! [নরুকে ডাকতে লাগল] নরু! নরু! ওঠো···ভোর হয়েছে!

[শ্রীহর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৩৮]

তৃষ্ণা

প্রথম দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ উদ্যান। প্রভাত। রাণী সুদর্শনার সখীত্রয়—ছন্দা, নন্দা ও সন্ধ্যা পুষ্প চয়ন করিতেছে ও বসন্তের আবাহন-গীতি গাহিতেছে। রাণী সুদর্শনার প্রবেশ]

সুদর্শনা॥ (সখীদের প্রতি) আজ যে তোরা মেতে উঠেছিস! ব্যাপার কি?

ছন্দা॥ নব বসন্তে আজ যে মদনোৎসব সখি, তা কি ভুলে গেছ?

সুদর্শনা॥ ও, হাঁ, আজ শুক্লা পূর্ণিমা। কিন্তু কা'কে নিয়ে হবে মদনোৎসব! তোমাদের রাজা কোথায়?

নন্দা॥ মহারাজা কি এখনো জাগেন নি সখি? ঘুমিয়েই আছেন?

সুদর্শনা॥ এত বেলা হয়েছে—জেগেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার জীবনে মহারাজ ঘুমিয়েই রইলেন চিরদিন। জাগলেন না কখনো। আশ্চর্য লোক! উচ্ছ্বাস নেই, উত্তাপ নেই, মনে হয় প্রাণহীন যেন এক পাথর।

সন্ধ্যা॥ রাতদিন রাজ্যের কথা ভাবেন। রাজকার্য নিয়েই মেতে থাকেন। প্রজারাই ওঁর জীবন।

সুদর্শনা॥ হাঁ, সন্তানের অভাব প্রজাদের দিয়ে পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আমার হাহাকার পূর্ণ করবে কে? যাক্—আজ যে মদনোৎসব—রাজার কি তা স্মরণ আছে?

ছন্দা॥ আমরা তো ভেবেছি—তুমিই রাজাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ সখি।

সুদর্শনা॥ স্মরণ ছিল না আমার নিজের। কি স্মরণ করবো? কাকে স্মরণ

করবো ? শীত আর বসন্ত—আমার জীবনে এক। তফাৎ নেই এতটুকু। শীতে নেই উত্তাপ, বসন্তে নেই উচ্ছ্বাস।

নন্দা॥ ছিঃ, সখি। রাজাকে তুমি এত ভুল বুঝো না—বুঝো না সখি। তোমাকে তিনি ভালবাসেন। গভীর তাঁর প্রেম—তাই তাতে নেই উচ্ছ্বাস। চলো সখি, মদনদেবের মন্দিরে। বসন্তের এই পুণ্য প্রভাতে—তাঁকে প্রণাম করে আসি।

সুদর্শনা॥ না, না, না। রাজপুরীর বাইরে রাজপথে আর আমি বেরুতে পারি না—পারব না।

নন্দা॥ কেন সখি ?

সুদর্শনা॥ রাজপথে রথারোহণে যখন যাই—জয়ধ্বনি শুনি আমার। চোখে পড়ে সন্তানবতী সব নারী। মাতৃবক্ষে কত শিশু। আমার চোখ জ্বলে যায় নন্দা—আমার চোখ জ্বলে যায়।

সন্ধ্যা॥ মনে কর না কেন রাণি—তারা তোমারি সন্তান। রাজা যেমন মনে করেন।

সুদর্শনা॥ অক্ষমতার সান্ত্বনা—রাজা উপভোগ করছেন—করুন। আমি পারব না। আমি তো অক্ষম নই। তোরা যা—মন্দিরে। কর—তোরা উৎসব। উৎসব হোক্ ঘরে ঘরে।

ছন্দা॥ সে কি রাণি। তোমাকে বাদ দিয়ে উৎসব! তাকে কি কেউ উৎসব বলবে ?

সুদর্শনা॥ তোরা জানিস্ না—জানিস্ না তোরা। তাই বলিস্ এ-কথা। অথবা জানিস—মন রাখতে বলিস মিথ্যা কথা।

ছন্দা॥ এ তুমি কি বলছ রাণি ?

সুদর্শনা॥ জানিস্ না তোরা—আমাকে দেখলে লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলে—অলক্ষুণে, বন্ধ্যা। এক ভিখারিণীর দুঃখ দেখে কাল গিয়েছিলাম তাকে ভিক্ষা দিতে। ভয়ে ভয়ে সে ভিক্ষা নিলে। কিন্তু তারপরই কি দেখলাম জানিস দূরে গিয়ে সে-ভিক্ষা সে ফেলে দিলে !···তোরা যা, তোরা যা ·

নন্দা ॥ কিন্তু তোমায় ফেলে কি করে যাব আমরা?

সুদর্শনা ॥ (সক্রোধে) যা বলছি।

[সখীত্রয় ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল। রাণী সুদর্শনা কাহারও দর্শন-প্রতীক্ষায় চারিদিকে তাকাইলেন। অবশেষে একটি বেদীতে বসিলেন। দেখা গেল—একটি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া উদ্যানের মালিনী রাণীর কাছে আসিয়া তোড়াটি তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া উঠিল। রাণী তোড়াটি হাতে লইলেন]

সুদর্শনা ॥ এ তোড়া তুই বেঁধেছিস্?

মালিনী ॥ হাঁ।

সুদর্শনা ॥ মিথ্যে কথা। এত ভাল তোড়া তুই আবার কবে বাঁধলি? সত্যি বল।

মালিনী ॥ সে বেঁধেছে।

সুদর্শনা ॥ তোর স্বামী?···তাই বল। তোর স্বামী বুঝি চাঁপা ফুল খুব ভালবাসে? তাই এত চাঁপা ফুল দিয়েছে।

মালিনী ॥ চাঁপা ফুলেব মত তোমার রঙ্—তাই।

সুদর্শনা ॥ তুই বুঝি তাকে বলেছিস?

মালিনী ॥ সে নিজে তোমায় দেখেছে যে—একদিন।

সুদর্শনা ॥ রাজপথে রথে হয়তো আমায় কোনদিন দেখেছে কিন্তু তাতেই সে এত দেখেছে?

মালিনী ॥ পথেও দেখেছে—তবে সে দেখেছে দূর থেকে! কিন্তু একদিন আমার অসুখ হতে ওকে পাঠিয়েছিলাম আমার বদলে বাগানের কাজে। সেদিন খুব কাছে থেকে দেখেই না সে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে—মবতে বসেছে।

সুদর্শনা ॥ হুঁ। কিন্তু ভাবছি—কি করে তোদের সাহস হলো? এ-বাগানে রাজা ছাড়া আর কোন পুরুষের আসা নিষেধ। তোর অসুখ হলো—বাগানে ঝাড়ু না হয় একদিন না-ই পড়তো। কোন্ সাহসে তুই তাকে পাঠালি বল্ দেখি?

মালিনী ॥ সাহসে নয় রাণীমা—ভয়ে, গর্দানের ভয়ে। অসুখ বলে বাগান

ঝাঁট দিতে একদিন কসুর হতো—রক্ষা ছিল আমার? তাই না পাঠালাম ওকে।

সুদর্শনা॥ আমি কিন্তু তাকে দেখিনি।

মালিনী॥ তোমার দেখবার তো কথা নয় রাণী-মা। আমি যে বলেই দিয়েছিলাম—কেউ যদি রাণী-মাকে দেখে—গর্দান যাবে তার।

সুদর্শনা॥ হাঁ,—আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু সে আমাকে দেখেছে! খুব কাছ থেকে দেখেছে! কোথা থেকে?

মালিনী॥ তুমি যখন ঐ সরোবরে স্নান করছিলে—দেখেছে তখন ঐ অশোক গাছের আড়াল থেকে।

সুদর্শনা॥ কি দুঃসাহস! প্রাণের ভয় ছিল না!

মালিনী॥ প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়েই দেখেছিল। প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়ে আজও সে এসেছে।

সুদর্শনা॥ এসেছে? কোথায় সে?

মালিনী॥ ঐ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ নাগকেশর গাছের আড়ালে। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাণী-মা—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কি করে ওকে বাঁচাব—আমি জানি না—জানি না!

সুদর্শনা॥ ওকে বাঁচতে হলে—ওকে মরতে হবে। হাঁ—ওকে মরতে হবে—মরতে হবে। আয়। দেখিয়ে দে—কোথায় সে?

[রাণী সুদর্শনা নাগকেশর গাছের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল মালিনী]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি আম্রবৃক্ষতলে সারা দেহে ভস্ম-বিভূতি মাখিয়া এক তরুণ সাধু বসিয়া আছেন; স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁহার পদধূলি লইতেছে। সাধু মৌনী; তিনি নীরবে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন]

রাজানুচর॥ [সমাগত লোকজনদের প্রতি] সাধুবাবার কাছে এখন কেউ থাকতে পারবে না। রাজারাণী সাধুবাবার দর্শনে আসচেন। চলে যাও—এখান

থেকে, এখন সবাই চলে যাও। চলো—চলো—[সমাগত লোকজনদের মৃদু গুঞ্জন। রাজানুচরগণ তাহাদিগকে বিতাড়ন করিয়া লইয়া গেল। মালিনী সাধুর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া সম্মুখে আনিয়া রাখিল]

[সাধু নীরবে ফুলগুলি দেখিতে লাগিলেন]

মালিনী ॥ প্রভু, পূজার ফুল।

মালিনী ॥ এখানে তো কেউ নেই। মুখ খোলো, দুটো কথা বলো।

সাধু ॥ কি, আর বলবো! আমি অবাক হয়ে গেছি, বৌ। ছিলাম সামান্য এক মালী। লোকে ছায়া মাড়াতে চাইতো না। ছাই ভস্ম মেখে যেই সাধু সেজেছি, রাজ্যের লোক এসে পায়ে পড়ছে। পায়ের ধুলো নিচ্ছে। আশীর্বাদ চাইছে। বাণী শিখিয়ে দিয়েছিল কথা বলো না, মৌনী হয়ে থেকো। তাই রক্ষে। কথা বললেই বেরিয়ে পড়তো বিদ্যেবুদ্ধি। কথা কই না, লোকের ভক্তি তাতে আরো বেড়ে গেছে। রাজ্যের ঘরে ঘরে আজ শুধু আমারি কথা, 'সাধুবাবা'—'মৌনীবাবা'। আমার চোখের দৃষ্টিতে লোকের ব্যারাম সারছে, বিপদ কাটছে, টাকা হচ্ছে, দুঃখ ঘুচছে! হ'লো কি মালিনী, হলো কি?

মালিনী ॥ রাণীব বুদ্ধিতেই সব হয়েছে। সাধু সাজলেই এ সব হয়। রাণীর কথায় দেশত্যাগী হলে। রটনা হল তুমি মরে গেছ। আমি বিধবা সেজে একটা বৎসর কাঁদলাম। ছাই ভস্ম মেখে, মৌনীবাবা সেজে ফিরে এলে তুমি। রাজ্যের লোক তোমার পায়ে পড়ছে। সবই বুঝলাম। কিন্তু এখনো বুঝলাম না, রাণীর কি মতলব। কি করে তুই তাকে পাবি, সে তোকে পাবে।

সাধু ॥ কি তার মতলব, এখনই দেখবি। ঐ দেখ—রাজা আসছেন—রাণী আসছেন। রাণী! সেই রাণী! আজ নিজে আমার কাছে আসছেন। ফুলের ডালা আমার সাজিয়ে দে, উজাড় করে আমি ওর পায়ে ঢেলে দেব।

[শান্ত সমাহিতভাবে সাধু অপেক্ষা করিতে লাগিল। মালিনী পুষ্পার্ঘ সাজাইতে লাগিল। রাজা ও রাণী যুক্তকরে প্রবেশ করিলেন]

রাজা ॥ তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে রাজ্য আমার ধন্য। প্রজারা কৃতকৃতার্থ।

রাজা আমি, কিন্তু আমার মতো এত বড় দুঃখী আর কেউ নেই প্রভু। আমি অপুত্রক। আমার দুঃখ দূর কর।

রাণী ॥ জীবন আমার ব্যর্থ। রাজপুরীতে এসে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর। দয়া কর প্রভু, দয়া কর।

[সাধু নীরব, নিশ্চল রহিলেন]

রাণী ॥ কত লোকের কত মনস্কামনা তুমি পূর্ণ করেছ। শুধু এই হতভাগিনীকেই কি তুমি কৃপা করবে না প্রভু?

[সাধু ইঙ্গিতে রাজা ও মালিনীকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন]

রাজা ॥ রাণি, সাধুবাবা হয়তো তোমাকে গোপনে কিছু বলতে চান। যেমন করেই হোক—ওঁর দয়া তোমাকে পেতেই হবে রাণি! আমি তোমার জন্য অদূরে অপেক্ষা করছি।

[রাজা চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে মালিনী গেল]

রাণী ॥ তুমি আমাকে চেয়েছিলে। আমি এসেছি।

[সাধু নীরব রহিলেন]

রাণী ॥ না, না—আর মৌনী হয়ে না থাকলেও চলবে। কেউ নেই এখানে —কথা কও—

[সাধু তথাপি নীরব রহিলেন]

রাণী ॥ না, না—আমি তোমাকে মৌনী হয়ে থাকতে বলেছিলাম সবার কাছে —যাতে ধরা না পড় তুমি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? নিষেধ তো করিনি। আমি তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছি—তুমি আমাকে ধরা দিচ্ছ না যে? চলো আমার প্রাসাদে। আমাকে পুত্র দাও—

[সাধু তথাপি নীরব রহিলেন]

রাণী ॥ এ কি! তবু তুমি নীরব? কার ভয় করছ তুমি? রাজার? ঐ অক্ষম রাজাকে ভয় করি না আমি—ভয় ক'রো না তুমি। আমি—আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি প্রাসাদে। রটনা করেছি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হবে—প্রাসাদ-উদ্যানে

গড়েছি তোমার মন্দির—সে মন্দিরে থাকব শুধু তুমি আর আমি।—ওঠ, আমি তোমার পায়ে পড়ছি—আমি—আমি—রাণী সুদর্শনা…

সাধু॥ তুমি সুদর্শনা। কিন্তু তোমার চেয়েও সুদর্শনা নারী আমার পদধুলি নিয়ে ধন্য হয়েছে। দেশের রাজা প্রণাম করেছেন আমাকে। ধনী বল—নির্ধন বল—সুখী বল—দুঃখী বল—কাছে এসেছে—পুজো করেছে। পুজো করেছে আমাকে! কে আমি! দীনহীন নগণ্য এক মানুষ। লোকের অস্পৃশ্য ছিলাম আমি। তুমি—তুমি রাণী সুদর্শনা—আমাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছ। তোমারি কথাতে ঘরসংসার ছেড়ে চলে যাই দূরে—বহু দূরে। আবার ছাইভস্ম মেখে সাধু সেজে ফিরে আসি তোমারি দুয়ারে। কিন্তু আজ আর আমার তৃষ্ণা নেই। সাধুর এই মিথ্যা সাজ যদি আমায় দিয়েছে এত ধন, এত রত্ন, এত অর্থ, সেই মিথ্যা যদি আমার জীবনে সত্য হয় সুদর্শনা—পাব আমি পরমার্থ, আমার সকল তৃষ্ণা, আমার সকল কামনার মোক্ষ। আমার জীবনে এসেছে এক নতুন আলো—সে আলো জ্বেলেছ তুমি। আমার নবজন্মের গুরু তুমি—তোমাকে প্রণাম।

[ফুলগুলি রাণীর চরণে অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিল। সুদর্শনা পাষাণী দেবীর মত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন]

[উজ্জ্বল ভারত, আশ্বিন, ১৩৫৯]

কালীবাড়ী

দুর্গা ॥ কি ভাই গঙ্গাজল, আজ যে ভারি ব্যস্ত-সমস্ত দেখছি!

কালীতারা ॥ হ্যাঁ ভাই, আজ একটু সকাল-সকাল নেয়ে-খেয়ে ঘরদোরে হাত দিয়েছি। ধোঁয়াতে আর কালীর ঝুলে দুদিনেই যা নোংরা হয়!

দুর্গা ॥ বস্তির ঘরবাড়ী এমনই হয়। কতই-বা ধোবে আর কতই-বা পুঁছবে! ধুয়ে-পুঁছে না-হয় এক রকম দাঁড় করালে। ঐ নোংরা নর্দ্দমাটা? ওর কি করতে পারছ শুনি?

কালীতারা ॥ কি আর করছি! কোথায় পাবো তোমার মতো শিশিতে শিশিতে এসেন্স! ও ধারের জানলা আমার বন্ধই থাকে, গরমে পচে মরি, তবু।... কটুকে তো এঘরে শোয়া ছেড়ে দিয়েছে, বারান্দায় শোয়।

দুর্গা ॥ তা' সেই ভালো। হলেই বা বাপ-মা, ছেলে এখন আলাদা শোয়, সেই ভালো,—এখন,...বোঝবার বয়স হয়েছে তো!

কালীতারা ॥ তোমার যত অনাসৃষ্টি কথা। আমাদের এ বয়েসে কী-ই বা দেখবে আর কী-ই বা বুঝবে! ঘর মোটে এই একখানা; একটা মাত্র ছেলে, শিবরাত্রির সলতে, বারান্দায় শোয়, সইতে পারি না। রাতে চমকে চমকে উঠি।

দুর্গা ॥ বলি তো তোমাদের দাসবাবুকে,...এসেন্সের কারখানায় কাজ ক'রে নিজে তো হয়েছো নবাব। হাজার হাজার শিশি প্যাক করছ, রোজ একটি করে শিশি বাড়ী আনছো, তো একদিন না হয় এক শিশি এসেন্স বেশী করেই পকেটে পুরলে, ওগো এক শিশি এসেন্স না হয় আমার 'গঙ্গাজলে'ই ঢালো! পারে না। দামী-দামী সব ব্যাপার তো!

কালীতারা ॥ সত্যিই তো।

দুর্গা ॥ আজ এনেছে হাস্নুহানা। এ নাকি জাপানদেশের রাণীদের গোসা ভাঙতে হলে চাই-ই। এ মাসে একদিনও থিয়েটার দেখতে পাই নি, বুঝলে ভাই, কাল রাতে তাই নিয়ে—···তাই মান ভাঙাতে আজ এই হাস্নুহানা। তা এনেছ, বেশ, জামা কাপড়ে দাও। তা না।···বুকটা আমার এখনো জলছে! স্নান করিয়ে ছেড়েছে! যত বলি লোকে বলবে কি, তত মেতে ওঠে। বলে, লোকে বলবে একটি ফুটন্ত ফুলের বাগান হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেখ দেখি কথা!

কালীতারা ॥ তা মিথ্যে কি। তুমি এখানে এলে নর্দ্দমাটা একেবারেই ভুলে যাই!

দুর্গা ॥ তুমি ব'লেই একথাটা বললে। অন্য লোকের যে চোখ টাটায়!

কালীতারা ॥ চোখ নয়, নাক। জুতো জোড়া বেশ চক্‌চকে হয়েছে, না?

দুর্গা ॥ তা হয়েছে। এতও পার তুমি। যেমন করে লেবু ঘসছো, চামড়া উঠে না যায় দেখো। তোমাদের দাসবাবুর এতে মন উঠবে না। এই তো আজ থিয়েটারে নিয়ে যাবেন, এরি মধ্যে মুচির ডাক পড়েছে; দেখে এলাম জুতো বুরুষ হচ্ছে। কোন কাজ যদি নিজে হাতে করবেন। তা,···না, এ জুতোও বেশ ঝকঝকে হয়েছে। হঠাৎ আজ এমন জাঁকজমক কেন ভাই? কর্তা বুঝি যাবেন কোথাও?

কালীতারা ॥ হ্যাঁ, বলে গেছেন আমাদের নিয়ে আজ রাতে একটু বের হবেন।

দুর্গা ॥ তা ছাপাখানায় সারাদিন ভূতের মতো খেটে-খুটে একটু বের হওয়া ভালো। তোমাদের দাসবাবু তো বলেন, থিয়েটার-প্রেসে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছেপে-ছেপেই ভদ্দরলোক মারা গেল, একটা দিনও যদি থিয়েটার দেখে! আমি হেসে বলি, চিনির বলদ! উনি বলেন, চুপ, শুনলে রাগ করবেন ভদ্দরলোক। আমি বলি, আমার গঙ্গাজলের বর, এ ঠাট্টা আমি করব না তো করবে কে?

কালীতারা ॥ সত্যি ভাই ঠিক বলেছ, চিনির বলদ। ফট্‌কে তো বলে, শহরের

দেওয়ালে দেওয়ালে যত থিয়েটারের বিজ্ঞাপন সব তার বাবার হাতে ছাপা। এই নিয়েই তার কি গরব! তবু তো আজ পর্যন্ত এক দিনও থিয়েটার দেখে নি! আমিই তো ফটুকে-কে বলি, তোর বাবা একটি চিনির বলদ, খোকা! ও নিয়ে বড়াই করতে নেই!

দুর্গা॥ তা একদিন কেন যাওনা ভাই, থিয়েটারে। পুরুষদের ওপর একটু জোরজবরদস্তি করতে হয় বৈ-কি! শখ্ বলে কোন জিনিষ তো ওদের নেই।

কালীতারা॥ যাদের ভাত চলে না, তাদের শখ্ না থাকাই রক্ষে। তবু তো আমাদের শখের অন্ত নেই। দেখছ না—ফটকে-কে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে? এদিকে ভাত চলে না, ওদিকে ফটকের জন্যে প্রাইভেট-মাস্টার রাখবেন শুনছি। হেডমাস্টার নাকি বলেছেন, বাড়ীতে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে ছেলে আমার বৃত্তি পাবে।

দুর্গা॥ তোমাদের দাসবাবু কথাটা শুনেছেন। শুনে কি বলেন জানো? বলেন, গরীবের আবার ঘোড়া রোগ কেন? আমি বলি, চুপ, শুনলে রাগ করবেন ভদ্দরলোক। তোমাদের দাসবাবু বলেন, বা-রে তোমার গঙ্গাজলের বর, এ ঠাট্টা আমি করব না তো করবে কে?

কালীতারা॥ মিথ্যে তো তিনি কিছু বলেন নি। গরীবের ঘোড়া রোগ···তা মিথ্যে নয়। ওঁর জেদ ছেলেকে যাতে ছাপাখানার ভূত হতে না হয় তা তিনি করবেন।

দুর্গা॥ ছাপাখানার ভূতই বটে! যে চেহারায় ঘরে ফেরেন! তা চেহারাখানা তো আর মন্দ নয়। আমি তো তোমাদের দাসবাবুকে বলি, না খেতে পেয়ে মরে গেলেও ছাপাখানায় তোমায় কাজ করতে দেব না।

কালীতারা॥ না না, কখনো দিয়ো না। এসেন্সের কারখানায় প্যাকারের কাজ ঢের ভালো কাজ। রোজ এক শিশি এসেন্স পকেটে পুরতে পারলে বৌএর মন-চুরি করা যায়। ছাপাখানার কাজে সে সুবিধে নেই ভাই।

দুর্গা॥ কি জানি ভাই, কথাটা ঠিক বুঝলুম না। চোর বললে না তো!

কালীতারা॥ যদি বলেই থাকি, আমার গঙ্গাজলের বরকেই বলেছি। এ ঠাট্টা আমি করবো না তো করবে কে!···দেখ দেখি ভাই, এ-জামাটা আর রিফু করব? খোল নলচে বদলালে হুঁকোটার যা থাকে, এ-জামাটা হয়েছে তাই! এই জামা গায়ে দিয়ে আজ উনি বাইরে বের হবেন! বলি, একটা জামা কেনো— তা উনি বলেন, সে-দামে ফটকের একটা মানে-বই কেনা যাবে।

দুর্গা॥ কোথায় যাচ্ছো ভাই আজ? জামাকাপড় ঝেড়েপুঁছে যে আর রাখলে না!

কালীতারা॥ কি জানি ভাই, বলেছেন যাবেন! জানো তো, না গেলে বিশ্বাস নেই! আমাদের কোনখানে যাওয়া···আজ তিনবছরের মধ্যে এ-ঘরের বাইরে পা দিয়েছি বলেতো মনে পড়ছে না।

দুর্গা॥ নেমন্তন্ন-টন্ন বুঝি?

কালীতারা॥ আমাদের নেমন্তন্ন কে করবে ভাই? আর নেমন্তন্ন করলেও যেতেই কি পারি? ট্রাম-বাসের ভাড়া কোত্থেকে যোটে?

দুর্গা॥ আজ?

কালীতারা॥ কি জানি!—জানি না ভাই। ফটকে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। আজ খবর শুনে কাজে বেরুবার সময় বলে গেছেন ফটকেকে নিয়ে আজ আমরা— না ভাই, এখনো আমার বিশ্বাস হয় না। কি করে পারবেন? কিরে খোকা, এরি মধ্যে ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল?

[ফটিকের প্রবেশ]

ফটিক॥ আজ যে শনিবার তা বুঝি মনে নেই? এই যে মাসিমা! বাড়ীতে পা দিতেই বুঝেছি তুমি এসেছ! আজ তো চামেলী নয়, [ঘ্রাণ নিতে নিতে] বকুল, না তাও নয়,···বল না কি?

দুর্গা॥ জাপান দেশের নাম শুনেছিস?

ফটিক॥ বারে! তা আর শুনব না!

দুর্গা॥ সে দেশের রাণী রাগ করলে সে দেশের রাজা—

ফটিক॥ মিকাডো বল—

দুর্গা ॥ মিকাডো-ফিকাডো নয়, রাজা—

ফটিক ॥ ঐ ওদের রাজাকেই মিকাডো বলে।

দুর্গা ॥ তুই তোর মেসোর চেয়ে বেশি জানিস ?

ফটিক ॥ তুমি মেসোকে বলেই দেখো। মিকাডো। সেই মিকাডো বুঝি এই এসেন্স—

দুর্গা ॥ তা যদি মিকাডোই হয়, তাতেই বা কি ? একটি শিশির দাম তিন তিনটি টাকা! কখনো শুনেছিস ? তোর মেসোতো বললেন, আজ এই এসেন্স মেখে থিয়েটারে যাচ্ছি, যত লোকের যত এসেন্স সব চাপা না পড়ে তো কি !

ফটিক ॥ থিয়েটারে যাচ্ছো ? থিয়েটারে যাচ্ছো ! আজ তোমরা থিয়েটারে যাচ্ছো ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। চন্দ্রগুপ্ত দেখতে যাচ্ছি।

ফটিক ॥ নাট্যনিকেতনে ? দুর্গাদাস চন্দ্রগুপ্ত, অহীন চৌধুরী সেলুকস আর শিশির ভাদুড়ী চাণক্য ! সেই থিয়েটার দেখতে যাচ্ছ ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। তোর দেখচি সব নাম মুখস্থ ! দেখেছিস কোনদিন এঁদের ?

ফটিক ॥ না দেখলেও ওঁদের আমি জানি। ওদের যত হ্যাণ্ডবিল, যত প্ল্যাকার্ড সবই আবার বাবা ছাপেন যে ! দেখিনি ওঁদের কোনদিন, তবু হ্যাণ্ডবিল তো পড়েছি ! আজ দু'বছরে ওঁদের যত হ্যাণ্ডবিল বেরিয়েছে আমার কাছে সব আছে, সব আমার মুখস্থ।

কালীতারা ॥ খোকা, তুই কোন্ জামাটা পরবি ? এ-টা না ও-টা ? এটা একটু ছিঁড়েছে, ওটা আবার ময়লা।

ফটিক ॥ মাসি ! ওদের আমি দেখিনি সত্যি, কিন্তু দেখলেই আমি চিনবো !

দুর্গা ॥ ওদের দেখা তো কম কথা নয় ! এই যে আজ আমরা যাচ্ছি, এরি মধ্যে একটাকা দু'টাকা তিনটাকার সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। দু'টাকার শেষ দু'খানা টিকিট তোমার মেসো দু'টাকা দু'টাকা চার টাকা দিয়ে কিনে এনেছেন,

সেও মারামারি করে। এখন যা আছে—চার টাকার খানকয়েক আর পাঁচটাকার খানকতো—তাও নাকি থাকবে না।

ফটিক॥ মা, মাসীকে বলি?

কালীতারা॥ কি আবার বলবে? এখনো উনি ফিরলেন না, যাওয়া হবে কি না-হবে বুঝছি না বাবা!

দুর্গা॥ কোথায় যাবে তোমরা? বায়োস্কোপ-টায়োস্কোপ দেখতে বুঝি? তা বাপু মন্দ নয়, চার আনা পয়সা হলেই যাওয়া যায়। তা তোমার মেসোর গোঁ, বলেন মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার! ও সব চার আনা ছ আনার ব্যাপারে আমি নেই। শোন কথা!

ফটিক॥ তবে শোন মাসি। আমরাও আজ ঐ থিয়েটারেই যাচ্ছি—চন্দ্রগুপ্ত দেখতে!

দুর্গা॥ কোথায় যাচ্ছ?

ফটিক॥ নাট্য-নিকেতনে। চন্দ্রগুপ্ত দেখতে।

দুর্গা॥ তোমরা যাচ্ছ?

ফটিক॥ হ্যাঁ!

দুর্গা॥ নাট্য-নিকেতনে? যেখানে আজ ঐ দুর্গাদাস—আরো আরো সব কে-কে মস্ত মস্ত—

ফটিক॥ হ্যাঁ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী আর শিশিরকুমার ভাদুড়ী "যাঁরা বাঙলায় নব নাট্যযুগের সূচনা করেছেন, যাঁরা—"

কালীতারা॥ এই খোকার সুরু হ'ল। ওসব রেখে আমায় বল দিকিনি কোন্ জামাটা পরবি?

দুর্গা॥ টিকিট বুঝি আগেই কিনে রেখেছিলে? এক টাকার টিকিট?

ফটিক॥ না মাসি। ও, টিকিট কিনে আমরা থিয়েটার দেখি না। ও দেখবে তোমরা।

দুর্গা॥ তার মানে?

ফটিক॥ বছরের পর বছর বাবা ঐ থিয়েটারের যত ছাপার কাজ সব ছেপে

যাচ্ছেন। ধরতে গেলে ও থিয়েটার তো আমাদের। তাই ওঁরা আমাদের পাস দেবেন, বুঝলে মাসি ?

দুর্গা ॥ তাই নাকি ! তা হলে এদ্দিন তোমরা চুপচাপ ছিলে কেন বাপু ? এমন সুবিধে থাকতে ?

কালীতারা ॥ ট্রামবাসের খরচটা তো আর ওঁরা দেন না !

দুর্গা ॥ আজ বুঝি দেবেন ?

কালীতারা ॥ না। দুদিনের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আজ উনিই দেবেন। আজ একটা কিছু আনন্দ উনি করবেনই। ওই যে—খবর পেয়েছেন পরীক্ষায় খোকা ফার্স্ট হয়েছে !

দুর্গা ॥ তা থিয়েটারে যাবে, যাবে। তার জন্যে বাড়ীঘর দেখছি ধুয়ে-পুঁছে ছেঁড়া ঐ জুতো জোড়ার মতই চক্‌চকে করে তুললে ! আমি ভাবছিলুম কারো বুঝি বিয়ে !···তা আসি ভাই, তোমরা যাবে পাসে, আর আমাদের হচ্ছে টিকিট, তাও দুটাকার টিকিট, একটু আগে-ভাগেই যেতে হবে। দেখো বাবা ফটিক, ফার্স্টক্লাসে বসে লাস্টক্লাসের এই মেসো-মাসীকে চিনতে পারবে তো ?

ফটিক ॥ ও তোমার এসেন্সের গন্ধে আমি তোমায় ঠিক চিনে নেব মাসী।

দুর্গা ॥ ফাষ্টো হওয়া ভালো, তাই বলে ধরাকে সরা-জ্ঞান করা ভালো নয় বাবা। আসি দিদি।

[প্রস্থান]

কালীতারা ॥ মাসীর মনে কেন ব্যথা দিলি খোকা !

ফটিক ॥ আজ দিন পেয়েছি মা, দিয়েছি। ও রকম ব্যথা তোমার মনে উনি তিনশো পয়ষট্টি দিন দিচ্ছেন। চিরদিন তুমি সয়েই গেছ। আজ আমরা দিন পেয়েছি।

কালীতারা ॥ না বাবা, কারো মনে ব্যথা দিতে আমার বড্ড ভয় হয় !··· কোন্ জামাটা তুই পরবি বাবা ?

ফটিক ॥ এটা একটু ছেঁড়া হলেও এইটেই বেশ সাফ্ আছে। এটা আমার

মানায়ও ভালো, তুমিই বলেছ। এইটেই আমি পরব। কিন্তু বাবার জামা ঠিক করে রেখেছ ?

কালীতারা ॥ ওঁর একটা জামাও শাদা নেই। কালীর দাগ আছেই। ক্ষার দিয়ে কেচেও হার মেনেছি। তা একটা উড়নি আছে। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলে, একরকম চলে যাবে এখন। ওঁর জুতো জোড়া চার পয়সা দিয়ে সেলাই করিয়ে নিয়েছি। লেবু দিয়ে নিজেই ঘ'সে—

ফটিক ॥ . চমৎকার হয়েছে। বাবা দেখে অবাক হয়ে যাবেন—ভাববেন নতুন জুতো এল কোত্থেকে !

কালীতারা ॥ দে, তোর স্যাণ্ডেল জোড়া একটু সাফ করে দি।

ফটিক ॥ এই স্যাণ্ডালেই চলবে এখন। আমার ধুতির আড়ালে একে লুকিয়ে রাখতে আমি যা পারি, তুমি অবাক হয়ে যাবে দেখে। লোকে জানবে পায়ে স্যাণ্ডাল রয়েছে—কিন্তু দেখতে পাবে না কেউ। তুমি কোন শাড়ীখানা পরবে মা ?

কালীতারা ॥ তাই তো ভাবছি। এই-টে কেমন হবে রে খোকা ?

ফটিক ॥ এটা যে আটপৌরে মা ! সোনা-মামা তোমায় যে সেই একবার পূজোয় একখানা জংলা শাড়ী দিয়েছিল—সেইটে—সেইটে পরো মা !

কালীতারা ॥ সেটা—সেটা নেই বাবা।

ফটিক ॥ নেই ! বল কি মা ? কি করেছ সেটা ?

কালীতারা ॥ না, সেটা নেই। আমি এইটেই পরব। ক্ষার দিয়ে কেচে কেমন ধবধবে করেছি, তোদের ধোপাতেও এমন পারতো না, বুঝলি খোকা। এই যে ! এলেন !

[ফটিকের বাবা সাধুচরণের প্রবেশ]

ফটিক ॥ বাবা, সব তৈরি। মা জামাকাপড় সব গুছিয়ে রেখেছে।

সাধুচরণ ॥ তাতো বুঝলুম বাবা, কিন্তু—

কালীতারা ॥ কি ? পাস দেয়নি ?

সাধুচরণ ॥ তা দিয়েছে। এমন পাস দিয়েছে যা আমরা ভাবতেও পারি না। স্পেশাল কুশন, ছ'টাকা করে এক এক সিট্।

ফটিক ॥ আমি জানি, একেবারে ফার্স্ট রো!—হুররা! হুররা!

কালীতারা ॥ [সাধুচরণকে] তবে? তবে আবার 'কিন্তু' কেন? শরীর ভালো আছে তো?

সাধুচরণ ॥ ও পাস আমার মতো লোককে দেওয়া মানে আমাদের যাওয়া হল না।

কালীতারা ॥ কেন, কেন?

ফটিক ॥ কেন বাবা?

সাধুচরণ ॥ ঐ সব সিটে রাজা-মহারাজার মতো লোকেরা বসেন। আমি থিয়েটারের কর্তাকে বললাম, হুজুর এক টাকার সিট্ দিন। তিনি বললেন, এই ক'খানা সিট্ ছাড়া আর সিট্ই নেই সাধুচরণ! আজ দশ বছরের মধ্যে তুমি একদিনও পাস চাও নি, তাই তোমায় দিলাম। সেজেগুজে একটু ফিটফাট হয়ে এসো, তাহলেই হবেথ'ন। তা আমাদের এই সব সাজ-সজ্জা নিয়ে কি করে ওখানে গিয়ে বসব! লোকে হাসবে যে!······গেট-কিপার ঢুকতেই দেবে না—বলবে, চোর! চুরি করেছে!

ফটিক ॥ কার সাধ্যি তা বলে! থিয়েটারের কর্তা তো রয়েছেন।

সাধুচরণ ॥ সে তো পরের কথা। তিনি এসে না-হয় গোলমাল মেটাবেন, কিন্তু গোলমালটা হলেই যে মাথা কাটা যাবে। সঙ্গে তোমার মা থাকবেন, তাঁর মনের অবস্থাটা কি হবে, সেটা ভেবে দেখ!

কালীতারা ॥ [ফটিককে] আজ আবার তোমার মাসীও যাচ্ছেন। এ রকম একটা গোলমাল হলে তার কাছে তো আর মুখ-দেখানো যাবে না খোকা!

সাধুচরণ ॥ আসতে আসতে ভাবছিলুম আমাদের নতুন জামাকাপড় কিনতে কত লাগে! খুব কম করে টাকা পনরো।

কালীতারা ॥ না না, সে সব চলবে না। খোকার প্রাইভেট মাস্টার

রাখতে হবে। বেশ তো, থিয়েটার না-হয় আমরা নাই দেখব। কি বলিস খোকা?

ফটিক॥ [নিরুত্তর রইল]

সাধুচরণ॥ [কালীতারাকে] আচ্ছা, তোমার মেজদার দেওয়া তোমার সেই জংলা শাড়ীখানা?—ও! সেইটেই তো আমাদের বড় বাবুর মেয়ের বিয়েতে দিতে হ'ল, না?

কালীতারা॥ [নিরুত্তর রইল]

ফটিক॥ তার চেয়ে বরং ঠনঠনে কালীবাড়ীতে চল মা। আজ অমাবস্যা আছে। তায় আবার শনিবার। আজ ওখানে বিশেষ ঘটা ক'রে আরতি হবে, দেখবে এখন!

কালীতারা॥ ঠনঠনে কালীবাড়ী!

ফটিক॥ [হেসে] হ্যাঁ মা, ওখানে বোধ হয় স্পেশাল কুশন নেই, আর এ জামা-কাপড়ও চলবে।

কালীতারা॥ চল বাবা চল—

ফটিক॥ দাঁড়াও মা, তার আগে মাসীকে এ পাসটা দেখিয়ে আসছি; গিয়ে বলছি, মাসী, ও দুটাকার টিকিটে থিয়েটারে না গিয়ে তোমরাও আমাদের সঙ্গে এস। চল, গিয়ে মা-কালীকে বলি, থিয়েটারের সব সিটগুলোই এক দামের—এক দরের করে দাও মা! যদ্দিন না করছ, তদ্দিন আমরা থিয়েটার দেখছি না, হ্যাঁ।

[উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৪৬]

উল্কাপাত

[কলিকাতায় সুরুচিসম্পন্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসভবন। হল-ঘর। ইহা উপবেশন কক্ষও বটে, আবার লাইব্রেরীর সাজসজ্জাও বর্তমান। একপার্শ্বে ডাইনিং টেবিল সমেত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যা

এই হল-ঘরে কেহ ছিলনা। পর্দা সরাইয়া প্রথমে একজন বৃদ্ধ ও তৎপরে একজন বৃদ্ধা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের হাব-ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহারা বহুদিন পরে কোনও পরিচিত স্থানে আসিয়াছেন]

বৃদ্ধা॥ কত বদ্‌লেছে!

বৃদ্ধ॥ এই ছাখো—বসবার ঘরে আবার খাবার টেবিল এনেছে।

বৃদ্ধা॥ টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া খোকার খুব সাধ ছিল। কেবল তোমার ভয়েই সেটা পারতো না।···তা যাক্, কিন্তু ঘরটা কেমন সুন্দর সাজিয়েচে! ওগো দেখেচো—তোমার আর আমার ফটো কেমন সুন্দর বাঁধিয়ে পাশাপাশি রেখেচে!

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ।···কিন্তু লোকজন সব কোথায় গেল? বিয়ে-বাড়ী বলে মনেই হচ্ছেনা।

বৃদ্ধা॥ ভেতরে বোধহয় যে যার কাজে ব্যস্ত।

বৃদ্ধ॥ তাই বলে বসবার ঘরটা ভালো করে সাজানোর কথাটা ভুলে যাওয়া তো উচিত হয়না।—একটু ফুল-টুল···একটু ধূপ-ধূনো!—বাড়ীর মালিক বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আসছে আজ, তা এদের কারোর কোনো খেয়াল নেই!

বৃদ্ধা॥ দেখতে শুনতে তো ঐ এক উমা, আর তো সব ঝি চাকর। তা, উমা

একা ক'দিক সামলাবে বল ? তাছাড়া সাজিয়ে গুজিয়ে লাভই বা কি ? যার জন্যে সাজানো, সে-ই তো আজ চলে যাবে।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, তা-ও তো বটে ! কিন্তু তবু বলবো, এরা তো তা' জানেনা। যে কাজে যেটুকু দরকার, তা' কেন হবেনা ?

বৃদ্ধা ॥ চুপ ! কে যেন আসছে।

[নেপথ্যে কে বলিয়া উঠিল—]

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ দিদিমণি, বসবার ঘরটা আমি সাজিয়ে আসছি।

বৃদ্ধ ॥ এই মরেছে ! সেই হতচ্ছাড়া ভোলা—ব্যাটা এখনও বেঁচে আছে।

বৃদ্ধা ॥ ও তোমাকে যা' ভয় পেতো !—দেখলেই পালাতো। আজ দেখতে পাবেনা—এই যা রক্ষে।

[দুইটি ফুলের মালা ও ঝাড়ন হস্তে বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলার প্রবেশ। ফুলের মালা দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া ঝাড়ন দিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল]

ভোলা ॥
খোকাবাবুর বিয়ে।
টোপর মাথায় দিয়ে ॥
বউ এনেছে সোনা।
তাইরে নারে না না ॥

বৃদ্ধ ॥ ব্যাটা আবার গান গাইছে।

বৃদ্ধা ॥ ঐ গান গেয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াতো—মনে নেই ?

[ধূপ-ধুনা হস্তে বিধবা উমার প্রবেশ]

উমা ॥ কিন্তু ভোলাদা, বর-কনে আসার সময় হল, আমাদের আত্মীয়-স্বজন এখনও তো সব এলোনা।

ভোলা ॥ যারা আসবার তারা সব এসে গেছে—গোল-বারান্দায় বসে হাওয়া খাচ্ছে। এই গরমে বসবার ঘরে কেউ বসতে চাইছেনা, অথচ বসবার জন্যে আজ সারাদিন খেটে খুটে এই ঘরটাই সাজিয়েছি, জঞ্জাল সাফ করেছি, ডজন খানেক ইঁদুর মেরেছি।

উমা ॥ যত মারছ তত বাড়ছে—ইঁদুরের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

...দাও দেখি,...মালা দুটো বাবা-মার ফটোতে পরিয়ে দিই ! [মালা দুইটি লইয়া] খোকা আজ বিয়ে ক'রে ঘরে বৌ আনছে। আজ যদি মা-বাবা বেঁচে থাকতেন, কতো সুখী হতেন। হ্যাঁ ভোলাদা, আজ এ সব কাজকর্ম যাঁদের করার কথা, তাঁরা চলে গেছেন স্বর্গে। পড়ে রয়েছি তুমি আর আমি। সব সামলাতে পারবো তো ?

ভোলা ॥ তা স্বর্গে গেলে কি হবে— ওঁদের আশীর্বাদ রয়েছে তো। তুমি কিচ্ছু ভেবোনা দিদিমণি। ও আমরা ঠিক চালিয়ে নেবো।

[ভোলা একটি টুল আগাইয়া দিলে তাহাতে উঠিয়া উমা ফটো দুইটিতে মালা পরাইতে লাগিল। ভোলা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল]

বৃদ্ধ ॥ ফুলের মালা আমাদের গলায় পরাচ্ছে উমা।

বৃদ্ধা ॥ বিধবা হয়ে আসা অবধি আমাদের দু-জনের জন্মদিনে আমাদের গলায় মালা-পরানোর এই উৎসব—এ উমাই শুরু করেছে।

বৃদ্ধ ॥ জীবনে কোনো সুখই তো তুমি পাওনি মা। বাপের সংসারে এসে যেটুকু শান্তি পেয়েছিলে, আজ তুমি তাও হারাবে। তোর দিকে আমি তাকাতে পারছিনা মা !

বৃদ্ধা ॥ [বৃদ্ধের প্রতি] এ সবই তোমার পাপের ফল।

[ইতিমধ্যে উমা মালা পরানো শেষ করিয়া টুল হইতে নামিল]

উমা ॥ [ফটোর দিকে চাহিয়া যুক্তকরে] শুনেছি, বাড়ীতে যখন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে, পূর্বপুরুষরা তখন উপস্থিত হন। আজ আমার খোকন-ভাইয়ের বিয়ে ! নিশ্চয়ই তোমরা এখানে এসেছ। অলক্ষ্যে থাকলেও আশীর্বাদ করো, বৌ নিয়ে আমার খোকন-ভাই যেন সুখী হয়—এ সংসারে যেন আবার চাঁদের হাট বসে।

[উমা যুক্ত-করে প্রণাম করিল]

ভোলা ॥ হ্যাঁ কর্তা-বাবু—হ্যাঁ কর্তী-মা—খোকন যেন আমাদের সুখী হয়।

[ভোলাও যুক্ত করে প্রণাম করিল। উমা ধূপ-ধুনা দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল]

উমা ॥ হ্যাঁ ভোলাদা, কাল রাতে বিয়ের সময় তুমি তো ছিলে। এ বিয়েতে খোকনকে খুব খুসী দেখলে তো ?

ভোলা ॥ ডগমগ, ডগমগ—খুসীতে ডগমগ।

উমা ॥ [ভোলার কাছে গিয়া চুপি চুপি] আমার ভয় কি জান ভোলাদা ? খোকন উল্কাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। জানতো !

ভোলা ॥ সে দোষ ওই উল্কার। এতো আমি একশ বার ব'লেছি—ওই উল্কাই খোকনকে তাতিয়েছিল।

উমা ॥ [ফটোর দিকে তাকাইয়া] কিন্তু সে বিয়ে আমি বন্ধ ক'রেছি! কিছু অন্যায় ক'রেছি বাবা ? ওই উল্কাকে তুমিই একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে বাড়ীতে এনে মানুষ ক'রেছিলে। ব'লেছিলে—জাত-কুলের ঠিক নেই। কোন্ এক অনাথা মেয়ে। সেই মেয়ের সঙ্গে আমাদের খোকনের বিয়ে হ'তে পারে কখনও ? তোমরা যদি বেঁচে থাকতে—বিয়ে দিতে ? কখনও না।

বৃদ্ধা ॥ না, না, না, কখনও না। তখন জানতাম না ব'লেই ও মেয়েকে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলাম। এ সংসারের কলঙ্ক ওই মেয়ে। সর্বনাশী ওই মেয়ে। ও আজ খোকনের সর্বনাশ ক'রবে। ওকে তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।

বৃদ্ধ ॥ চুপ। ওরা শুনবে।

বৃদ্ধা ॥ কই শুন্‌ছে! যদি শুন্‌তো তবে তো বেঁচে যেত, খোকন আমার বেঁচে যেত। ওরা আমাদের দেখছে না, শুন্‌ছে না, শুধুই আমি কেঁদে মরছি।

বৃদ্ধ ॥ থামো, থামো। শোন ওরা কি ব'লছে।

[ইতিমধ্যে উমার ধূপ-ধুনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে]

উমা ॥ একথা ঠিক ভোলাদা, উল্কার রূপের তুলনা নেই। বুদ্ধি-শুদ্ধিও খুব। কিন্তু আর তো কোন পরিচয় নেই তার। আর, যে বৌ আমরা ঘরে আন্‌ছি, সে নামেও যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি লক্ষ্মী। নামকরা বড় ঘরের মেয়ে; লেখা-পড়ায়,

গান-বাজনায়, বেথুন কলেজে ফার্স্ট্। সুন্দরী অবশ্য উল্কার মত নয়। কিন্তু রূপ ধুয়ে তো আর জল খাব না। কি বল ভোলা দা?

ভোলা॥ তা নয়তো কি দিদিমণি! কর্ত্তাবাবুর পুণ্যের সংসারে মা-লক্ষ্মী এলেন। এইটেই হ'ল গিয়ে বড় কথা।

বৃদ্ধা॥ পুণ্যের সংসার! পুণ্যের সংসার!! পুণ্যের সংসারই যদি হ'ত—তাহ'লে ওই কালনাগিনী এ বাড়ীতে ঠাঁই পেত না।

[উল্কা ও তাহার বান্ধবী রত্নার প্রবেশ। উভয়ের হস্তে মালা গাঁথিবার ফুল ও সরঞ্জাম]

উমা॥ একি উল্কা! বর-কনে আসার সময় হয়ে এলো, এখনও তোমাদের মালা গাঁথা হয়নি?

উল্কা॥ একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না দিদি! তাই এই ঘরটায় এলাম। ভেবো না দিদি! রত্না আর আমি দুজনে হাতাপাতি করে এখনি মালা গেঁথে ফেলচি।

উমা॥ তুমি এসো ভোলাদা। গোল-বারান্দায় তুমি চা-জলখাবার দাও গিয়ে। আমি বরণের আয়োজন দেখছি।

[উমা ও ভোলার প্রস্থান। উল্কা ও রত্না মালা গাঁথিতে বসিল]

বৃদ্ধা॥ কিগো, মুখ ফিরিয়ে কেন? ভালো ক'রে চেয়ে দেখ—তোমার বিষবৃক্ষে আজ কী ফুলটি ফুটেছে!

বৃদ্ধ॥ ফুল—ফুলই! ফুলের কী দোষ! দোষ ওরও নয়, ওর মারও নয়—দোষ আমার!

রত্না॥ [মালা গাঁথিতে গাঁথিতে] ওঃ! খুব হাত চালাচ্ছিস্ তো! আমি ভেবেছিলাম, গিয়ে দেখব তুই কাঁদতে বসেছিস্।

উল্কা॥ জীবনে কোনোদিন কাঁদিনি। কাঁদবার মেয়ে আমি নই।

রত্না॥ কিন্তু ভাই, আমি বলছি—আমার বুকের ধন যদি কেউ এমনি করে ছিনিয়ে নিতো, আমি সইতে পারতুম না।

উল্কা॥ লক্ষ্মীদেবীর কথা বলছো? না, তাঁর কী দোষ? তাঁর কোনো দোষ নেই।

রত্না ॥ বুঝিছি—ব্যথাটা কোথায় বুঝিছি। আচ্ছা, তোর কাছেই তো একবার শুনেছিলুম, যে যত বাধাই দিক্, রমেনবাবু তোকে বিয়ে করবেনই।

উল্কা ॥ বলেছিলেন। আমি তোমাকে মিথ্যে বলিনি রত্না।

রত্না ॥ মিথ্যে বলেছেন তবে তিনি। কিম্বা সত্যিই বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা রাখার সাহস হ'ল না। কথাটা হয়ে দাঁড়াল মিথ্যে। এরা পুরুষ নয় ভাই, কাপুরুষ। বরং বলবো তুই বেঁচে গেছিস্।

উল্কা ॥ [হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল] উঃ!

রত্না ॥ কী হ'ল?

উল্কা ॥ ছুঁচটা আঙুলে ফুটে গেছে।

রত্না ॥ কই—দেখি, দেখি। ইস্।

উল্কা ॥ [রত্নাকে ঠেলিয়া দিয়া] সরে যা। রক্ত দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে ॥

বৃদ্ধ ॥ ইস্! রক্ত বেরিয়েছে।

বৃদ্ধা ॥ আমি জানি—আমি জানি—রক্তারক্তি আজ কিছু একটা হবেই!

রত্না ॥ চল্—চল্—একটু আইডিন্ দিয়ে দিই।

উল্কা ॥ না, না, এ আর কি হয়েছে—বরং ভালোই হলো। ফুলগুলো আমার রক্তে রাঙা হয়ে গেল। রক্ত আমি ভা-রি ভালোবাসি।

রত্না ॥ তুই বলছিস্ কী উল্কা! রক্তটাতো এখনও বন্ধ হলো না।

উল্কা ॥ রক্ত কোনদিন খেয়েছিস্? এই ছাখ—আমি খাচ্ছি।

[ক্ষত স্থান চুষিতে লাগিল]

রত্না ॥ রাক্ষুসী!

[নেপথ্য হইতে শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল]

রত্না ॥ শাঁখ বাজছে। বর-কনে তবে এসে গেছে।

উল্কা ॥ তুই যা [রত্নার হস্তস্থিত মালা লক্ষ্য করিয়া] ওটা তো হয়ে গেছে। এটা আমি শেষ করে আসছি।

[রত্নার প্রস্থান

[উল্কা দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে কান পাতিয়া মাঙ্গলিক ধ্বনিসমূহ শুনিতে লাগিল]

বৃদ্ধ ॥ উল্কা, শোন্ মা—শোন্—

বৃদ্ধা ॥ ও খুন করবে, খুন—দেখে নিও, ও খুন করবে। তৈরি হচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ শোন্ মা, খোকনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না—হতে পারে না।

বৃদ্ধা ॥ সে কথা আজ ব'লে লাভ কি? আজ হয়তো তুমি বুঝছো, পাপ মানুষ করে লুকিয়ে, কিন্তু সে পাপ চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তার বিষময় ফল ফলবেই। ওর চোখ-মুখ দেখে বুঝছো না? খোকনকে ও আজ খুন করবে!

বৃদ্ধ ॥ না, না, ঐ দেখ—ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, ঐ তো মালা গাঁথা শেষ করলো। হ্যাঁ মা, যে কথা আমি জীবনে কাউকে বলতে পারিনি—বলিনি, আজ তোমাকে আমি বলছি, খোকন্ আর তুমি—দুজনেই আমার সন্তান।

বৃদ্ধা ॥ আজ আর একথা কাকে বলছো? কে শুনছে? আমি তোমার স্ত্রী—আমার কাছে যে কথা কখনও তুমি বলোনি, সে কথা জগতের কেউ আজ শুনতে পাবে না। ঐ দ্যাখো, ও চলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু মুখে ওর হাসি ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধা ॥ হ্যাঁ সেই হাসি—বাজ পড়বার আগে বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে।

[মালা লইয়া উল্কা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেখানে রমেন ও লক্ষ্মী বর-কনের সাজে সজ্জিত অবস্থায় বিধবা দিদি উমা কর্তৃক আনীত হইল। উল্কা চমকাইয়া উঠিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল]

উমা ॥ [ফটো দুখানি দেখাইয়া লক্ষ্মীর প্রতি] ঐ আমাদের বাবা, আর ঐ আমাদের মা। আজ এই পরম দিনে ওঁরা কেউ বেঁচে নেই।

রমেন ॥ না দিদি, বেঁচে নেই একথা বলো না॥ ঠাকুর বলেছেন—মৃত্যু হওয়া মানে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। ওঁরা দুজনেই আমাদের জীবনে বেঁচে আছেন।…হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে ওঁরা আমাদের দেখছেন—আশীর্বাদ করছেন [লক্ষ্মীর প্রতি] এসো আমরা প্রণাম করি।

[উভয়ে প্রণাম করিল]

উমা ॥ এইবার এসো গোল-বারান্দায় এসো। সবাই নতুন বৌয়ের গান শুনবে বলে বসে আছে।

রমেন ॥ আজকে ওকে রেহাই দাও দিদি। বাপের বাড়ী ছেড়ে আসতে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গে গেছে।

লক্ষ্মী ॥ না দিদি। তবে হ্যাঁ, আজ আমাকে রেহাই দিন, বরং আজ আর কেউ গাইবে, আর আমি শুনব।

রমেন ॥ উল্কা, তুমি যাও না ভাই। আজকের রাতটা ম্যানেজ্ কর।

উমা ॥ দুধের স্বাদ তো ঘোলে মিটবে না ভাই। যেতে হবে তোমাকেই। এসো না—ভয় কি? তুমি কথা কইলেই সে ওদের কাছে গান হয়ে দাঁড়াবে। চল—চল—

রমেন ॥ হ্যাঁ, চল। ওদের কাছে তোমাকে নিয়ে এর আগেই আমার যাওয়া উচিত ছিল।

[লক্ষ্মীকে লইয়া উমা ও রমেনের প্রস্থান। উল্কার মনে হইল, তাহাকে এমন অপমান আর কখনও কেহ করে নাই। কিন্তু এ আঘাতে সে ভাঙিয়া পড়িল না। বরং দলিতা ফণিনীর মতো সে তাহাদের গমনপথের দিকে দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে তাকাইয়া কী ভাবিতে লাগিল]

বৃদ্ধা ॥ দেখেছো, মেয়েটার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। কিন্তু আমি বলবো উমা ঠিকই করেছে। বরং বলবো, আজ এই শুভদিনে ঐ অলুক্ষুণে মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

বৃদ্ধ ॥ না, না, বরং শুভদিনেই কারোর মনে আঘাত দিতে নেই। এ দিনে কারোর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া ভাল নয়।

[রমেনের পুনঃ প্রবেশ]

রমেন ॥ কী! খুব মেজাজ দেখানো হচ্ছে যে!

উল্কা ॥ মানে?

রমেন ॥ কেন তুমি এলে না আমাদের সঙ্গে? আজকের দিনে গোমড়ামুখে কেন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে দূরে দূরে?

উল্কা ॥ তবে কি আমাকে নাচতে হ'বে আজ?

রমেন ॥ আলবাৎ হবে।…এ বিয়ে আমি চাইনি। এ বিয়ে যে চেয়েছিল, সে তুমি।

উল্কা ॥ বেশ তো। তাই বলে আমাকে ধেই ধেই করে নাচতে হবে আজ, এমন কোন কথা ছিল কি রমেনদা ?

রমেন ॥ নাচতে তুমি পারবে না—কাঁদতেই তোমাকে হবে, এ আমি জানতুম। দিদি যখন বললে—পথ থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে বিয়ে করা চলে না, আমি তা' মানিনি। বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে বিয়ে করতেই চেয়েছিলুম তোমাকে আমি। কিন্তু তুমি তাতে রাজী হওনি।

উল্কা ॥ হ্যাঁ হইনি। তোমার বাবা আমাকে এ সংসারে ঠাঁই দিয়েছিলেন —সে সংসার ভেঙে দেবার মতো নেমকহারামি আমি করতে পারি না রমেনদা —একথা আমি তোমাকে কতোবার বলবো! জীবনে কি শুধু প্রেমটাই বড় হবে ? কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছু নেই ?

রমেন ॥ কৃতজ্ঞতা—কৃতজ্ঞতা! আমার বাবার সংসার না ভেঙে আমার জীবনকে চুরমার করে দেওয়া—এই তোমার কৃতজ্ঞতা!

উল্কা ॥ তোমার জীবন আমি চুরমার করিনি রমেনদা। আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলেছি।

রমেন ॥ হ্যাঁ, সে বিয়ে আমি করেছি—শুধু দেখতে—শুধু বুঝতে—তুমি কতো বড়ো পাষাণ। যে আঘাত তুমি আমাকে হেনেছো, সেই আঘাত সুদে-আসলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি আজ। মুখ ভার করে বসে থাকলে চলবে না। আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে। নতুন বোয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের খেলা দেখে তোমাকে হাসতে হবে, নাচতে হবে। আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে—এসো—

উল্কা ॥ আমি যাবো না। আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

রমেন ॥ সে আমি জানি না। তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

উল্কা ॥ বেশ, যাবো। দুজনেই যাবো একসঙ্গে—চিরতরে।

রমেন ॥ চিরতরে! মানে ?

উল্কা ॥ কেন? মনে নেই? তোমাতে-আমাতে যখন বিয়ে হ'তে পারে না জানা গেল, একদিন রাত্রে তুমিই তো বলেছিলে—এসো উল্কা বিষ খাই—চিরমিলনের পথে যাই।

রমেন ॥ বলেছিলুম। কিন্তু সেদিন তুমি রাজী হওনি। পরে আমি ভেবে দেখলুম, মরা অতো সোজা নয়।

উল্কা ॥ কিন্তু এখন দেখছি বাঁচাও অতো সোজা নয়।

রমেন ॥ কি বললে! উল্কা, এ তুমি কি বললে?

[লক্ষ্মীকে লইয়া উমার পুনঃ প্রবেশ]

উমা ॥ যা ভেবেছিলুম তাই।

রমেন ॥ হ্যাঁ দিদি, তাই। খুব লোককে মালা গাঁথবার ভার দিয়েছো। আমি এসে তাড়া দিয়ে তবে মালা-গাঁথা শেষ করিয়েছি।

উমা ॥ বেশ করেছো। এখন এই নাও ভাই, তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। [উল্কার প্রতি] এই কাজের দিনে সবচেয়ে বেশি অকাজ করছো তুমি উল্কা।

উল্কা ॥ অকাজ! কী আর এমন অকাজ করিছি।···কিছু না করেও যখন বদনাম কিনছি, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে—এমন কিছু করতে হবে—

উমা ॥ আর যা-ই কর, লোক হাসিও না উল্কা।

[উমার প্রস্থান

লক্ষ্মী ॥ উল্কা—চমৎকার নাম তো!

রমেন ॥ এই—এই ছাখো! উল্কার সঙ্গে তোমার এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। উল্কা—আমার বোন না হলেও—বোনের চেয়েও বেশী। একসঙ্গে খেলাধুলো করে মানুষ হয়েছি।

[লক্ষ্মী উল্কাকে প্রণাম করিতে গেল]

বৃদ্ধ ॥ লক্ষ্মী—মা আমার সত্যি লক্ষ্মী!

বৃদ্ধা ॥ কিন্তু ও মেয়েটি অলক্ষ্মী। ওর কাছে যাওয়া কেন?

উল্কা ॥ [লক্ষ্মীকে] না ভাই, আমাকে তোমায় প্রণাম করতে হবে না।

[উল্কা হস্তস্থিত মালাটি লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিল]

বৃদ্ধা ॥ পাপীয়সী ঐ ফুলের তলে সাপ লুকিয়ে রাখেনি তো ?

বৃদ্ধ ॥ পাপী আমি, পাপীয়সী ওর মা—মেয়েটার কি দোষ ?

বৃদ্ধা ॥ থামো। দোষ ওর রক্তের।

লক্ষ্মী ॥ [মালাটি দেখিতে দেখিতে] কী সুন্দর !

রমেন ॥ কী সুন্দর তোমায় মানিয়েছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ॥ এ হ'ল গিয়ে আমার ধার করা রূপ। [উল্কাকে দেখাইয়া] রূপের মহাজন তোমার সামনে।

রমেন ॥ হলো তো! এতো বড়ো প্রশংসা তুমি আমার কাছেও কোনদিন পাওনি উল্কা। ওগো মহাজন, ইতরজনের মিষ্টান্ন বরাদ্দ থাকে। আর কিছু না হোক্ চট্ করে দু গ্লাস সরবৎ খাইয়ে দাও দেখি।

উল্কা ॥ বোসো—আনছি। [উল্কার প্রস্থান

বৃদ্ধা ॥ [আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া] বিষ দেবে ! এই সরবতেই ও বিষ দেবে।

রমেন ॥ [লক্ষ্মীকে] ওঃ···তুমি ঘেমে উঠেছো। আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

[টেবিল পাখাটা খুলিয়া দিতে গেল]

বৃদ্ধা ॥ [চীৎকার করিয়া] খোকন—খোকন খবরদার—ওর সরবৎ তোরা খাবিনে।

বৃদ্ধ ॥ না, না, উল্কা অতোটা নীচ হতে পারে না।

বৃদ্ধা ॥ কেন পারে না ? যারা সমাজে এতোটা নিচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে।

রমেন ॥ পাখাটার কী ব্যাপার ! লাইট্ জ্বলছে, অথচ পাখাটা চলছে না !

[লাঠি হস্তে ভোলার প্রবেশ]

রমেন ॥ এই যে ভোলাদা। [তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া] লাঠি ! ব্যাপার কি বলোতো ?

* ভোলা ॥ সেঁকো বিষেই যদি ইঁদুর মরতো, তবে বলতুম শালারা ভদ্দর লোক ! লাঠিই ওদের একমাত্র ওষুধ। কই ? কোথায় ইঁদুর ?

[উদ্যত লাঠি লইয়া চারিদিকে ইঁদুর খুঁজিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ ইঁদুর! কোথায়?

রমেন ॥ তাই তো—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভোলাদা?

ভোলা ॥ আজ ক'দিন ইঁদুরের উৎপাত ভীষণ বেড়েচে সত্যি। সব ঘরের যত জঞ্জাল আজ আমি নিজে হাতে সাফ করেছি। শুধু এই ভয়ে যে, বৌমা যেন ভয় না পায়। তাও রক্ষে নেই! আজ এই শুভ দিনে বৌমার গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল!

রমেন ॥ বৌয়ের গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল? কখন ভোলাদা? [লক্ষ্মীকে] কি গো, কখন?

লক্ষ্মী ॥ ব্যাপার কি? ধেড়ে ইঁদুর—লাফিয়ে গেল—আমার গায়ের ওপর দিয়ে? কখন?

ভোলা ॥ বাঃ! যায়নি? তবে যে—উল্কা আমার বাক্স থেকে ইঁদুর-মারা সেঁকো বিষের পুরিয়া নিয়ে ছুটে এলো—খাবারে মিশিয়ে এ ঘরে ছড়িয়ে দিতে! ইঁদুর মারতে!

রমেন ॥ কই? কখন?

লক্ষ্মী ॥ কোথায় ইঁদুর?

রমেন ॥ না, না, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। উল্কা আনতে গেছে সরবৎ, আমাদের জন্যে!

ভোলা ॥ আনতে গেছে সরবৎ?

[ভোলা কি যেন ভাবিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ কিন্তু এ কী রকম ঠাট্টা?

[লক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল]

রমেন ॥ তাই তো!—আর সরবৎ আনতেই বা এতো দেরি কেন?

[রমেন পথের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল]

বৃদ্ধা ॥ বুঝেছি—আমি বুঝেছি—ইঁদুরের নাম করে বিষ নিয়ে তা মেশাচ্ছে ঐ সরবৎএ। (চীৎকার করিয়া) তোরা বুঝিসনি। আমি বুঝেছি। খবরদার। ওর দেওয়া সরবৎ তোরা খাবিনে! খবরদার—খবরদার!

বৃদ্ধ ॥ সে কি এতো নিচে নামবে ? এতো নিচে !

বৃদ্ধা ॥ যারা সমাজের এতোটা নিচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে—ও সব পারে।

[একটি ট্রেতে দুই গ্লাস সরবৎ লইয়া হাসিমুখে উল্কার প্রবেশ। সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল]

বৃদ্ধা ॥ রাক্ষুসি ? সর্বনাশি ? তোর মনে এই ছিল—তোর মনে এই ছিল !

[উল্কা ট্রেটি লইয়া রমেন ও লক্ষ্মীর সম্মুখে ধরিল]

ভোলা ॥ খবরদার খোকন, খবরদার !

বৃদ্ধ ॥ [উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া] শোন্—শোন্ মা উল্কা ! এদ্দিন কাউকে বলতে পারিনি···আজ বলছি—তোর আর খোকনের মা আলাদা হলেও বাপ হচ্ছি আমি। বিয়ে তোদের হয় না—বিয়ে তোদের হয় না।

বৃদ্ধা ॥ কে শুনছে ? সে কথা আজ কে শুনছে ?

উল্কা ॥ [রমেন ও লক্ষ্মীর প্রতি] কি ? নেবে না ?

ভোলা ॥ ইঁদুর—ইঁদুর ! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ ইঁদুর মারবার নাম করে সেই বিষে সরবৎ করে মানুষ মারতে এসেছিস্ ?

[উল্কা স্তম্ভিত হইল—লক্ষ্মী এবং রমেনও]

উল্কা ॥ বিষের সরবৎ দিচ্ছি আমি ?

বৃদ্ধা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা নয় তো কি ? আমাদের চোখে ধুলো দেবে কে ? আমরা স্পষ্ট দেখছি।

বৃদ্ধ ॥ না, না, বিষ তুমি দিতে পার না উল্কা। খোকন তোমার ভাই, তোমরা দুজনেই আমার সন্তান।

উল্কা ॥ [সহাস্যে রমেনকে] তোমাকে আমি বিষ দিতে পারি রমেনদা ? বেশ, তবে খেও না।

[গ্লাসশুদ্ধ ট্রেটি টেবিলে রাখিয়া উল্কার প্রস্থান]

রমেন ॥ না, না, সে কি কথা! তুমি দেবে বিষ!

[রমেন একটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া সরবৎ পান করিতে লাগিল। লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও ভোলা যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—]

—সর্বনাশ!

রমেন ॥ [পান শেষ করিয়া] বিষ নয়, অমৃত। [লক্ষ্মীর প্রতি] লক্ষ্মী তুমি হয়তো খেতে ভয় পাচ্ছো। কিন্তু কিছু ভয় নেই। ও মেয়েটাকে আমি জানি। আমার ভয় হচ্ছে ওর জন্যে। আমি ওকে দেখে আসছি।

[রমেনের প্রস্থান]

বৃদ্ধ ॥ দেখলে তো, আমরা মিছেই ভয় করেছিলাম। বিষ ও দিতে পারে না। নেমকহারামি ও করবে না—ও আমার মেয়ে।

বৃদ্ধা ॥ তোমার মেয়ে বলেই ও নেমকহারামি করবে। তুমি আমার সঙ্গে নেমকহারামি করোনি?

লক্ষ্মী ॥ [প্রস্থানোদ্যত ভোলাকে] দাঁড়াও। আমিও যাবো।

ভোলা ॥ না, না, আমি এখনি আসছি।

[ছুটিয়া রমেনের প্রবেশ]

রমেন ॥ ভোলাদা—ডাক্তার—ডাক্তার—শীগ্‌গীর ডাক্তার ডেকে আনো। বিষ খেয়েছে উল্কা। এসো লক্ষ্মী, আর বোধ হয় ওকে বাঁচাতে পারবো না!

[সকলের ব্যস্তভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান]

বৃদ্ধ ॥ উল্কা আত্মহত্যা করেছে!

বৃদ্ধা ॥ ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে! বাপ-মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

বৃদ্ধ ॥ সন্তানের বিবাহ আর সন্তানের মৃত্যু—দিব্যচক্ষে একযোগে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলাম আমরা। মিথ্যা হলো না। পুত্রের হলো বিবাহ—কন্যার হলো মৃত্যু!!

বৃদ্ধা ॥ পাপের হলো প্রায়শ্চিত্ত!···আজ তোমার মুক্তি!!

[ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬১]

ক্ষণ-স্বপ্ন

পাত্র-পাত্রী

নন্দলাল সেন	...	ধানবাদে কোলিয়ারীর মালিক
নন্দা দেবী	...	ঐ স্ত্রী
নন্দিতা দেবী	...	ঐ কন্যা ; এম, এ ক্লাশের ছাত্রী
সেবা সরকার	...	নন্দিতার তরুণী আয়া
নন্দন দাসগুপ্ত	...	নন্দলালের বন্ধু মালয়-প্রবাসী ব্যবসায়ী-আনন্দমোহন দাসগুপ্তের একমাত্র পুত্র।

প্রথম দৃশ্য

[ধানবাদ। নন্দলাল সেনের গৃহে উপবেশন কক্ষ। নন্দলাল সেন, নন্দা দেবী ও নন্দিতা দেবী—তিনজনেই মোটর-ভ্রমণের উপযোগী পোষাক পরিহিত। একটি গোল-টেবিল ঘিরিয়া তিনজনে বসিয়া চা পান করিতেছেন। আয়া সেবা সবকার একটি থার্মোফ্লাস্ক আনিয়া নন্দিতা দেবীর সম্মুখে ধরিল]

সেবা॥ দিদিমণি! থার্মোফ্লাস্কে চা দিতে বলেছো। সঙ্গে রাখবে, না গাড়ীর কেরিয়ারে দেবো ?

নন্দিতা॥ তোমার বুদ্ধি হ'বে কবে সেবা ? কেরিয়ার থেকে যখন ওটা বের হবে, তখন কি ওটা আর থার্মোফ্লাস্ক থাকবে। আর চা-টা চেয়েছি পথের জন্যে—ধানবাদ থেকে আসানসোলে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়।

[সেবা নীরবে থার্মোফ্লাস্কটি টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল]

নন্দলাল॥ তুমি ওকে বড়ো বেশী বকো নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ শুনলে মা? বাবার কথা শুনলে মনে হয়, সেবাই ওঁর মেয়ে—আমি নই।

নন্দা ॥ তা' বলবো—সেবার চাল-চলনটা তোমার বাবার প্রশ্রয়ে এবাড়ীর মেয়ের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে—আয়ার মতো নয়।

নন্দিতা ॥ চেহারাটাও আয়ার মতো নয়। আমি তথনই বলেছিলাম, এতো 'প্রিটি' আয়া আমার দরকার নেই। তা' বাবার দয়াটাই তথন বড়ো হলো,—আমার মতামতটা ভেসে গেল।

নন্দলাল ॥ খাজাঞ্চীবাবুর শালী—পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তার ঘাড়ে চাপলো। ছাপোষা লোক—নিজেরই সংসার চলে না। ম্যাট্রিক পাশ—দেখতে সুশ্রী—তোমার আয়া হলেই মানায়—এই বলে আমায় যথন ধরলো, তথন তোমার মানটাই বাড়লো—এইটেই আমি ভেবেছিলাম মা। কিন্তু এথন যথন দেথছি, তুমি খুসী নও, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

নন্দা ॥ বুঝলি মা নন্দিতা, সেবার বরাত খুললো। ঠিক দেথিস্,—ছিল আয়া, হবে অফিসের ক্লার্ক বা আর কিছু,—তার মানে পেতো আশী—পাবে দেড়শো।

[দেখা গেল, কুণ্ঠিত-চিত্তে সেবা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে]

সেবা ॥ আসবো?

নন্দিতা ॥ কেন?

সেবা ॥ দিদিমণি, তুমি বোধহয় 'অ্যাম্প্রো'টা নিতে ভুলে গেছো।

নন্দিতা ॥ [তাড়াতাড়ি ভ্যানিটী ব্যাগটি খুলিয়া খুঁজিয়া দেথিয়া] তাইতো! বাঁচালে। 'থ্যাঙ্ক্‌স্'।

[সেবার প্রস্থান]

নন্দলাল ॥ [হাতঘড়ি দেথিয়া] না, আর দেরী করা চলে না। এথনি রওনা না হলে আসানসোল পৌছুতে রাত হয়ে যাবে। পিক্‌নিকের সান্ধ্য-আসরটাই আমরা 'মিস্' করবো।

নন্দা ॥ কেবলি ভয় হচ্ছে, আমরাও চলো যাবো, আর যদি কলকাতা থেকে নন্দন এসে পড়ে ?

[নন্দলাল পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিলেন ও চোখে চশমা দিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলেন]

নন্দলাল ॥ [পাঠ]

"শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং জ্যাঠামশায়, আমি আগামীকল্য প্রাতের ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা বারোটায় ধানবাদ পৌঁছিব। অপরিচিত জায়গা বলিয়া আমি সকালের ট্রেনে গিয়া দুপুরে পৌঁছানোই স্থির করিয়াছি! শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক—শ্রীনন্দন দাসগুপ্তস্য।"

বারোটার ট্রেন কখন চলে গেছে। এখন তিনটে বাজে। আজতো এলোই না। কালও যদি আসে—আসবে সেই দুপুরে। আসানসোল ডাকবাংলায় আজ রাতটা কাটিয়ে কাল দুপুরের অনেক আগেই আমরা এখানে ফিরতে পারবো। ঐ চিঠি পড়ে একথা কি মনে করা যায় যে, আজ আর তার আসবার সম্ভাবনা আছে ? তোর কী মনে হয় মা ?

নন্দিতা ॥ ঐ চিঠি পড়ে বাবা ?

নন্দলাল ॥ হ্যাঁ মা, তোর কী মনে হয় ?

নন্দিতা ॥ লোকটি একটি ভূত—সিঙ্গাপুরী ভূত। নইলে এযুগে কেউ কখনো লেখে মা—[বাবার হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল]—"প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং"। বাব্বাঃ! দাঁত ভেঙে যাবে।

নন্দলাল ॥ আমাদের আনন্দমোহন আজ তিরিশ বছর সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করছে। বছরের পর বছর রোজগার তার এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে, দেশে ফেরবার ফুরসত নেই। সিঙ্গাপুরবাসী হলেও সে বাংলার সংস্কৃতি ছাড়েনি। ছেলে বড় হতে না হতেই আমাকে চিঠি লিখে পাঠালো সংস্কৃত আর বাঙলা বই আর ব্যাকরণ

পাঠিয়ে দাও—ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবো, বাংলা শেখাবো। এ চিঠি সেই শিক্ষার নমুনা। হাসির কথা নয় মা। আমাদের ছোট বেলাতেও এই রকম চিঠি লেখাই রেওয়াজ ছিল। কোটি প্রণাম না জানালে আমার বাবা চটে যেতেন। কোটিপতি হয়েও বন্ধু আনন্দমোহন তার ছেলেকেও কোটি কোটি প্রণামের মন্ত্রটা শেখাতে ভোলেনি।

[সেবার প্রবেশ]

সেবা ॥ কর্তাবাবা, আপনার এই শালটা—

নন্দা ॥ এই গরমে আবার শাল কেন ?

নন্দলাল ॥ নাগো, ও ঠিকই এনেছে। আসানসোলে এই দুটোমাস দিনে যেমন গরম, শেষ রাতটায় আবার তেমনি ঠাণ্ডা—হ্যাঁ, এখানকার চেয়েও। ওটা আমার সুটকেসে দিয়ে দাও।

[সেবা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দা ডাকিল]

নন্দা ॥ আর শোনো।

[সেবা দাঁড়াইল]

নন্দা ॥ আসানসোল থেকে কাল সকালে রওনা হয়ে গোটা দশেকের মধ্যেই আমরা এখানে ফিরবো। বারোটার ট্রেনে কলকাতা থেকে নন্দন আসতে পারে। পথের কথা বলা যায় না—তাও আবার মোটর গাড়ীতে আসবে। এমনও হয়তো হতে পারে,—নন্দন এসে গেল, আমরা তখনও পথে। তাই বলে যেন তার আদর-আপ্যায়ন কি অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়। মনে রেখো,—সে আমাদের হবু জামাই।

সেবা ॥ জানি কর্তা-মা।

নন্দিতা ॥ [চটিয়া] জানো! তুমি কি করে জানলে ?

সেবা ॥ আজ দুদিন ধরে আপনাদের মুখে এই কথাই তো কেবল শুনছি।

নন্দিতা ॥ তুমি ভুলে যাও—তুমি আয়া। আমাদের সব কথা তোমার শোনবার মতোও নয়,—শোনা উচিতও নয়। না বাবা, এসব আমি সইতে

পারিনা। আমি দেখেছি, আমাদের আশেপাশে ওর যখন দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়, তখনও কাজের অছিলা করে থাকে।

নন্দা ॥ কিন্তু দূরে দূরে থাকলে সেও আবার এক বিপদ! ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—তার ওপর সব কিছু বুঝিয়ে বলা—তাও আবার বলবো এক, বুঝবে এক, করবে আর এক। তার চেয়ে এ বরং ভালো।···তবে হ্যাঁ, শুনতে দোষ নেই, —শুনেছো বলা দোষ।

নন্দলাল ॥ [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] তা' যা' বলেছো! এসব শিখো সেবা,—শিখো। হ্যাঁ আর দেখ, এই যে তোমার কর্ত্রী মা বলছিলেন,—কাল আমরা রয়েছি পথে, এদিকে এসে গেছে নন্দন বাবাজী। তা' যদি এসেই যান, কী করে চিনবে তুমি?

সেবা ॥ কেন? তিনি কি তাঁর নাম বলবেন না?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ নন্দন দাসগুপ্ত—নামটা মনে রেখো।

সেবা ॥ নামটা আমার অবশ্যই মনে থাকবে দিদিমণি। কিন্তু ও নামের আর কেউ তো আসতে পারেন।

[সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল

নন্দিতা ॥ [রাগিয়া গিয়া] যতো সব আজগুবি কথা! নন্দন নাম যেন ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

সেবা ॥ না, তা' যাচ্ছেনা বটে দিদিমণি, কিন্তু চোর-জোচ্চোরের ছড়াছড়ি। ঐ নামটি নিয়ে—

নন্দিতা ॥ [চটিয়া গিয়া] বাবা! লুকিয়ে লুকিয়ে সব ডিটেক্‌টিভ্ নভেল পড়ে। তাই এই সব উদ্ভট কথা।

নন্দলাল ॥ কিন্তু মা, কাগজে তো আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, এ সবও হচ্ছে। কিন্তু সেবা, বুদ্ধির বহরটা যদিও তোমার বেশী, চোর-জোচ্চোরের সাহসের বহর অতোটা হবে না—আমার বাড়ীতে।

নন্দা ॥ না বাপু, বলা যায় না। আমরা কেউ রইলাম না—

নন্দলাল ॥ আমরা থাকলেই বা কী করতাম? ও ছেলেকে আমরা কেউ

দেখেছি ? কী করে বলবো দেখতে কেমন ? চিনবো কী করে ? বর্মা থেকে এর আগে কখনও কি এদেশে এসেছে ?

নন্দিতা ॥ স্যাদ্দিন ধরে এতো করে তোমাদের বলছি, বার্মাতে একটা ফটোর জন্যে লেখো।

নন্দলাল ॥ না, না, না, তাতে আনন্দ ভাবতো, তার ছেলের চেহারা দেখে তবে বুঝি তোর সঙ্গে তার বিয়েতে আমি রাজী হবো। কোটিপতি লোক—হয়তো চটেই যেতো। তাই আমি ফটো চাইনি। কিন্তু খবর নিয়ে তো জেনেছি, চেহারায় কার্তিকটি। বুঝলে সেবা, ও তুমি দেখলেই চিনবে। কিন্তু আর এতোটুকু দেরি নয়। ওঠো—ওঠো সব…

[সকলে গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছু পরে মোটর স্টার্ট দিয়া চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরে সেবা ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই কলিং বেল ঘন ঘন বাজাইতে লাগিল। এদিক ওদিক হইতে বাবুর্চি, খানসামা, বয়, দ্বারবান প্রভৃতি ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

সেবা ॥ মন দিয়ে সব শোনো,—আমার ওপর বাড়ীর ভার ছেড়ে দিয়ে ওঁরা সব আসানসোলে কী এক নেমতন্ন রাখতে গেলেন। ফিরবেন কাল দুপুরে। কিন্তু তাঁরা বাড়ী নেই বলেই যে কাজে তোমরা গাফিলতি করবে, তা' চলবেনা।

বাবুর্চি ॥ বাঃ! তা কেন করবো ?

খানসামা ॥ তাঁরা নেই,—তুমি আছো সেবাদি। যা হুকুম করবে, তাই করবো।

সেবা ॥ ঠিক আছে। রহিম! তোমার শালীর অসুখ—দেখতে যাবে বলে এক রাত্তিরের ছুটি চেয়েছিলে। ছুটি মঞ্জুর হলো। তুমি যেতে পারো। কিন্তু ফিরে আসতে হবে কাল সকাল আটটায়। কাল আমাদের হবু জামাইবাবু আসছেন। ভাল ভাল সব রান্না করতে হবে। তোমার শালীর কাছ থেকে দু' একটা নতুন রান্না শিখে এসো বরং। তোমার একঘেয়ে রান্না আর ভাল লাগে না।

বাবুর্চি ॥ জরুর।

[বাবুর্চির প্রস্থান]

সেবা ॥ বাহাদুর !

দ্বারবান ॥ বলিয়ে দিদি।

সেবা ॥ তোমাকে একটা ভারী জরুরী কাজ দিচ্ছি। বাজারে রামসীতার মেলা বসেছে। মেলাটা ভাল জমেছে কিনা দেখে এসো। হবু জামাই হয়তো দেখতে যেতে চাইবেন।

বাহাদুর ॥ জরুর, আভী যাতাহুঁ। [যাইতে গিয়া ফিরিয়া] মেলামেঁ রামলীলা হোতী হ্যায়। ক্যায়্সী হোতী হ্যায় ইস্‌কী রিপোর্ট দেনেকে লিয়ে মুঝে কাল সবেরে ওয়াপস্ আনা পড়েগা।

সেবা ॥ [গম্ভীর ভাবে] তাই ফিরবে।

[সানন্দচিত্তে বাহাদুরের প্রস্থান]

সেবা ॥ আর ভোলা, তোমাকেও একটা সাংঘাতিক কাজের ভার দিচ্ছি। হবু জামাই হয়তো এসেই দিদিমণিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে চাইবেন। কোন্ সিনেমায় কী ছবি হচ্ছে—সব জেনে শুনে এসো। যেটা ভাল, সেটা বরং তুমি নিজে দেখে এসো। আমি জানি, তুমি যেতে চাইবে না। হয়তো বলবে, তোমার মাথা ধরেছে—

খানসামা ॥ না, না, তা' কেন বলবো সেবাদি? মরতে মরতেও হুকুম তামিল আমি করবোই। না, না, সে তুমি কিছু ভেবোনা সেবাদি। আমি এখনই যাচ্ছি এই বিকেলের শো-তে। ফিরে এসে রিপোর্ট দিচ্ছি। ঠিক রিপোর্ট দিয়েছি কি না, রাতের শো-তে গিয়ে তুমি সেটা যাচাই করে নিতে পারো সেবাদি।

সেবা ॥ আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

[খানসামার প্রস্থান]

বালক-ভৃত্য ॥ আমি কি দোষ করলাম সেবাদি? সবাইকে তুমি বাইরে পাঠালে,—একা আমিই বুঝি খাঁচার পাখী হয়ে চুপটি করে বসে থাকবো?

সেবা ॥ না, না, সে কী কথা রে নীলমণি! ছুটি আজ আমাদের সবার। আমি যে আমি—আমারও।...গলা ছেড়ে গা' দেখি আমার সঙ্গে।

[সেবা গলা ছাড়িয়া গান ধরিল]

সেবা ॥ [গান]

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি।

আজ আমাদের ছুটিরে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।"

বালক-ভৃত্য ॥ সেবা-দি, তুমি এমন চেঁচিয়ে গান গাইছো! সাহেবরা জানলে তোমার আর রক্ষে নেই।

[কোনও ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সেবা পূর্ববৎ গান গাহিয়াই চলিল। গান গাহিতে গাহিতে উচ্ছ্বসিতভাবে লাফাইয়া গিয়া জানালার পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া দিল। গানটি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে বাড়ীতে একটি মোটর গাড়ী প্রবেশ করার শব্দ শোনা গেল। মোটর-হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সেবা গান শেষ করিল]

বালক-ভৃত্য ॥ সায়েবরা ফিরে এসেছে সেবা-দি—সায়েবরা ফিরে এসেছে। তুমি কী সর্বনাশ করেছো, এখনি বুঝবে। আমি পালাই—

[বালক-ভৃত্যের পলায়ন। বাহির হইতে একজন আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

আগন্তুক ॥ [বাহির হইতে] ইহাই তো শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন মহাশয়ের গৃহ?

সেবা ॥ ভেতরে আসুন।

[আগন্তুক কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেবার সহিত নমস্কার বিনিময় করিল। দেখা গেল, আগন্তুক বয়সে তরুণ, সুদর্শন ও অভিজাত পোষাক পরিহিত। রুমাল দিয়া মুখের ধুলা মুছিল]

সেবা ॥ হ্যাঁ, এইটেই শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনের গৃহ। কেন বলুন তো?

আগন্তুক ॥ দেখুন, কলিকাতা হইতে দ্বিপ্রহরের ট্রেনে আজ আমার এখানে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ট্রেন ধরিতে না পারায় আমি আমার কাকার মোটর গাড়ী লইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।

সেবা ॥ ও! আপনিই তবে—

আগন্তুক ॥ [সস্মিতহাস্যে] আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই সিঙ্গাপুরবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র নন্দন শ্রীনন্দন দাসগুপ্ত।

সেবা ॥ [উচ্ছ্বসিতভাবে] ও—আপনি! আসুন—বসুন। আপনি আজ বারোটার ট্রেনে এলেন না দেখে সবাই ভাবলেন,—আপনি কাল বারোটার ট্রেনে

আসবেন। আপনি চিঠিতেও ঐ রকম লিখেছেন। ওঁরা তাই একটু আগে চলে গেলেন আসানসোলে একটা নেমন্তন্ন রাখতে। কাল সকালে ফিরবেন।

নন্দন ॥ ওঁরা—অর্থাৎ!···শ্রীযুক্ত সেন?

সেবা ॥ শুধু শ্রীযুক্ত সেন নন, শ্রীযুক্তা সেনও বটে।

নন্দন ॥ আর তাঁদের কন্যা? শ্রীমতী নন্দিতা দেবী? তিনিও কি তবে গিয়াছেন?

সেবা ॥ তার আগে আপনি বলুন,—নন্দিতা দেবী যদি গিয়েই থাকেন, তবে আপনি কী করবেন?

নন্দন ॥ আমিও এখনি কলিকাতা রওনা হইব।—আর কী করিব?

সেবা ॥ [হাসিয়া] আর যদি তিনি না গিয়ে থাকেন?

নন্দন ॥ আনন্দে থাকিয়া যাইব। তিনি আছেন? কোথায় তিনি? [সেবাকে হাসিতে দেখিয়া] ও—আপনি! আমাকে ক্ষমা করুন নন্দিতা দেবী।

সেবা ॥ বসুন।

নন্দন ॥ কী আশ্চর্য দেখুন। আপনি নন্দিতা দেবী—আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মানা, তখন কিনা আমি ভাবিতেছিলাম—তিনি কোথায়—যাঁহাকে দেখিবার জন্য সুদূর সিঙ্গাপুর হইতে আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি। অদৃষ্টের কী পরিহাস!

সেবা ॥ [হাসিয়া] পরিহাসই বটে! আসুন—ভেতরে আসুন।

[নন্দনকে লইয়া সেবা গৃহাভ্যন্তরে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্যে বর্ণিত নন্দলাল সেনের উপবেশন-কক্ষ। পরদিন সকাল। সেবা ফুলদানিতে কতকগুলি ফুল সযত্নে সাজাইতেছে। বালক-ভৃত্য নীলমণি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে]

নীলমণি॥ এ কী সেবাদি! যে সব ফুল তোলবার হুকুম নেই, সে সব ফুলও তুমি আজ তুলেছো? দিদিমণি ফিরে এসে দেখলে আগুন হয়ে যাবেন না?

সেবা ॥ না। এ ফুলগুলো আজকের জন্যেই দিদিমণি মনে মনে জীইয়ে রেখেছিলেন।

নীলমণি ॥ সে রেখেছিলেন নিজে তুলবেন বলে। তুমি তুললে যে?

সেবা ॥ তুললাম তো—যা হয় হবে। নীলমণি, দরজা-জানালার পর্দাগুলো তুই টেনে দে।

নীলমণি ॥ কেন সেবাদি? আমার কাছে কিন্তু এই-ই ভাল লাগে,—ঘরে কেমন রোদ এসেছে।

সেবা ॥ আমাদের কাছে ভালো লাগলেই তো চলবে না। যেখানকার যা নিয়ম।

[নীলমণি পর্দাগুলি টানিয়া দিতে লাগিল]

নীলমণি ॥ আচ্ছা সেবাদি, হবু-জামাই এখনি এতো ঘুমোচ্ছে,—যখন সত্যি সত্যি জামাই হবে, তখন তবে হয়তো হবে কুম্ভকর্ণ। চায়ের জল চাপিয়ে বসে থাকতে হবে সারাদিন। সে তোমার বড়ো কম বিপদ হবে না।

সেবা ॥ তা যা বলেছিস্! দেখে এলুম, এখনো ওঠেন নি।

নীলমণি ॥ লোকে বলবে কী! আমরা তো জানি, রাতে চুরি করে বলে দিনে ঘুমোয় চোরেরা।

সেবা ॥ চুপ! এ সব বলতে নেই, নীলমণি। তুই ছুটে গিয়ে দেখে আয়তো, বাবুর্চি, খানসামারা এসে কাজে লেগে গেছে কিনা। কর্তাদেরও ফেরবার সময় হয়ে এলো।

[নীলমণির প্রস্থান। ফুলগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সেবা গাহিতে লাগিল—]

সেবা ॥ [গান] "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা"

[তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নন্দনের প্রবেশ]

নন্দন ॥ নন্দিতা! দেখ দেখি, আমার নিদ্রা-ভঙ্গের কী বিলম্ব হইল!

সেবা ॥ [হাসিয়া] নিদ্র-ভঙ্গ নয়, বল ঘুম ভাঙতে। বিলম্ব নয়,—বল দেরি।

আমরা বলি,—দেখ দেখি, ঘুম ভাঙতে কতো দেরি হলো! এটা বললে, তোমারও দাঁত ভাঙ্‌বে না,—বুঝতেও কারোর কষ্ট হবে না।

নন্দন॥ হ্যাঁ, তোমাকে আমার শিক্ষক হইতে হইবে। তবেই না আমি ইহা পারিব, নন্দিতা।

সেবা॥ শিক্ষক নয়,—বল মাস্টার।

[সেবা কলিং বেল টিপিলে খানসামা ভোলার প্রবেশ]

সেবা॥ চা।

[ভোলার প্রস্থান]

নন্দিতা॥ মাস্টার হইবে পুংলিঙ্গ,—তুমি কী হইবে নন্দিতা?

সেবা॥ ও—হ্যাঁ। আমি মাস্টারনী।

নন্দন॥ আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী। আমি পতি—তুমি পত্নী। আমি তোমার প্রিয়তম,—তুমি আমার প্রিয়তমা। আসিবার পুর্বে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া আমি শিক্ষা করিয়া—মানে, শিখিয়া আসিয়াছি, নন্দিতা। তোমার নিকটও আমি কিছু কম শিক্ষা করিলাম না গত রাত্রিতে। তুমি শুনিলে আশ্চর্যান্বিতা হইবে নন্দিতা, ইতঃপূর্বে আমি কখনও সম্পূর্ণ রাত্রি জাগ্রত থাকি নাই।

সেবা॥ এসব কথা বলতে নেই,—কাউকে বলোনা যেন।

নন্দন॥ না না, আর কাহাকেও বলিব না,—আর কাহাকেও বলিব না। বিগত রজনীর মধুর স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

সেবা॥ আমারও।

নন্দন॥ বিগত রজনীর শেষ ভাগে তুমি যেন আমাকে কী বলিতে গিয়া থামিয়া গেলে,···ক্রন্দন করিতে লাগিলে। তখন হইতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তোমার পিতামাতা আসিবার পুর্বেই আমি উহা শ্রবণ করিতে,—মানে, শুনিতে চাই! বল,—বল, প্রিয়া।

[আবেগে সেবার হাত দুইখানি ধরিল]

সেবা॥ না, না, এখন হাত ধরতে নেই। এখনি সব আসবে কিনা।

নন্দন॥ [হাত ছাড়িয়া দিয়া] তবে তুমি বল।

[খানসামা তোলা ট্রেতে করিয়া নন্দনের জন্য চা দিয়া গেল। সেবা উহা পরিবেশন করিতে লাগিল]

নন্দন ॥ চা পান করিব আমি একাকী ? তুমি ?

সেবা ॥ হাঁ, তুমি একাই চা খাবে। আমি খাবো না।

নন্দন ॥ কেন ?

সেবা ॥ আমার যা বলা হয়নি—তোমাকে আমি তা এখন বলবো। আর তা' যখন বলবো, তোমার সঙ্গে আমার চা খাওয়া আর চলবে না।

নন্দন ॥ ইহা উত্তম। রমণীগণের চা-পান আমার পিতৃদেব অনুমোদন করেন না,—আমিও না। তুমি কী বলিবে, বল প্রিয়া।

সেবা ॥ রাতের অন্ধকারে যা' বলা সহজ ছিল, দিনের আলোতে তা' বলা সহজ নয়। আমার যা' বলার, তা, এই চিঠিতে আমি লিখেছি। চা খেতে খেতে পড়।

[সেবা নন্দনকে একখানি চিঠি দিল। নন্দন উক্ত চিঠি পড়িতে শুরু করিলে সেবা তাহার অলক্ষ্যে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল]

নন্দন ॥ [চিঠি পড়িতে পড়িতে] একী! তুমি নন্দিতা নও ? তোমার নাম সেবা ? তুমি আয়া ? না, না, না, ইহা হইতে পারে না। নন্দিতা—প্রিয়া—

[সেবাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে অন্দরের দিকে ছুটিল এবং ক্ষণপরেই দেখা গেল, সেবা এ ঘরে ছুটিয়া আসিল ও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল নন্দন। নন্দন সেবাকে ধরিয়া ফেলিল]

নন্দন ॥ এ ছলনা কেন ?

[সেবা নীরব রহিল]

নন্দন ॥ নীরবে থাকিলে চলিবে না। তোমাকে বলিতেই হইবে।

সেবা ॥ আমার হাত ছাড়—কেউ হয় তো এসে পড়বে। তুমি বোসো।

[নন্দন বসিল। সেবা তাহার পার্শ্বে আর একখানি সোফায় বসিল]

নন্দন ॥ বল।

সেবা ॥ এ ষড়যন্ত্র বিধাতার—আমার নয়, আমার নয়। আমার অদৃষ্টে যে সৌভাগ্য তিনি লেখেন নি, সেই সৌভাগ্যের সব সুযোগ তিনি ঘটিয়ে

দিলেন আমার জীবনে কাল রাত্রে। তুমি এলে—আমাকে তুমি দেখলে—ভুল করে আমাকেই ভাবলে তোমার সেই মানসী। হই না কেন আমি আয়া—হই না কেন দাসী, তবু আমি মানুষ—রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার লোভ হলো। ভাবলাম এই একটা তো রাত—সারা জীবনে এই একটা রাতেই আমার কাছে এসেছে আমার রাজপুত্র—আমি 'না' বলতে পারলাম না।

নন্দন ॥ কিন্তু ইহার পরিণাম কী সেবা?…না, না, তুমি নীরব থাকিলে চলিবে না। ইহার পরিণাম?

সেবা ॥ পরিণাম একটা শূন্য—তার বেশি কিছু নয় নন্দন।

নন্দন ॥ প্রহেলিকা ছাড়। বল।

সেবা ॥ এ বাড়ী—এ ঘর—এ সংসার থেকে আমি এখনি চলে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট পরে আমার ছায়াও তোমার চোখে পড়বে না নন্দন। মনে করো, এ এক ক্ষণ-স্বপ্ন। আমি চলে গেলে আর তা তোমার মনেও পড়বে না নন্দন।

[যাইবার জন্য উঠিল]

নন্দন ॥ দাঁড়াও নারী। প্রথম প্রেমের ক্ষতচিহ্ন সারা জীবনেও যে আমার দূর হইবে না নারী। পলায়ন করিয়া তুমি বাঁচিতে পার, কিন্তু আমি?

সেবা ॥ বেশ, আমি যাব না। আমি থাকবো। আমার দুঃসাহসের এই কাহিনী—আমার এই ছলনা—তোমার হাতে অস্ত্র হয়ে শোভা পাক্‌। তার আঘাত সইবার শক্তি—কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমি পেয়েছি নন্দন—আমি পেয়েছি।

[বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া থামিবার শব্দ শোনা গেল]

সেবা ॥ ঐ যে ওঁরা এলেন। আমি চললাম আমার দৈনন্দিন কাজে। আপনাকে আর এক পেয়ালা চা দেবো?

নন্দন ॥ অবশ্য দিবে।

সেবা ॥ আনছি।

[সেবার প্রস্থান। ক্ষণপরেই নন্দলাল, নন্দা ও নন্দিতার প্রবেশ]

নন্দলাল ॥ বাইরে গাড়ী দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি নিশ্চয়ই নন্দন?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

[নন্দলালকে প্রণাম করিয়া উঠিল]

নন্দলাল ॥ ইনি আমার স্ত্রী।

[নন্দন নন্দাদেবীকে প্রণাম করিল]

নন্দলাল ॥ আমার মেয়ে নন্দিতা।

[নন্দন ও নন্দিতা নমস্কার বিনিময় করিল]

নন্দলাল ॥ বোসো।

[সকলে বসিল]

নন্দলাল ॥ সব কুশল তো ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ কলকাতা থেকে মোটরে চলে এসেছো ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ ভালো—ভালো। 'এড্‌ভেঞ্চার্' আমিও ভালবাসতাম বয়সকালে। তা' কখন এলে ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে, গতকল্য অপরাহ্নে।

[সকলে চমকিয়া উঠিল]

নন্দা ॥ কাল !

নন্দন ॥ আজ্ঞে—কাল।

নন্দা ॥ বল কী ! কাল বিকেল গেছে—কাল রাত গেছে—আজ সকাল গেছে। আমরা ছিলাম না—না জানি' তোমার কতো অসুবিধা হয়েছে বাবা। আয়া—আয়া—

[সেবা চারিজনের উপযোগী চা একটি ট্রেতে করিয়া লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

নন্দা ॥ সাহেবকে খেতে-টেতে দিয়েছ তো ? না, বাবুর্চিখানায় গল্পগুজবেই মেতে ছিলে ?

নন্দন ॥ না, না, উনি আমার আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি করেন নাই।

নন্দিতা ॥ উনি আবার কে মা ?

নন্দা ॥ মেয়েটি নন্দিতার আয়া।

নন্দন ॥ আমি জানি। কিন্তু আয়া হইলেও আমি উঁহাকে শ্রদ্ধা করি

[পিতা, মাতা ও কন্যা—পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি। হঠাৎ পিতা বলিয়া উঠিলেন,—]

নন্দলাল ॥ বটেই তো! বটেই তো! চা দাও সেবা।

[কাপে চা ঢালিয়া সেবা কাপটি নন্দনকে দিতে গেল। নন্দন উহা দুই হাতে আগ্রহে লইতে গেল। আবেগাতিশয্যে কাপটি তাহার হাত হইতে মেঝেতে সশব্দে পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল]

নন্দিতা ॥ [চীৎকার করিয়া সেবার উদ্দেশ্যে] 'ইডিয়ট্' !

নন্দা ॥ আক্কেল দেখেছো!

নন্দন ॥ না, না, উঁহার কোনও দোষ নাই। ভুল আমারই। দোষ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহার জন্যও দায়ী আমি।

[সেবা কাপের ভগ্নাংশগুলি কুড়াইতে গেল। নন্দন তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। পিতা, মাতা ও কন্যা পরস্পর মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল]

[মন্দিরা, আশ্বিন, ১৩৬১]

ভূমিকম্প

চ্যাটার্জি ॥ আসুন, এই ঘরে আসুন। এই ঘরেই আপনি মিসেস্ চ্যাটার্জিকে পড়াবেন। বসুন, আপনি বসুন। কী নাম যেন আপনার বললেন?

ব্যানার্জি ॥ বিষাণ ব্যানার্জি।

চ্যাটার্জি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষাণ ব্যানার্জি। আমার ওয়াইফ., মানে মিসেস চ্যাটার্জি বলেছেন,—এক সময়ে নাকি আপনার সঙ্গেই ওঁ'র বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কী কপাল দেখুন! আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাড়িটা খুঁজে বের করতে আশা করি কষ্ট হয়নি বিষাণবাবু?

ব্যানার্জি ॥ না। কিছুমাত্র না। আপনার চিঠিতে বাড়ির নম্বর দেওয়া ছিল। আর তা ছাড়া. আপনার নাম বলতেই দেখলুম, আপনাকে এ পাড়ার সবাই চেনে।

চ্যাটার্জি ॥ আমাকে চিনুক আর না চিনুক মশায়, বাড়িটা আমার সবাই চেনে। এতো বড় বাড়ি আর এতো সুন্দর বাড়ি এ মুলুকে আর নাকি একটিও নেই। এ বাড়ির নামটা জেনেছেন তো?

ব্যানার্জি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। "বৈজয়ন্তী"।

চ্যাটার্জি ॥ ওই জয়ন্তীর নাম থেকেই বৈজয়ন্তী নাম দিয়েছি। জয়ন্তী এতে ভারী খুশী। আপনি জানেন তো জয়ন্তীকে?

ব্যানার্জি ॥ হ্যাঁ, এক সময়ে জানতুম বৈকি, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

চ্যাটার্জি ॥ তা দেখবেন, কিছু বদলায়নি। অতো গরীবের মেয়ে এতো বড়লোকের ঘরে পড়েও আজ পর্যন্ত বড়মানুষি চাল-চলন ধরতে পারলেনা। কিন্তু

তা বলে ওর ওপর রাগ করতে পারি না। আমি বলেছিলুম, বিলেত-ফেরত কোন প্রফেসরকে তোমার মাস্টার রেখে দিই, জয়ন্তী। রাজী হল না। কোত্থেকে মশায় আপনার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বের করে আপনাকেই ধরে নিয়ে এলো। তা' আপনি পারবেন ওকে পড়াতে? আপনার বিদ্যার দৌড় তো দেখলুম বি এ, বি টি। এতোকাল পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করেছেন। শহরের এই সব আদব-কায়দা,—মানে এই সব জিনিসগুলোই ও একেবারে জানে না—মানে ইংরিজিটাই আপনি একটু বেশি জোর দেবেন—বুঝেছেন স্যার?

ব্যানার্জি॥ দেখা যাক্।

চ্যাটার্জি॥ আপনার শোবার ঘর-টর—ওসব জয়ন্তীই দেখিয়ে দেবে। মাইনে তিনশো টাকা—সে ঠিকই আছে। আগাম কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন—জয়ন্তীকেও বলতে পারেন। কিন্তু শুধু গাল-গল্প না করে পড়াবেন—বিশেষ করে ওই ইংরিজিটা। আচ্ছা আসি। আমার আবার অফিসের তাড়া আছে। আমি জয়ন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আরে আরে, মেঘ না চাইতেই জল। এই যে জয়ন্তী এসে গেছে। [জয়ন্তীর প্রবেশ] জয়ন্তী, এই নাও তোমার মাস্টার—বিষাণ ব্যানার্জি। আমার যা বলবার তা ওঁকে সব বলেছি। এইবার তোমার পড়াশোনার সব ব্যবস্থা করে নাও। অফিস থেকে ফিরতে আমার রাত হবে। আর হ্যাঁ, লাঞ্চও আজ আমি বাইরে খাচ্ছি। চিয়ারিও!

[প্রস্থান]

জয়ন্তী॥ অবাক হয়ে কী দেখছো? বসো বিষাণদা।

বিষাণ॥ বসছি।

[বিষাণ বসিল। জয়ন্তীও তাহার সামনে একটি সোফায় বসিল]

বিষাণ॥ আমাকে নিয়ে তোমার আবার এ খেলা কেন বলতে পারো, জয়ন্তী?

জয়ন্তী॥ এর মধ্যে খেলাটা আবার কি দেখলে বিষাণদা? আমার মাস্টার দরকার, তোমার চাকরি দরকার,—যোগাযোগ হবে না?

বিষাণ॥ অক্সফোর্ডের একজন এম এও তো তোমার মাস্টার হতে পারতেন, জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ কী রকম মাস্টার আমার চাই, সেটা আমারই বোঝবার কথা, বিষাণদা।

বিষাণ ॥ কিন্তু একজন বি এ বি টির মাইনে তিনশো টাকা কেন হচ্ছে, সেটা কি আমার বোঝবার কথা নয়, জয়ন্তী ? এর মানে কী ?

জয়ন্তী ॥ মাইনেটা কি কম মনে হচ্ছে বিষাণদা ?

বিষাণ ॥ না, বড্ড বেশি মনে হচ্ছে, এবং কেন হচ্ছে সেইটেই আমি বুঝতে চাই।

জয়ন্তী ॥ তোমার মাইনে ওখানে কতো ছিল, বিষাণদা ?

বিষাণ ॥ সে সামান্যই ছিল।

জয়ন্তী ॥ তাঁরা হয়ত তোমার মূল্য বোঝেননি। কিন্তু তাই বলে আমি এ কথাও বলবো না যে, আমিই তোমার মূল্য বুঝেছি কিংবা মূল্য দিচ্ছি। কিন্তু আর এ সব কথাই বা কেন, বিষাণদা ? তুমি এ চাকরি নিয়েছো—চাকরিতে যোগ দিয়েছো।

[ইলেকট্রিক বেল টিপিয়া জয়ন্তী বয়-কে ডাকিল]

চা খাবে, না কফি ?

বিষাণ ॥ এটা আমার চা-কফি খাওয়ার সময় নয়।

[বয়ের প্রবেশ]

জয়ন্তী ॥ বয়, দু' পেয়ালা কফি।

[বয়ের প্রস্থান]

বিষাণ ॥ তোমার স্বামী বলছিলেন, তুমি বদলাওনি। তিনি ঠিকই বলেছেন। তোমার স্বভাব এতোটুকুও বদলায়নি। বদলেছে তোমার চেহারা। তুমি আরো সুন্দর হয়েছো।

জয়ন্তী ॥ আমি যে সুন্দরী, একথা তোমার মুখে আজ এই প্রথম শুনলুম, বিষাণদা। তুমি আমাকে মনে মনে ভালোবাসতে—আমি জানতুম। কিন্তু মুখ ফুটে তা তুমি একদিনও আমায় বলোনি।

বিষাণ ॥ তোমার স্বামী বলে গেলেন, গাল-গল্প না করে পড়াশোনা করতে।

তোমার পড়াশোনার জন্তেই আমি এসেছি। একশো টাকা মাইনে পেতুম। তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে আমায় তোমরা এনেছো। তিনগুণ বেশি খাটতে আমি এসেছি—পড়াতে, তোমার গল্প শুনতে নয়।

[বয় কফির ট্রে আনিয়া দুইজনের সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল]

জয়ন্তী ॥ ছাত্রীকে ভালো করে বুঝতে হবে, তবে তো তুমি তাকে পড়াবে।

বিষাণ ॥ তোমাকে আমার বুঝতে এতটুকু বাকি নেই, জয়ন্তী !

জয়ন্তী ॥ এতদিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। আজ আমি কী,—কী তুমি বুঝেছো ?

বিষাণ ॥ বুঝেছি—আজও আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, জয়ন্তী।

জয়ন্তী ॥ তুমি আমাকে ছাই বুঝেছো। তুমি না খেলে আমি খেতে পারি ? এই তুমি আমাকে বুঝেছো ?

বিষাণ ॥ খাচ্ছি।

জয়ন্তী ॥ [হাসিয়া] হ্যাঁ, তবে খানিকটা বুঝেছো। কিন্তু আর কি বুঝেছো বলো দেখি শুনি।

বিষাণ ॥ বুঝেছি, এ বিয়েতে তুমি সুখী হওনি জয়ন্তী।

জয়ন্তী ॥ বল—

বিষাণ ॥ তোমার মনের এই জ্বালা আর তুমি বইতে পারছো না, তাই তুমি আমাকে টেনে এনেছো এখানে—আমাকে সব বলে হালকা হতে।

জয়ন্তী ॥ মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলে যাচ্ছো, বিষাণদা। আচ্ছা, আজ থাক্। চল তোমার থাকবার ঘর দেখিয়ে দিই। মেসোমশায় ভালো আছেন ? আচ্ছা তুমি বিয়ে করলে না কেন, বিষাণদা ?

বিষাণ ॥ যার ভাত জোটে না, সে কেন বিয়ে করেনি—এ প্রশ্ন এক শুধু সেই করতে পারে, আজ যার ভাতের অভাব নেই···দুহাতে ভাত ছড়াচ্ছে।

জয়ন্তী ॥ ভাত তো আমারও জুটতো না একদিন, বিষাণদা। বাড়িসুদ্ধ

লোক পর পর ক'দিন না খেয়ে আছে দেখে একদিন সন্ধ্যারাতে নিজের পাড়া থেকে চলে যাই আর এক পাড়ায়,—যে পাড়ায় আমাকে কারুর চেনবার কথা নয়। পথের এক কোণে ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়েছিলুম। শুধু দাঁড়িয়েছিলুম বললে ঠিক বলা হবে না। ভঙ্গীটাই ছিল এমন, যেন আমি বেশ-একটু বিপন্ন এবং আমার কিছু বলবার আছে।—মানে আমার চালচলনটা বেশ একটু সন্দেহজনক···বেশ একটু কৌতূহল-উদ্দীপক হয়েই দাঁড়িয়েছিলুম।

বিষাণ॥ তোমার রূপ আছে—বুদ্ধি আছে—অভিনয় করতে তুমি জানো। তোমার পক্ষে এসব এতটুকু অসম্ভব নয়।

জয়ন্তী॥ সেদিন আমার মনের যা অবস্থা, ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। দরকার ছিল আমার টাকার। "শুনুন আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে"—আড়ালে ডেকে নিয়ে বললুম, আমাদের ভাত জুটছে না। আশ্চর্য, যাকেই বললুম, কেউ আমাকে বিমুখ করলে না।

বিষাণ॥ এক রাত্রে কতো রোজগার হল?

জয়ন্তী॥ চার আনা।

বিষাণ॥ কী বলছো তুমি জয়ন্তী! তোমার চেহারার এতো বড় অপমান—এও আমায় শুনতে হল!

জয়ন্তী॥ না, বিষাণদা। অপমান করবার সুযোগ দিইনি বলেই চার আনা। বাড়ির ঠিকানা দিলে কিম্বা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলে খুব কম করে চল্লিশটে টাকা নিয়ে সেই রাতে ঘরে ফিরতে পারতুম—আশা করি এটা তুমি বিশ্বাস করবে, বিষাণদা। একটি লোকই পেয়েছিলুম, যে আমার কথা শুনে কোনো প্রশ্ন না করে পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল—পিছু ফিরে একটিবার চাইলে না এবং শুনে আশ্চর্য হবে, তার জামা-কাপড় ছিল খুবই ময়লা আর হাতে ছিল বাজারের থলি। মানে, সাহায্য করবার মতো লোক একেবারেই নয়,—সাহায্য পাবার যোগ্যতাই যার বেশি।

বিষাণ॥ সাহায্য নিতে এই রকম লোকই তুমি বেছে নিলে জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ তখন রাত দশটা বাজে। অপমান না করে সাহায্য করতে পারে, দান করতে পারে—কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করেও যখন এমন লোক মিললো না, তখন মনে পড়লো তোমার কথা। খুঁজতে লাগলুম, তোমার সমগোত্র লোক—মানে, গরীব লোক—আর, তখন আর আমার অপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। ছোট-ভাইবোনগুলো আমার পথ চেয়ে বসেছিল কি না!

বিষাণ ॥ তুমি এটা অন্যায় বলছো, জয়ন্তী। অপমান না করে বড়লোকও যে উদার হয়, গরিবের মেয়ের দুঃখে-দুঃখিত হয়,—গরিবের মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, তাকে রাজরানীর সম্মান দিতে পারে, তার প্রমাণ কি তোমার জীবনে একেবারেই নেই, জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ [হাসিয়া] না, নেই।

বিষাণ ॥ তুমি কি মিস্টার চ্যাটার্জিকে অযথা অপমান করছো না জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ চ্যাটার্জি সাহেবই আমাকে অপমান করেছেন। পেটের জ্বালায় সে অপমান আমি মাথা পেতে নিয়েছি, ইচ্ছে করে—খুশী হয়ে—এতোটুকু অনুতাপ না ক'রে।

বিষাণ ॥ অপমানের রকমটা জানতে পারলে তবে বুঝতে পারি, জ্বালাটা তোমার কোথায়।

জয়ন্তী ॥ বাড়ি ফিরতে আমার রাত হয় দেখে পাড়ার লোকেরা আমাকে যে আখ্যা দিতে লাগলো, মা সেটা সইতে পারলেন না। বাবা আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না বিষাণদা, বাবা খুব অন্যায় করেছিলেন।

বিষাণ ॥ আমিও তো তাই-ই করতুম।

জয়ন্তী ॥ কেন করবে না? নিশ্চয়ই করবে। মেয়েদের চরিত্রে কলঙ্ক—কেউ সইতে পারে না। কিন্তু বিষাণদা, তার দুদিন পরে মা যখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন—নিছক খেতে না পেয়ে আর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে না পেয়ে, সেটাও তো সইবার নয়।

বিষাণ ॥ ঘটনাটা আমরা যখন শুনলুম, তখন আমরা 'হায় হায়' করেছি।

জয়ন্তী ॥ আমি করি নি। মিস্টার চ্যাটার্জির হামি গাড়িটা বস্তি-উন্নয়নের অজুহাতে আমাদের পাড়ায় প্রায়ই ঘোরাঘুরি করতো। মিস্টার চ্যাটার্জিকে চিনতে আমার বাকি ছিলো না। সমাজ-সেবার নামে আমার সেবা করতে চাইলে আমি বললুম,—আপত্তি নেই, তবে সেটা পাকাপাকিভাবে করতে হবে। কী ভেবে তিনি রাজী হলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিষাণ ॥ এ বিয়ের তবে এই ইতিহাস?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ, বিষাণদা। বাবা আর ভাইবোনেরা—এমন কি অসহায় পাড়া-প্রতিবেশীরাও দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। শুধু দুঃখ এই, মা আজ নেই।

বিষাণ ॥ চ্যাটার্জি সাহেব তোমার সম্মানই রেখেছেন। অপমান করেছেন বললে অবিচার করা হবে না কি?

জয়ন্তী ॥ আমার অপমানটা তুমি বুঝবে না, বিষাণদা। সেটা বুঝেছি আমি। ভালবেসে আমরা কেউ কাউকে বিয়ে করি নি। তাঁর ছিল রূপের মোহ। আমার ছিল টাকার প্রয়োজন। তিনি চেয়েছিলেন এই বুড়ো বয়সে এমন একজন 'মিসেস্'—যাকে সভা-সমিতিতে, পার্টিতে, ক্লাবে সগর্বে পাশে রেখে আর সকলের চোখ ঝলসে দিতে পারেন। ভালবেসে তিনি আমাকে বরণ করেন নি, টাকা দিয়ে তিনি আমাকে কিনেছেন। আমি তাঁর বধূ নই······আমি তাঁর বিবাহিতা রক্ষিতা।

বিষাণ ॥ আমি বলবো তিনি তোমাকে যতো না অপমান করেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি অপমান করেছো তুমি—তোমাকে। পেটের ক্ষুধা মেটানোই কি জগতে সবচেয়ে বড় কথা?

জয়ন্তী ॥ নয়?

বিষাণ ॥ আচ্ছা, মানছি হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্যে কি চুরি করতে হবে? ডাকাতি করতে হবে? আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হবে? দেহ বিক্রি করতে হবে?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ, হবে। সব দেশে, সব যুগে তা-ই হয়েছে, তা-ই হয়।

বিষাণ॥ না, কখনো না। সভ্য-সমাজে তা হয় না।

জয়ন্তী॥ অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখানে যখন তা হচ্ছে, তখন তোমার-আমার সমাজ আজ আর সভ্য-সমাজ নয়। সভ্যতার মুখোস খুলে ফেল, বিষাণদা। যে-সমাজে এত দুঃখ, এত দারিদ্র, অনাহারে এতো মৃত্যু,—সেখানে সভ্যতার আইন, আচার-বিধি চলবে না, চলে না। জঙ্গলের আইনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখানকার আইন।

বিষাণ॥ খুব বড়ো বড়ো কথা তোমার মুখে শুনছি আজ। তোমাকে আমি কী শেখাবো বুঝছি না। আমাকে যে কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে, তাও বুঝছি না!

জয়ন্তী॥ তোমাকে আমি ভালোবাসি বিষাণদা। পেটের ক্ষুধা মিটেছে, কিন্তু মনের ক্ষুধা তো মেটে নি। তাই তোমাকে চাই······তাই তোমাকে এনেছি। তুমি আমি হাত ধরাধরি করে দেশেব কাজ কবব, এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। এতকাল তা হয় নি। এখন হবে।

বিষাণ॥ কিন্তু—

জয়ন্তী॥ এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই। আমি জানি, তুমিও আমাকে ভালোবাসো বিষাণদা।

বিষাণ॥ কিন্তু—

জয়ন্তী॥ যতো 'কিন্তু'ই বল, যেটা সত্যি, সেটা আর মিথ্যে হবে না, বিষাণদা। ভালোবাসার ব্যাপারটা মেয়েরা যেমন বোঝে, তোমরা তেমন বোঝো না। কে আমাকে ভালোবাসে—সেটা বুঝতে আমার এতোটুকু ভুল হবে না।

বিষাণ॥ কিন্তু তোমার এই বিয়ের পর—

জয়ন্তী॥ এই অসভ্য সমাজে—জঙ্গলের আইনে কোনো দোষ নেই···কোনো পাপ নেই।

[নেপথ্যে মিস্টার চ্যাটার্জির গলা শোনা গেল—"বয়, বয়"]

জয়ন্তী॥ এ কী? সাহেব এরি মধ্যে ফিরে এলো যে?

বিষাণ ॥ তখন থেকে আমরা এখানে বসে গল্প করছি দেখলে খুশী হবেন না,

জয়ন্তী। অন্তত একখানা পড়ার বই-টই—

জয়ন্তী ॥ না, না, কিছু দরকার নেই। এ সমাজে সব চলে।

[দোতলা হইতে একতলার সিঁড়িপথে কোন দুই লোক যেন উপর হইতে নিচে ছুটিয়া নামিতেছে এরূপ পদশব্দ শোনা গেল। জয়ন্তী ও বিষাণ চমকিয়া উঠিল]

বিষাণ ॥ ব্যাপার কী ?

জয়ন্তী ॥ তাইতো।

[সেই মুহূর্তেই আলুলায়িত-কুন্তলা, বিপর্যস্তবসনা যে সুন্দরী যুবতীটি এই কক্ষে প্রবেশ করিল সে এই বাড়িরই আয়া। নাম রেবা। তাহার চেহারায় যৌবনের উগ্রতা এবং উচ্ছ্বলতা আছে]

রেবা ॥ দেখুন তো, এসব কি ?

[কিন্তু সেখানে অপরিচিত এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ যথাসম্ভব সংযত হইল]

জয়ন্তী ॥ কে—সাহেব ?

রেবা ॥ হ্যাঁ। অফিসের ড্রয়ারের চাবি ফেলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ওপরে গিয়ে দেখেন, আপনি নেই। তাই আমাকে—

জয়ন্তী ॥ জ্বালাতন করছিলেন। তা চাবিটা কোথায় ?

রেবা ॥ জানি না, দেখছি। আপনি আসুন।

[রেবা ছুটিয়া চলিয়া গেল]

বিষাণ ॥ একটা যেন ঝড় বয়ে গেল। ব্যাপার কি ?

জয়ন্তী ॥ এই সমাজের আর একটা কাহিনী। মেয়েটি ছিল অনাথা। সাহেবের সেই সমাজ-সেবার ব্রত। চোখে পড়ে ; কিন্তু দেবার মতো পরিচয় নেই ব'লে আয়ার চাকরি দিয়ে সাহেব একেও দয়া করেছেন। কিন্তু সে দয়াটা মাঝে মাঝে এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, মেয়েটা সইতে পারে না।

বিষাণ ॥ কী ভীষণ !

[মিস্টার চ্যাটার্জির প্রবেশ]

চ্যাটার্জি ॥ [জয়ন্তীকে] সেই থেকে তুমি এখানে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী ॥ কে বললে ?

চ্যাটার্জি ॥ অফিসের ড্রয়ারের চাবিটা ভুলে ফেলে গেছলুম। নিতে এসে তোমার আয়ার কাছে শুনি, সেই থেকে তুমি এখানে। তা বেশ, তা বেশ। পড়াশোনার কথাই হচ্ছিল বুঝি ?

জয়ন্তী ॥ তা ছাড়া আর কি ? কিন্তু চাবি তুমি পেয়েছো ?

চ্যাটার্জি ॥ তোমার আয়াকে খুঁজে আনতে বলেছি।

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ। ও তোমার সব জানে—আমার চেয়েও বেশি জানে। প্রাইভেট সেক্রেটারি বলা যায়।

[চাবির একটি চেন হাতে লইয়া রেবার পুনঃ প্রবেশ]

রেবা ॥ [চাবির চেনটি সাহেবকে দিয়া] নিন্। আপনি যেখানে বলেছিলেন, সেখানে ছিল না। অনেক খুঁজে তবে বের করেছি।

জয়ন্তী ॥ [চ্যাটার্জির প্রতি সকৌতুকে] বলিনি !

চ্যাটার্জি ॥ [আয়াকে] তোমার কর্ত্রী তোমার প্রশংসা করছিলেন রেবা। বলছিলেন—তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি।

রেবা ॥ [জয়ন্তীকে] কেন যে আপনি এমনভাবে আমাকে লজ্জা দেন !

জয়ন্তী ॥ লজ্জার কথা তো নয়। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] ভূমিকম্প ! ভূমিকম্প !!

[সকলেই ভীষণ চমকিয়া উঠিল]

চ্যাটার্জি ॥ ভূমিকম্প ? কই না !

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ। ওই আবার—সর্বনাশ হলো—সর্বনাশ হলো—হ্যাঁ, ওই—ওই —শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়—শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়—

[জয়ন্তী নিজেই টিপয়, সোফা, ইত্যাদি ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল]

চ্যাটার্জি ॥ য়্যাঁ ! এসো, এসো—

[তাড়াতাড়ি রেবার হাতটি চাপিয়া ধরিল]

রেখা ॥ না, না, ছাড়ুন।

চ্যাটার্জি ॥ না, না, সব বাইরে এসো—বাইরে এসো—

[ভীত ত্রস্ত হইয়া রেখাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল]

বিষাণ ॥ কিন্তু কই?

[জয়ন্তী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

জয়ন্তী ॥ ভূমিকম্প না হাতি! ভূমিকম্পের ভয় দেখিয়ে তোমায় দেখালুম, আমরা কোথায়। কে-ই বা স্বামী, কে-ই বা স্ত্রী! এ সমাজে কোনো দোষ নেই —কোনো পাপ নেই।

[শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬০]

উপচার

এক পল্লীগ্রামের প্রান্তে "তারা" ভৈরবীর "পঞ্চবটী"। পঞ্চবটীতে লতাপাতা-ঘেরা একখানি মাটির ঘর। তাহার সম্মুখস্থ দূর্বাশ্যাম প্রাঙ্গণে যূথী-বেলী-শেফালী-মাধবীর কুঞ্জ। শারদলক্ষ্মীর আবির্ভাবে আকাশ বাতাস রূপে রসে গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তারা ভৈরবীর বোধ-করি-বা যিনি ভৈরব, তিনি জীবিত কি মৃত সে বিষয়ে প্রথম দর্শনে মতভেদ হইতে পারে। তারা তাহাকে ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু তাহার নাম অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তারানাথ। তারা হইতে তারানাথ, না তারানাথ হইতে তারা, সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আমরা এইটুকু ঘোষণা করিতেছি যে ভৈরবীর নাম তারা, এবং ভৈরবের নাম তারানাথ।

তারানাথের বয়স খুব বেশি হইবে না, কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হইবে কয়েকখানি হাড় শ্মশান হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ তারা ভৈরবীই বা একটি চামড়া দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি স্মরণ করিলে লেখকের লেখনী আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় না।

অথচ এই তারানাথের প্রতি তারার যত্ন স্নেহ, অথবা ধরুন, প্রেম বা প্রীতি, অসাধারণ। তারানাথকে তারা ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু তারাকে তারানাথ শালী ভিন্ন অন্য নামে সম্ভাষণ করিয়াছে শোনা যায় নাই। অবশ্য শালী সম্বোধনটি রাগের কি অনুরাগের সম্বোধন, সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে।

সকলের কথাই বলা হইল, এইবার তারার কথাটি ভালো করিয়া বলি। তারা যুবতী। রং উজ্জ্বল শ্যাম। লোকে বলে দেখিতে বেশ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই ভৈরব এবং ভৈরবী অতি অল্পদিন হইল এই পল্লীগ্রামে ঐ পরিত্যক্ত পঞ্চবটীতে আশ্রয় লইয়াছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোনও রোমাঞ্চকর রোমান্স এখনো তৈরি হয় নাই।

আগামী কল্য মহাসপ্তমী। গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে মহাসমারোহে এইবার প্রথম দুর্গোৎসব হইবে। জমিদারের নাম কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স ত্রিশ। হঠাৎ দুর্গোৎসবে তাঁহার সুমতি হইল কেন, তাঁহার পারিষদগণকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে জানায় "ঐ তারা ভৈরবী—"…বোধ করি গ্রামে ভৈরব-ভৈরবীর আবির্ভাবই জমিদার মহাশয়কে দুর্গোৎসবের অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যারাত্রি। কুটিরের বারান্দায় ভৈরব তারানাথ একখানা কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া ভৈরবী তারা বাহিরে আসিল, এবং হাতের

প্রদীপ বারান্দার একটি কাঠের দীপাধারে রাখিয়া ধীরে ধীরে তারানাথের পায়ের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া ডাক দিল "ভৈরব !"]

তারা ॥ ভৈরব !

তারানাথ ॥ [এই ডাক শুনিয়া তাহার রোগযন্ত্রণা যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। নানাবিধ যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ নানা তালে এবং নানা ছন্দে কালো কম্বলের তলায় জন্মগ্রহণ করিল]

তারা ॥ সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে শোবে চল—

তারানাথ ॥ [যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দরাশি বাড়িয়াই চলিল]

তারা ॥ বাইরে বড় হিম। এখানে পড়ে থাকলে কাসিটা আরো বাড়বে।

তারানাথ ॥ [কাসিটি ঘুমাইয়াই ছিল। এইবার তাহার ঘুম ভাঙিল। ঘুম ভাঙিল বলিলে ঠিক বলা হইল না, লাফাইয়া উঠিল, বীরবিক্রমে লাফাইয়া উঠিল] থক-থক-থক।

তারা ॥ ভেতরে চল, আমি গলায় পুরোণো ঘি মালিস করে দিচ্ছি, কাসি এখনি তরল হয়ে যাবে—

তারানাথ ॥ [কাসিতে কাসিতে তাহারি ফাঁকে] গরু মেরে আর জুতো দানে কাজ নেই। কাসির কথা তোকে তুলতে বলেছিল কে রে শালী ?··· এতক্ষণ তো ওটা ভুলেই ছিলুম।···যেই মনে করিয়ে দিলি, ওরে হারামজাদী, —থক-থক-থক—[কফ ফেলিবার জন্য উঠিয়া বসিয়া কম্বলের তলা হইতে মুখ বাহির করিল]

তারা ॥ [নতজানু হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার ভৈরবের পায়ে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভৈরবকে ধরিয়া কহিল] এইবার ওঠ—···চল···ঘরে চল—

তারানাথ ॥ ওষুধ এনেছিস ?

তারা ॥ ওষুধের কথা তো বল নি।

তারানাথ ॥ [ভেঙাইয়া] ওষুধের কথা তো বল নি !···ওরে শালী ! ওরে হারামজাদী—থক্-থক্-থক্—

তারা ॥ [অবিচলিত ভাবে] তাহলে হয়ত আমি শুনি নি—

তারানাথ ॥ তাতো শুনবিই নে ; তা শুনবি কেন রে শালী ? বিষের কথা বললে নাচতে নাচতে গিয়ে বিষ এনে দিতিস ! তা, দেনা তাই এনে দে মা, আমিও বাঁচি, তুইও বাঁচিস ! আরে শালী হারামজাদী, মতলবখানা তোর কি, তা কি এই তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব তারানাথ ঠাকুর বোঝে না ?

তারা ॥ কেন অনর্থক গালমন্দ কর। কি চাই, বল না—!

তারানাথ ॥ একটু "কারণ" যোগাড় করতে বলেছিলুম, যায় নি কানে ?

তারা ॥ শুনেছিলুম, কিন্তু···

তারানাথ ॥ কিন্তু সেটা নিজেরই পেটেই গেছে, এই তো ?

তারা ॥ [ধীরভাবে] আমি জোগাড় করতে পারি নি। হাতে টাকা ছিল না।

তারানাথ ॥ কিন্তু যাকে ঐ পটল-চেরা চোখে মজিয়েছ, সেই জমিদার বাবুটি তো ছিলেন—

তারা ॥ কাকে দেখে কে যে মজেছে, সে কথা ঘাটের মড়ার মুখে না হয় নাই শুনলুম !

তারানাথ ॥ তবে রে হারামজাদী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, [প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই] খক···খক···খক···[প্রবল কাসি। একটু শান্ত হইলে] খুব বেঁচে গেলি শালী !

তারা ॥ "কারণে" তোমার আরো অপকার করে দেখেছি—

তারানাথ ॥ দেখ শালী, চটাস নি কিন্তু—যদি ভালো চাস···

তারা ॥ আর ভালো আমি চাই নে। তুমি ভালো হলেই রক্ষে—

তারানাথ ॥ তাই বা কই চাস ?···তাই যদি চাইতিস, তবে "কারণ" পেলুম না কেন ?

তারা ॥ জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না। কাল তাঁর বাড়ীতে পুজো। আজ সারাদিন তিনি ঘরের বের হননি, পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। একঘর লোকের মাঝে আমি যেতে পারলুম না, দেউড়ি থেকে খবর দিয়ে ফিরে এলুম—

তারানাথ ॥ তবে না পুজো হবে না শুনেছিলুম ?

তারা ॥ গিন্নীর খুব ইচ্ছে, পুজো হয়। কর্তা ছিলেন বেমনা। সেদিন আমি গিন্নির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম···

তারানাথ ॥ বটে। আজকাল অন্দরেও যাতায়াত হচ্ছে !

তারা ॥ কর্তার ছেলের খুব অসুখ। গিন্নি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেখতে। গিন্নি বললেন পুজো হলেই ছেলের ব্যামো ভালো হবে। এমন সময় কর্তাও হঠাৎ এসে পড়লেন—

তারানাথ ॥ সে আমি বুঝি। হঠাৎ নয়, হঠাৎ নয় রে শালী, হঠাৎ নয়—

তারা ॥ সে তুমি যা-ই বোঝ ! কর্তা আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও বললুম "পুজো করুন, খোকা ভালো হয়ে যাবে"—কি ভেবে যে আমি পুজো করতে বললুম, জানিনে, কিন্তু, কেন শুধু এই আশাই মনে মনে জাগছে, শুধু খোকাই ভালো হবে না, ভালো হবে সবাই···সকলে···কেউ বাদ যাবে না !

তারানাথ ॥ হাঁ, ভালো হবে, অন্ততঃ আমি ভালো হব, যদি জমিদার মশাই—

[কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল]

এই দুর্গোৎসবে, বেশি নয়, এক কলস "কারণ" ভক্তিভরে এই পঞ্চবটী পীঠে নিবেদন করেন। শোন শালী, না-না, ওরে ভৈরবী, শোন—তুই গিয়ে বলনা কেন, মাটির দুর্গোপ্রতিমা-পুজোর চাইতে এই পঞ্চবটীর পীঠস্থানে একটা কারণ-মহোৎসব করলেও নিতান্ত কম পুণ্যি হবে না।

তারা ॥ তোমার কাসি দেখচি বেশ সেরে গেছে !

তারানাথ ॥ এই আবার—থক্-থক্—আবার মনে করিয়ে দিলে—থক্ !

[হাঁপাইতে লাগিল]

তারা ॥ দোহাই তোমার, তুমি ঘরে চল, ঘরে গিয়ে একটু দুধ খেয়ে ঘুমুতে চেষ্টা কর—

তারানাথ ॥ ঘুম ? এখনি ঘুম কেনরে শালী ?···শোন ডাইনি, ঘুমুলেও তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব স-ব দেখতে পায়। আমি ঘুমুব, আর তাল-বেতাল

এসে এখানে স্ফূর্তি করবেন, সেটি আমি সইবো না, রক্ত খাব, হাড় খাব, মাস খাব, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো, বলিস তাদের,—হাঁ।

তারা॥ কিন্তু তা-ই বলে দুধ খেতেও দোষ!

তারানাথ॥ দুধ পেলি কোথা?

তারা॥ জমিদার-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাল পুজো, আমায় নেমন্তন্ন করেছেন। যে দাসী এসেছিল, ব্যগ্রতা সে দেখালে খুব-ই। আমি যাব,… যাব না?

তারানাথ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইল] আমায় ছেড়ে!

তারা॥ আমি তোমার পথ্যি দিয়ে, তবে যাবো, দেবীর মহাস্নান শেষ হলেই আবার আসবো, তোমায় দেখতে; তারপর তুমি বললে আবার যাবো। আমি কায়মনপ্রাণ দিয়ে দেবীর কাছে তোমার আরোগ্য চাইব।…তুমি ভালো হবে, নিশ্চয় ভালো হবে, জমিদারের খোকাও ভালো হবে—

তারানাথ॥ তোকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি নেরে শালী।…তুই কোনো খানে গেলে আমার মনে হয় আমার দম বুঝি আটকে এল!…আমার ভয় করে, আমার ভালো লাগে না।…যে কটা দিন বেঁচে আছি, তোর কোলে—

তারা॥ দেখছি গরম ঘি গলায় আর মালিস না করলেও চলবে,…সেরে গেছে—

তারানাথ॥ কি সেরেছে…থক্-থক্…কাসি?…থক্-থক্—

তারা॥ কাসির নাম কিন্তু এবার আমি মুখেও আনি নি!

তারানাথ॥ ওরে শালী!…ওরে হারামজাদী।…থক্-থক্-থক্ [পুনরায় বসিয়া পড়িল]…আকারে বলেছিস—ইঙ্গিতে বলেছিস…চোরা চাউনিতে বলেছিস…থক্-থক্-থক্।

[হাঁপাইতে লাগিল]

তারা॥ আমি পাখা নিয়ে আসি…[ঘরে গিয়া পাখা আনিল। তারানাথ এবার বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল]

তারানাথ ॥ পাখা করিস পরে। আগে ঐ বাতিটা হাওয়ার ধর—ঐ যেখানে কাসি ফেলেচি। থক্-থক্।

তারা ॥ কেন? কেন?

তারানাথ ॥ ধর শালী, বাতি ধর—

তারা ॥ [কাসি যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে বাতি ধরিল] কি?

তারানাথ ॥ [ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া]—কি? চোখের মাথা খেয়েছিস্ না কি? [মুখ ভেঙাইয়া] কি! [হতাশ হইয়া লুটাইয়া পড়িল] নে এইবার তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

তারা ॥ রক্ত! [শিহরিয়া উঠিল]

তারানাথ ॥ শালা বেতালের রক্ত খেয়েছিলুম হজম হলো না।

তারা ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] তুমি আজ বিকেলে পান খেয়েছিলে, সেই যে আমি সেজে দিলুম?—এ তাই—, ওগো, এ···তাই—

তারানাথ ॥ ওরে শালী, ঐ পান তোর নতুন ভৈরবকে সেজে দেবার জন্যে বাটা ভরে তুলে রাখ। এমনি পান যেন সে শালাও খায়।···নাও, এইবার পাখাখানা আমার হাতে এগিয়ে দাও ঠাকরুণ—[কিন্তু হাত না বাড়াইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িল]

তারা ॥ [চমক ভাঙিল। তৎক্ষণাৎ হাওয়া করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার চোখ রহিল সেই রক্ত-কাসির উপর]

তারানাথ ॥ ও—হো—হো! [যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিল]

তারা ॥ [ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কাহার চরণে যেন তাহার আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল]

তারানাথ ॥ ওঃ আর পারিনে, হাওয়া কর···একটু জোরে হাওয়া কর—

[তারা হাওয়া করিতে করিতে তারানাথ ক্রমে ঐখানেই ঘুমাইয়া পড়িল]

তারা ॥ ভৈরব!

কোন উত্তর পাইল না। সেখান হইতে উঠিয়া ঘরে গেল। ঘর হইতে একটি বালিশ

১২

আনিয়া তারানাথের মাথায় অতি সাবধানে গুঁজিয়া দিল। পরে তাহাকে আবার হাওয়া করিতে লাগিল।

দূর হইতে একটি রামপ্রসাদী গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কে গাহিতেছিল

"এমন দিন কি হবে তারা!

(যবে) তারা তারা তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা॥"—ইত্যাদি

ক্রমে সে তারার পঞ্চবটীতে আসিয়া থামিল। তারা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "নায়েব মশাই?"]

তারা॥ নায়েব মশাই?

আগন্তুক [নায়েব]॥ তারা নামের গান ধরতেই মনে হল জ্যান্ত তারা ঠাকরুণকে একবার দেখে যাই। ঐ পুণ্যিটুকুর আশাই করি কিনা ঠাকরুণ!··· শুয়ে কে? ভৈরব ঠাকুর বুঝি?

তারা॥ নায়েব মশাই, সর্বনাশ হয়েছে আজ!

নায়েব॥ তোমার আবার কি হল ঠাকরুণ?

তারা॥···আমার নয়···ঐ ওর।···খোকার অসুখ আজ কেমন নায়েব মশাই?

নায়েব॥ আরে কবরেজ তো একরকম জবাবই দিয়েছে। কিন্তু ভৈরব ঠাকুরের ঐ মড়াটির ওপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে বুঝি?···প্রাণবায়ুটুকু প্রবাহিত হচ্ছে তো? [বলিতে বলিতে ভয়ে দূরে সরিয়া গেল]

তারা॥ [তারানাথের কপাল স্পর্শ করিয়া] বেঁচে আছে, এখনো আছে।··· কিন্তু আজ রক্ত উঠেছে—

নায়েব॥ এ্যাঁ—, তাহলেই তো যক্ষ্মা!···শিব···মহাশিবেরও অসাধ্য ব্যারাম! তা হলে, হয়ে এসেছে।···কিন্তু, বুঝলে ঠাকরুণ, তুমি একটু সাবধানেই থেকো, সর্বনাশী রাক্ষুসীর পুজো যখন হল না, তখন কার যে কখন কি হয়, কেউ-ই বলতে পাচ্ছে না। বিশেষ, চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা উঠে, পুজো না হলে, শাস্ত্রেই বলেছে, মহামারী!···নরকের কথা আর নাই বা বললাম!

তারা॥ [কাঁপিয়া উঠিল]···পুজো হবে না, সে কি নায়েব মশাই?

নায়েব॥—হাঁ, এই তীরে এসে তরী ডুবল আর কি!···আরে, টাকা থাকলেই কি পুজো হয়? দেওয়ানকে কলকাতা পাঠালেই কি দুর্গোৎসবের যোগাড় হয়?

বলেছিলুম, কর্তা, আমিই কলকাতা যাই। পুরোনো মনিবের সংসারে দশটি বছর এই পুজোর তদ্বির করেছি আমি।…কর্তা তা শুনবেন কেন। বি-এ ফেল দেওয়ান যে! বললেন দেওয়ান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, তিনিই যাবেন।… বুঝলে ভৈরবী ঠাকরুণ, কাল পুজো, আজ প্রায় এই দুপুর রাতে ধরা পড়ল দেবীর মহাস্নানেরই যোগাড় নেই!…এফ্-এ পাস দেওয়ান, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দেওয়ান পাঠিয়ে মহাস্নানের যোগাড় হ'ল না, হ'ল এই…গ্রাম ধ'রে সবংশে নির্বংশ যাবার যোগাড়।…হরে দুর্গা! হরে দুর্গা! হরে দুর্গা!

তারা॥ [শঙ্কিত পরাণে] খোকার অসুখ বেড়েছে?

নায়েব॥ আরে, এ অবস্থায়, চিতায় উঠতে কত দেরি, মাত্র এই এক প্রশ্ন হতে পারে।…অসুখ তো বাড়বেই, সে তো ধর্তব্যই নয়।…কাল শুনবে, অবশ্যি আজকের রাতটি যদি কাটে, কাল শুনবে মহামারী সুরু হয়ে গেছে। আরে, দুর্লভপুর গ্রামটি ঐ অমনি করে এক রাত্রিতে উচ্ছন্ন যায় নি? কে না জানে?

তারা॥ রক্ত উঠেছে, ওর কাসিতে রক্ত উঠেছে।…কি হবে নায়েব মশাই?

নায়েব॥ রক্তও উঠেছে, কৈলাসধামেরও দরজা খুলে গেছে।…ওতো পুণ্যির কথা ঠাকরুণ!

তারা॥ আমরা যে পাপী…মহাপাপী আমরা। …ও ভয়ে ভালো করে ঘুমুতেও পারে না। আমায় ছেড়ে ও একদণ্ডও টিকতে পারে না! মৃত্যুভয় ওর বড় ভয়। মার কি দয়া হবে না?

নায়েব॥ তোমাদের এত ভয় কেন ঠাকরুণ?…তোমরা যে সেই সর্ব্বনাশীরই চেলা চেলী!…দুজনে দুপাত্র টেনে ব্যোম হয়ে শুয়ে ঘুম দাও না!

তারা॥ [শঙ্কা-ব্যাকুল চিত্তে] তুমি বুঝছ না, তুমি বুঝছ না নায়েব মশাই! এমনিই আমরা মহাপাপ করেছি, তার ওপর—

নায়েব॥ দেবতার জানিত লোক তোমরা, দেবীর বাহনই হচ্ছ তোমরা, তোমাদের পাপ? বল কি ঠাকরুণ?

তারা॥ হাঁ, পাপ···পাপ করেছিলুম। করেছিলুম বলেই সংসার ছেড়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়লুম।

নায়েব॥ তারাও বেরিয়েছিল···

তারা॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কারা?

নায়েব॥ আমার এক কুটুম্ব। কিন্তু সে আর এক কথা। একটা লজ্জারই কথা। গেরস্থ ঘরের এক কুলকামিনীকে···

তারা॥ [সঙ্গে সঙ্গে] বিধবা? বালবিধবা?

নায়েব॥ আরে, না—না—না। তুমি বের হয়েছ এক অবস্থায়, আর সে মাগী বের হয়েছিল কুলে কালী দিয়ে! ভগবৎ প্রেমের 'ভ'ও ছিল না তাতে!

তারা॥ আমাদেরও। আমাদেরও ছিল না, নায়েব মশাই, তাই···তাই বুঝি আমাদের এ দশা!

নায়েব॥ ভগবৎ প্রেম নেই তোমাদের? সাধেই কি ভৈরব ভৈরবী হয়েছ!

তারা॥ ভৈরব চিনেছে ভৈরবী, ভৈরবী চিনেছে ভৈরব, ভগবানকে আজ পর্যন্তও চিনে উঠতে পারলুম না নায়েব মশাই! মনেও তো পড়ে না তাঁর কথা। মনে হয়ত পড়তোও না যদি না ওর এমনি দশা হ'ত!···কিন্তু নায়েব মশাই, এখন দেখচি তাঁকে মনে করেই আরো নতুন করে সর্বনাশ ডেকে আনলুম।

নায়েব॥ সে কী ভৈরবী ঠাকরুণ!

তারা॥ আমি যে মা দুর্গার চণ্ডীমণ্ডপে ওর কল্যাণের জন্যে পুজো মানত করেছি, পুজোই যদি না হয়, মানত রক্ষা হবে কিসে, ওর কল্যাণই বা হবে কেন? ···[কাঁপিয়া উঠিয়া] পুজো হবে না কেন? কিসের অভাব?

নায়েব॥ পুরোহিত রায় দিয়েছেন মহাস্নানের কি যেন দুটি উপকরণ আজ রাত্রে যোগাড় না হলে কাল পুজো হতে পারে না। 'বোধনে'ই দেবীর বিসর্জন হবে।

তারা॥ সে যে মহাসর্বনাশের কথা হবে নায়েব মশাই!···জমিদার বাবু কি করছেন?

নায়েব ॥ তিনি আর কি করবেন! মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। খোকাবাবুর অসুখ আরো বেড়েছে খবর পেয়ে অন্দরে গেলেন, আমরাও উঠে এলুম।

তারা ॥ পুজো না হলে খোকাবাবুও ভালো হবে না, আর [শিহরিয়া উঠিয়া] ওরও মঙ্গল দেখচি নে!···রক্ত উঠেছে নায়েব মশাই, রক্ত উঠেচে—

নায়েব ॥ কিন্তু ঘুমুচ্ছেন তো বেশ! শ্বাস প্রশ্বাস বইছে তো?

তারা ॥ কেন আপনি অমঙ্গল ডেকে আনছেন? রাত হয়েছে আপনি এখন যান।

নায়েব ॥ হাঁ, যাব-ই তো, যাচ্ছি···[অদূরে অন্ধকারে কোনও অদৃশ্য প্রাণীকে কল্পনা করিয়া] তাই তো! কর্তা যে!···আলো কই? ওগো ভৈরবী ঠাকরুণ! তোমার বড় সুপ্রসন্ন কপাল। রাজ্যের রাজা স্বয়ং তোমার কুটীরে শুভ পদার্পণ করেছেন···[তারা ভীত চমকিত হইয়া উঠিল] আরে, আলোটা এগিয়ে নিয়ে যাও না! কর্তা যেমন আপন ভোলা লোক···আলো কি চাকর বাকরের কথা খেয়ালই ছিল না বুঝি! [তারা উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু আলো লইয়া অগ্রসর হইল না। নায়েব তখন বাধ্য হইয়া আলো লইয়া অগ্রসর হইল]

[জমিদারবাবুর প্রবেশ]

নায়েব ॥ [আলো রাখিয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া]···ভৈরব ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলাম, ভারী অসুখ ঠাকুরের···শিবের অসাধ্য সেই ব্যারাম রাজযক্ষ্মা!···ভৈরবী ঠাকরুণ কেঁদেই অস্থির—ঐ দেখুন না চোখ দুটি এখনো ছলছল! আমি বললুম আমাদের খোকাবাবুও সেরে উঠছেন না। পুজোটা কিন্তু করতেই হবে কর্তা! প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপে উঠেছে, এখন পুজো না হলে, [শিহরিয়া উঠিল] ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! জানেন তো কর্তা সেই দুর্লভপুরের কথা, এক রাত্রিতে গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন গেল! পুজো হবে তো? উপকরণ মিলছে না যে!

জমিদার ॥ [নায়েবের প্রতি] এ গ্রামে তো নেই, সে আমি জানি।

পাশের গ্রামেও নেই। নিশ্চিন্তপুরে নেই, হরগুরাতে নেই, কোনও গ্রামে নেই। ভাতশালার খোঁজ নিয়েছ?

নায়েব॥ নেই, নেই, সেখানেও নেই কর্তা! প্রবল-প্রতাপ আপনি সশরীরে বর্তমান থাকতে আপনার এলাকায়, কি আপনার আশেপাশের এলাকায় কোন্ মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা যে বেশ্যাবৃত্তি করবে!

জমিদার॥ আজ দেখচি আমার এই শাসনই আমার কাল হল!

নায়েব॥ ঐ তো কথা। লোকে বলে প্রবল-প্রতাপ শিবরাম চক্কোত্তির এক পরগণায় জমিদারী শাসন চলে, দশ পরগণায় সামাজিক শাসন চলে! কোন্ মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা—

তারা॥ আপনারা এখানে এ কি সুরু কর্লেন? এত রাত্রে আমার এখানে···

নায়েব॥ আমি বলি। কোনখানেই একটা বেবুশ্যে খুঁজে পাচ্ছি নে,; কালকের পুজো যে ঐ জন্যেই আটকে পড়েছে ঠাকরুণ! তা ঠাকরুণের চটবারই কথা, ভৈরব ঠাকুরের এই এখন-তখন কিনা!

তারা॥ [জমিদারের চোখে চোখে চাহিয়া] কালকের পুজোয় বেশ্যার কি দরকার জানি না, জানতে চাইও না।···সে যাক। কিন্তু আপনারা এখানে, এত রাত্রেই বা কেন এসেছেন তাওতো বুঝে উঠতে পাচ্ছি না! এটা মাতালের মাতলামিরও যায়গা নয়, বেশ্যা খোঁজবার খোঁয়াড়ও নয়—

নায়েব॥ আ-হা-হা! চটো কেন! চটো কেন!···বলুন না কর্তা কেন এসেছেন—

জমিদার॥ মদ আমরা কেউ খাইনি ভৈরবী। তবে···ছেলের অসুখ, তাতে পুজো আটকে যাচ্ছে, তার ওপর জমিদারের সম্মুখে ঐ মোসাহেব···সবগুলো মিলে আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, এই যা!

তারা॥ সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু, এখানে আপনাদের, বিশেষ আপনার আসবার কারণ বুঝতে পাচ্ছি না—

জমিদার॥ গিন্নি বললেন তুমি নাকি খোকার মাথায় কি জপ পড়েছিলে তাতে খোকা একটু আরাম বোধ করেছিল। তোমাকে তিনি আবার চান, এই

রাত্রেই, ঐ জন্যে।…কিন্তু আমি জানি তুমি যাবে না…তাই আমি এখানে এলেও সেজন্যে আসি নি…

তারা॥ আমি যেতুম, কিন্তু ভৈরবের অবস্থাও খুবই খারাপ। ও ভালো থাকলে ওকে সঙ্গে নিয়ে এই রাত্রেই যেতুম। কিন্তু আমি যাবোই না যদি আপনি ঠিক ধরে নিয়েছিলেন, তবে এলেন কেন?

জমিদার॥ আমি তো এখনি বললুম, তোমাকে নিয়ে যেতে আমি আসিনি! আমি এসেছি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে—

নায়েব॥ [জমিদার "প্রার্থনা" করিতেছেন, মোসাহেবী মনে সেটা বরদাস্ত হইল না] প্রার্থনা!…বলেন কি হুজুর!…আপনি শুধু একটিবার মুখ ফুটে বলুন না। তবেই দেখবেন—

জমিদার॥ [বিরক্ত হইয়া] নায়েব—[আদেশসূচক স্বরে] এখনি এখান থেকে যাও…ঐ পথের পাশে গিয়ে বসে থাকো…যাও—

[নায়েব ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মাথা চুলকাইতে লাগিল]—যাও বলছি—[নায়েব ছুটিয়া অদৃশ্য হইলে, তারার প্রতি] ওর ব্যবহারের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ভৈরবী!

তারা॥…কিন্তু ঐ ক্ষমা চাইবার মতো দুর্ব্যবহার কি শুধু নায়েবের একার? সেও না হয় যাক, কিন্তু আজ আমাদের এই অসময়ে আপনারা আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছেন কেন বলুন দেখি?…একটা কথা শুনুন…আপনার খোকাই শুধু মরণাপন্ন কাতর নয়, ঐ যে দেখছেন ভৈরব…উনি এখনও বেঁচে রয়েছেন কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।…আপনি যান…গিয়ে, খোকাকে দেখুন, ওঁকেও দেখবার জন্যে আমাকে অবসর দিন—

জমিদার॥ আজ বুঝি কাসির সঙ্গে খুব রক্ত উঠেছে?

তারা॥ [ভয়ে, আতঙ্কে] হাঁ।

জমিদার॥ শুনলুম যক্ষ্মা।…বাঁচাতে চাও ওকে ভৈরবী?

তারা॥ খোকাকে আপনি বাঁচাতে চান কি না, আপনাকে সে প্রশ্ন করলে দেখছি আপনি কিছুমাত্র আশ্চর্যি হবেন না!

জমিদার ॥ কিন্তু আমি আশ্চর্যি হলুম, শুধু এই দেখে যে তুমি তবে ঐ ঘাটের মড়াটাকেও ভালোবাস। ভক্তি করলে বিস্মিত হতুম না, কিন্তু ভালো বাসলে বিস্মিত হবার কারণ আছে—

তারা ॥ কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার এই রকম আলাপ,...না, এত কথারই বা দরকার কি? আপনি আমার পঞ্চবটী ছেড়ে এই মুহূর্তেই চলে যান—যান বলছি—

জমিদার ॥ [অবিচলিত ভাবে, সহজ সরল স্বরে] আমি যাব না ভৈরবী। না ভৈরবী, আমি যাব না। তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না। আমি নিরুপায় হয়েই তোমার শরণ নিতে এসেছি। জমিদার হলেও আজ আমি দুনিয়ার দীনতম ভিক্ষুক। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—

তারা ॥ [বিস্মিত হইয়া জমিদারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল]

জমিদার ॥ হাঁ, ভিক্ষা চাইছি। বিশ্বাস কর ভৈরবী। এর মধ্যে এতটুকু ছলনা নেই। আর এ-ও শোন ভৈরবী, আজ যে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, সে ভিক্ষা চাইছি আমার খোকার কল্যাণের জন্যে, তোমার ভৈরবের কল্যাণের জন্যে,—এদেশের সবায়ের কল্যাণের জন্যে—

তারা ॥ বলুন, শিগ্‌গির বলুন, আপনাকে আমার কি দেবার আছে, কি দিতে হবে—

জমিদার ॥ আজ এই ষষ্ঠীর রাত্রেও কালকের মহাসপ্তমীর পূজোর আমি সম্পূর্ণ আয়োজন করতে পারিনি। দেওয়ানের ভুলেই এই সর্বনাশ হয়েছে—

তারা ॥ সে আমি নায়েবের মুখে শুনেছি। দেবীর মহাস্নানে প্রয়োজন কি দুটি উপকরণ আপনি যোগাড় করতে পারেন নি।...সুরা?

জমিদার ॥ আমার ভাণ্ডারে আর যারই অভাব হোক না কেন, সুরার অভাব কোন কালেই হবে না, অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে আছি। হাঁ, এ কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। না, সুরা নয়—

তারা ॥ গজদন্ত মৃত্তিকা?

জমিদার ॥ না,—

তারা ॥ বরাহদন্ত মৃত্তিকা ?

জমিদার ॥ তাও নয় ভৈরবী, তাও নয়—

তারা ॥ সাগর মৃত্তিকা ?

জমিদার ॥ ডায়মণ্ডহারবার থেকে আনিয়েছি।

তারা ॥ তবে ?···গঙ্গামৃত্তিকা তো কলকাতাতেই মিলেছে, মেলে নি ?

জমিদার ॥ মিলেছে। অসাধারণ যা কিছু, সব মিলেছে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে মহাস্নানের এত খবর তুমি রাখ কেমন করে ?

তারা ॥ জন্মেই তো আর কেউ ভৈরবী হয় না! বাপের জমিদারী না থাক সাত পুরুষের দুর্গাপুজোটা ছিল। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঐ অসাধারণ জিনিষগুলি দেখবার জন্যে কি অসাধ্য সাধনই না করেছি!

জমিদার ॥ কিন্তু মহাস্নানের সাধারণ জিনিষগুলির খবর বোধ করি রাখ না!

তারা ॥ তাও রাখি বই কি!···পুজোর তদ্বির করতে বাবার ছেলে ছিল না, ছিল এই মেয়ে।

জমিদার ॥ শ্বশুরবাড়ীতেও বুঝি ও-ভার তোমারি ছিল ভৈরবী ? [ভৈরবীর চোখে চোখে চাহিয়া রহিলেন]

তারা ॥ ও কথায় তো আপনার কোনও কাজ নেই—[মুখ নামাইয়া ধীরভাবেই কহিল]

জমিদার ॥ [হতাশ হইয়া পড়িলেন। শেষে নূতন উদ্যমে] আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি ভৈরবী।

তারা ॥ ভিক্ষা চাওয়াটা আপনার সরলতার পরিচয় দিচ্ছে না। খুলেই বলুন না কি চাই ?

জমিদার ॥ চাই বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা।

তারা ॥ [স্তম্ভিত হইল! পরে আত্মদমন করিয়া ধীরভাবে] আপনি কি মদ খেয়ে মাতলামি করতেই এখানে এসেছেন ?

জমিদার ॥ আমি ভয়ে আতঙ্কে মরিয়া হয়ে এসেছি।

জমিদার ॥ কিন্তু হতে কতক্ষণ? দোষই বা কি?···ভৈরব ঠাকুর ওপারের স্বপ্ন দেখছেন! তিনি মাথা ঘামাবেন না। আর যদি কিছু শোনেনই, বড় জোর তাঁর কাসিটা বাড়বে। তুমি তখন এই বুঝিয়ে বলো, ঐ কাসিটাই ভালো করবার জন্যে এ সব—

তারা ॥ সয়তান···

জমিদার ॥ সত্যি বলছি, কাসিটা ভালো হয়ে যাবে···

তারা ॥ ভৈরব! ভৈরব! [তারানাথকে ঠেলিতে লাগিল। তারানাথের ঘুম ভাঙিবার উপক্রম হইল। তাহার গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল]

জমিদার ॥ কিছু পুণ্য এর মধ্যেই এখানে ঢেলেছি।···ওকে জাগালে ও এখনি রক্ত বমি করবে। আমি বলি তোমার মানত রক্ষা করে ওর শেষ চিকিৎসাটাই না হয় দেখ। জাগিয়ো না, ওকে জাগিয়ো না, ওকে জাগিয়ো না ভৈরবী। আমার সকল পুণ্য এখানে নিঃশেষ হোক···পুজো হোক্···

তারানাথ ॥ [চোখ বুজিয়া ঘুমের ঘোরেই] এত গোলমাল কেন! [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে—ওরে ভৈরবী—ঐ ওরা আমাকে নিতে এসেছে, বাঁচা···আমাকে বাঁচা···[ভয়ে দস্তুর মতো কাঁপিতে লাগিল]

জমিদার ॥ বাঁচাও···ওকে বাঁচাও—

তারা ॥ [তারানাথের দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া] ভয় নেই, দুর্গা দুর্গা বল—

তারানাথ ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] দু-র্গা! দু-র্গা! [ক্রমে শ্রান্ত হইল] আমি একি দেখছিরে ভৈরবী! মা দুর্গা শাসাচ্ছেন···পুজো মানত করে তুই পুজো দিস্‌নি···জিব লকলক করছে···রক্ত খাবে···রক্ত···রক্ত···

জমিদার ॥ পুজো দাও···পুজো দাও···

তারানাথ ॥ ঐ···ঐ···!···বেরিয়ে আসছে, আমার গলা দিয়ে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে আসছে···[যুপকাষ্ঠবদ্ধ বলির মত ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল]

তারা ॥ [আর সহ্য করিতে পারিল না, জ্ঞানহারা হইয়া জমিদারের সম্মুখে

খাইয়া] নাও···তুমি আমার দুয়ারের সকল মাটি নাও···কর পুজো···পুজো কর···
[কাঁদিয়া ফেলিল] নইলে, বাঁচে না···ও বাঁচে না—

জমিদার ॥ কিন্তু···শাস্ত্রে বলে···

তারা ॥ [হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে] দেহ নাও···সব নাও···!···নাও মাটি !···
তোমার পুণ্যে, আমার পাপে, হোক পুজো···পুজো হোক···

[নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব ॥ [দূর হইতেই তারাকে কাঁদিতে দেখিয়া] ইঃ আবার ডাক ছেড়ে
কান্না হচ্ছে ! বলি অত গরব কেন ? [ছুটিয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া] দিন
ওকে ছেড়ে । মার পুজোর ব্যবস্থা মা-ই করেন । এই মাত্র জগন্নাথ পাঁড়ে বেশ্যাদ্বার
মৃত্তিকা' নিয়ে এসেছে। যেমন তেমনটি নয়, কলকাতায় পাঁচটি বৎসর ব্যবসা
চালিয়ে একমাস হ'ল ফুলবাড়ী থানায় নাম লিখিয়েছে শুনলুম···খুব পসার—!

[আত্মশক্তি, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩৫]

পঞ্চভূত

[অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্যের শয়ন কক্ষ। অধ্যাপক-পত্নী মনীষা মরণাপন্ন কাতর। মনীষা ঘুমাইতেছেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক এবং ডাক্তার। রাত্রি প্রায় দশটা]

ডাক্তার॥ দেখুন, এখনো বোধ হয় সময় আছে। আপনি কালই এ বাড়ীটা ছেড়ে অন্য একটা নতুন বাড়ীতে উঠে যান্—

অধ্যাপক॥ আপনাদের ঐ এক কথা! কিন্তু কথাটার মানে আমি একেবারেই বুঝিনা।···ভূত বলে কিছু নেই; ওটা শুধু দুর্বল মনের একটা আতঙ্ক মাত্র—

ডাক্তার॥ মানলুম। কিন্তু···যখন এই বাড়ীটাতে ঐ আতঙ্ক থেকেই আপনার স্ত্রী মরণাপন্ন কাতর, তখন কি, অন্ততঃ তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্যেও এ বাড়ীটা ছেড়ে—

অধ্যাপক॥ আপনি রোগের মুল কারণটি ভুলে যাচ্ছেন। আতঙ্কটার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল গৃহ নয়, মন। হাঁ ডাক্তারবাবু, এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্ভুল—

ডাক্তার॥ এ বিষয়ে আপনাব সঙ্গে আমার তর্ক করা শোভা পায় না, যখন আপনি এই প্রেততত্ত্ব নিয়েই থিসিস্ লিখছেন।···শেষ হয়েছে?

অধ্যাপক॥ হয়নি, কিন্তু, আজ রাত্রের ভেতরই শেষ করতে হবে। শেষ করতেই হবে। কেন, জানেন?

ডাক্তার॥ আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে কেন?

অধ্যাপক॥ থিসিস্ দাখিল করবার শেষ দিন হচ্ছে কাল। আজ সারাটি রাত আমাকে লিখতে হবে—

ডাক্তার ॥ রোগিনীর সেবা এবং থিসিস্ লেখা এক সঙ্গে—কি করে হবে ?

অধ্যাপক ॥ সে আমি ভাবিনে ; সেবা করবার লোক আছে।

ডাক্তার ॥ লোক পেয়েছেন ? রাত্রে তো এ বাড়ীতে ভয়ে কেউ থাকতে চায় না আমি শুনেছি ; সে কথা কি তবে—

অধ্যাপক ॥ সবাই মিথ্যা আতঙ্কে ভীত নয় ডাক্তার বাবু। যারা সত্যের সন্ধানে বের হয়েছে—

ডাক্তার ॥ এ বাড়ীতে তেমন সৎসাহসী কি একজনের বেশি আছে ? অর্থাৎ আপনার দোসর ?

অধ্যাপক ॥ না থাকলে আমার থিসিস্ লেখা চলতো কি করে ? বিশেষ, রাত্রে ছাড়া এইরকম গভীর গবেষণায় আমার মন বসে না ; অথচ রাত্রেই ওর অসুখ বাড়ে। তারা রাত্রে এসে মনীষার সেবাশুশ্রূষার ভার নেয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে লিখি—

ডাক্তার ॥ তারা কে ?

অধ্যাপক ॥ আমার পাঁচজন ছাত্র। হাঁ, আপনি তো তাদের দেখেছেন··· ক্ষিতীশ···অপরেশ···

ডাক্তার ॥ দেখেছি, এবং এও দেখেছি মনীষাদেবী বিকারের ঘোরে ওদের ভয়েই বেশি অস্থির হয়ে ওঠেন—

অধ্যাপক ॥ সে আমিও দেখেছি। অথচ সে ভয় নিতান্তই কি নিরর্থক নয় ডাক্তারবাবু ? মনীষার এই মানসিক বিকার, এই চিত্তবিভ্রমকেই আমার থিসিসের গোটা একটি অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু করেছি। আমার ঐ ছাত্ররা মনীষার চিত্তবিকারের খোরাক যোগায়, নির্ভয়ে। আমি পর্যবেক্ষণ করি···গবেষণা করি··· লিখি—

ডাক্তার ॥ আমিও লিখব—

অধ্যাপক ॥ লিখবেন ! কি লিখবেন ?

ডাক্তার ॥ খুব সম্ভবতঃ একটি থিসিস্-ই।

অধ্যাপক ॥ কি বিষয়ে ?

ডাক্তার ॥ আপনার সঙ্গে আমার আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক তবে তাতে হাত দিতে পারব।

অধ্যাপক ॥ বলুন না—বলুন না—আজই বলুন না।

ডাক্তার ॥ না, আজ নয়। সে কথা যাক্। কাল সকালে দুটো ওষুধ পাঠাবো···একটা মনীষাদেবীর, অপরটা—

অধ্যাপক ॥ অপরটা—?

ডাক্তার ॥ আপনার।

অধ্যাপক ॥ আমার!

ডাক্তার ॥ হাঁ, আপনার। আপনি খাবেন। যদি না খান—

অধ্যাপক ॥ আমি ওষুধ খাব! আমার আবার কি হল?

ডাক্তার ॥ অসুখ হয়েছে।

অধ্যাপক ॥ আমি তো কোন অসুখ বুঝ্ছিনে—

ডাক্তার ॥ ব্যাধি ঐ।···শুনুন আপনি যদি ওষুধ না খান, মনীষাদেবীকেও আমার ওষুধ দেবেন না।

অধ্যাপক ॥ আমার অসুখ—!

ডাক্তার ॥ হাঁ!···আর শুনুন। মনীষাদেবী বেশ ঘুমোচ্ছেন। আজ রাত্রে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা না হয় নাই হ'ল। ক্ষিতীশবাবুরা এলে আজ রাত্রে তাদের বাড়ী গিয়ে ঘুমুতে বলবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থিসিস লিখুন···নমস্কার।

অধ্যাপক ॥ নমস্কার। [ডাক্তারের প্রস্থান] ডাক্তার বাবু বেশ রসিক লোক দেখছি। অথবা, ওঁরও কি মানসিক বিকার? অসুখ হল মনীষার, আর ওষুধ খাব আমি! হাঃ হাঃ হাঃ [উচ্চহাস্য। তাহাতে মনীষা চমকিয়া উঠিলেন]

মনীষা ॥ কে ও?

অধ্যাপক ॥ আমি।

মনীষা ॥ ক্ষিতীশ বাবু?

অধ্যাপক ॥ না।

মনীষা ॥ অপরেশ?

অধ্যাপক ॥ আমি—আমি—

মনীষা ॥ তেজেশ ?

অধ্যাপক ॥ আঃ—আমি।

মনীষা ॥ কে ? মরুত্তম বাবু ?

অধ্যাপক ॥ [কাছে আসিয়া] আমাকে চিনতে পারছ না মনীষা ?

মনীষা ॥ [আশ্বস্ত হইয়া] আঃ তুমি ! আমি ভাবছিলুম বুঝি ব্যোমকেশ বাবু।

অধ্যাপক ॥ তারা এখনো আসে নি। এই এল বলে। ওরা না এলে আজ আমার উপায় নেই। মনীষা, কাল বেলা দশটায় আমার থিসিস দাখিল করতে হবে—আর বারো ঘণ্টা সময়ও নেই !

মনীষা ॥ আমারো নেই,—নেই। আমারো হয়ে এসেছে। এস না··· আমার কাছে একটু বসো। তোমার আঙুলগুলো কই ? আমার চুলের ভেতর দাও দেখি—

অধ্যাপক ॥ দিচ্ছি ! কিন্তু আমার থিসিস্‌টা—

মনীষা ॥ শুধু চুলের ভেতর দিলেই হল ? আঙুল চুলের ভেতর এঁকে বেঁকে খেল্‌চে না কেন ? তুমি কিছু জান না।···ক্ষিতীশ বাবু সেদিন—

[দরজায় ক্ষিতীশের আবির্ভাব]

ক্ষিতীশ ॥ আমি এসেছি দেবী !

মনীষা ॥ [আতঙ্কে] না—না—না—

অধ্যাপক ॥ এসো ক্ষিতীশ।

মনীষা ॥ [রুখিয়া উঠিয়া] খবরদার, কখনো না।

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা !

মনীষা ॥ যম ! যম ! ও আমার যম !

ক্ষিতীশ ॥ মনীষাদেবী, আমি—

মনীষা ॥ [অধ্যাপকের হাত দুখানি আঁকড়িয়া ধরিয়া] ওরা আমায় নিয়ে যাবে। তুমি আমায় ধরে রাখ—

অধ্যাপক ॥ ওরা তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এসেছে। আমাকে যে এখনি

থিসিস্ লিখতে হবে। ভেবে দেখ মনীষা, আমি ডক্টরেট পাবো…সে কি তোমারি কম গর্ব মনীষা ?

মনীষা ॥ ..রেখে দাও তোমার ডক্টরেট। তুমি আমার কাছে এস ! আমার বিছানায় এস—আমার বিছানায় এস। আমায় আদর করো…ভালোবাসো …আমায় একটি চুমো দাও—

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা, ছিঃ ! ক্ষিতীশ, তুমি ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বোস। খানিকটা পরে এসো। এসো কিন্তু।

ক্ষিতীশ ॥ নিশ্চয় স্যর।

মনীষা ॥ গেছে ?

অধ্যাপক ॥ হাঁ, গেছে। কিন্তু মনীষা, এ সব তোমার কি পাগলামি বল দেখি ?

মনীষা ॥ দোরটি দাও।

অধ্যাপক ॥ ওরা তবে কি করে আসবে ?

মনীষা ॥ ওদের আসতে হবে না। ওরা এলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে।

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা,—আবার ভুল বকছ ?

মনীষা ॥ না—না, ভুল নয়। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেই ওরা আসবে। তুমি দোর দাও।

অধ্যাপক ॥ ওদের না আসতে দিলে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করবে কে ?

মনীষা ॥ কেন, তুমি। তুমি আমার কাছে থাকো। এই একটি বালিশে আমরা দুজনে মাথা রাখি—মুখোমুখি হয়ে শুই ; তুমি কথা বল, আমি শুনি…। আমায় একটি চুমো দাও…আমার সব অসুখ সেরে যাবে।—সত্যি বলছি… আমি সত্যি বলছি—

অধ্যাপক ॥ কিন্তু আমার যে অবসর নেই মনীষা। আজ রাত্রের মধ্যে আমাকে থিসিস্‌টি শেষ করতে হবে। এই দেখ, রাত প্রায় এগারোটা হোলো। আর তো আমি না গিয়ে পারিনা।

মনীষা ॥—এস !

অধ্যাপক ॥—ক্ষিতীশদের ডেকে দি—

মনীষা ॥ খবরদার। দোর বন্ধ কর।

অধ্যাপক ॥ তোমার শুশ্রূষা ?

মনীষা ॥ লাগবে না। আমি বেশ আছি। তুমি দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক ॥ ওরা যে এসেছে !

মনীষা ॥ [কোন কথা কহিলেন না। শালখানি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া মুখ ঢাকিলেন]

অধ্যাপক ॥ মনীষা—[কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় ডাকিলেন] মনীষা !

[দ্বারে ক্ষিতীশ]

ক্ষিতীশ ॥ বোধ হয় ঘুমিয়েছেন স্যর।

অধ্যাপক ॥ আমারো তাই মনে হচ্ছে।—এস, ভেতরে এস।

মনীষা ॥ [মুখ হইতে শাল সরাইয়া] কখনো না। আমি ঘুমুব···কিন্তু ওরা এলে আমি পাগল হয়ে যাই···ওরা চলে যাক্।

অধ্যাপক ॥ তাহলে ক্ষিতীশ—

ক্ষিতীশ ॥ বলুন স্যর।

অধ্যাপক ॥ শুশ্রূষার আজ আবশ্যক বুঝছি নে।

ক্ষিতীশ ॥ বেশ স্যর, আমরা ড্রয়িং-রুমেই শুয়ে থাকব! যদি আবশ্যক হয় আমরা আসব।

মনীষা ॥ দোর দাও।

অধ্যাপক ॥ দিচ্ছি। আর কিন্তু বিরক্ত করতে পারবে না। এই দোর দিলুম। এইবার তুমি ঘুমোও। আমি আমার লাইব্রেরী ঘরে লিখতে চললুম।

মনীষা ॥ আমার পাশের এই জানালাটা—

অধ্যাপক ॥—বন্ধ করব ?

মনীষা ॥ তুমি কি সত্যিই আমায় ছেড়ে···লিখতে যাচ্ছ ?

অধ্যাপক ॥ না গিয়ে উপায় নেই মনীষা।

মনীষা ॥ তবে ওটা বন্ধ করে যাও।

অধ্যাপক ॥ কেন মনীষা? দিব্যি হাওয়া আসছে—

মনীষা ॥ হাঁ, যতক্ষণ তুমি আছ। দিব্যি হাওয়া···ফুরফুরে হাওয়া···! শুধু কি একা? সঙ্গে এনেছে বকুলের আকুল গন্ধ। সে কি শুধু গন্ধ? সেই গন্ধে ভেসে বেড়াচ্ছে আমারি মর্মবাণী···তুমি আমার পাশে আছ, আমি তোমার পাশে আছি···আমরা অমর! আমরা অমর!

অধ্যাপক ॥ বাঃ, বেশ কথা মনীষা। তবে জানালা খোলাই থাক্। আমি এখন আসি।

মনীষা ॥ না—না—তবে জানালা বন্ধ করে দিয়ে যাও!

অধ্যাপক ॥ কেন? ফুরফুরে হাওয়া···বকুলের ব্যাকুল গন্ধ—

মনীষা ॥ হাঁ, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আছ। যেই তুমি আমায় ফেলে দূরে যাবে···অমনি রুখে আসবে এক ঝড়ো হাওয়া! শুধু কি একা? তারি সঙ্গে উড়ে আসবে ধুলো আর মাটি···আমার সেই যুগযুগান্তরের খেলার সাথী! ···শুধু কি তাই?···ঐ যে আকাশ, ওর চোখে তখন আগুন জ্বলবে···বিদ্যুতের চমকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে···তাও যদি বা না যাই, ও তখন কাঁদতে বসবে·· সে চোখের জলের বৃষ্টিধারাও যদি তুচ্ছ করি···ঝড়ো হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঐ বাইরে। ওদের ভাণ্ডার থেকে যে রূপ আমি তোমার জন্যে তিলে তিলে চুরি করে তিলোত্তমা হয়ে পালিয়ে এসেছিলুম···সেই রূপ ওরা আবার তেমনি তিলে তিলে কেড়ে নেবে—

অধ্যাপক ॥ তুমিও কি কোন থিসিস্ লিখছো মনীষা? এত কথা তুমি কবে কোথা থেকে শিখলে?

মনীষা ॥ কেন? ঐ ক্ষিতীশ···ঐ অপরেশ···ঐ তেজেশ···ঐ মরুত্তম··· সেই ব্যোমকেশ! তারা যে এ কথা কতবার কতভাবে আমায় বলে! কখনো কাণে কাণে! কখনো মনে মনে!

অধ্যাপক ॥ বল কি মনীষা? ওরা?

মনীষা ॥ জান না তো ওদের কীর্তি! গভীর রাতে আমার পাশে বসে

যখন ওরা বলে ওরাই সেই ধূলা মাটি, সেই আকাশ বাতাস আগুন এবং জল, আমার জন্যে ওরা ওৎ পেতে বসে আছে···শুধু দেখছে···তুমি আমায় ছেড়ে কতদূর গেছ···কতদূরে আছ···বল দেখি কেমন করে আমি বাঁচি?

অধ্যাপক॥ তুমি আজ বড্ড ভুল বকছ মনীষা!

মনীষা॥ ভুল নয় ভুল নয়। ভুল করছ তুমি। তুমি আমায় যতই ভুলছ ···ততই ওরা সাহস পেয়ে এগিয়ে আসছে! তুমি আমায় ছেড়ে যতই দূরে চলে যাচ্ছ, ওরা ততই আমায় গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে!···যে চুমোটি তুমি আমায় দাও না, সেই চুমোটি ওরা দিতে পাগল! আমি কি দেখি, জানো?

অধ্যাপক॥—কি?

মনীষা॥—একটা প্রকাণ্ড লড়াই আমাকে নিয়ে অহবহ চলছে।

অধ্যাপক॥ লড়াই?

মনীষা॥ হাঁ লড়াই। কোন্ যুগে যেন তুমি মনে প্রাণে শুধু রূপই কামনা করেছিলে। সেদিন ঐ ছিল তোমার ধ্যান, ঐ ছিল তোমার তপস্যা। সেই আকর্ষণেই আমার জন্ম। হাসিমুখে তোমার জন্যে তিল তিল করে ওদের ঐশ্বর্য্য হরণ করে তিলোত্তমা হয়ে তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়ালুম···তুমি মনে-প্রাণে সেদিন আমায় বরণ করে বুকে নিলে!···তখন···ভাঙলো ওদের ঘুম। কিন্তু জেগে উঠে ওরা দেখে আমি তোমার মনে···আমি তোমার প্রাণে···আমি তোমার ঐ আঁখিতারার মাঝে!···ওরা আমায় খুঁজেই পেল না···খুঁজেই পেল না··হাঃ হাঃ হাঃ [পাগলের মত হাসিতে লাগিলেন]

অধ্যাপক॥ সর্বনাশ হল! আমার থিসিস্—

মনীষা॥ [তৎক্ষণাৎ বিরাট বিষণ্ন গাম্ভীর্যে] হাঁ, সর্বনাশ হল ঐ থিসিসে! সেই দিন ওরা ঐ থিসিসের অন্ধকারে পথ পেলে। আগে ওরা আমার ত্রিসীমানায়ও আসতে সাহস পায় নি। কিন্তু যেই ওরা দেখলে আমার চেয়ে তোমার কাছে থিসিস্ বড়···সেই দিন—সেই দিন থেকে তুমি যতই এক-পা এক-পা দূরে যাচ্ছ···ওরা এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে—[চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন] শেষে—অবশেষে—

অধ্যাপক ॥ অবশেষে তুমি পাগলই হলে মনীষা—

মনীষা ॥ [সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া] আজ ওদের আঙুল আমার মাথার চুলে কত খেলাই খেলে! ওদের ঠোঁট আমার মুখের কাছে কাঁপে! ওরা আমার পায়ে ধরে কাঁদে। কানে কানে চুপি চুপি ডাকে···আয়! আয়! আয়!···কিন্তু, তখন···তুমি—

অধ্যাপক ॥ হয়তো থিসিস্ লিখি, এবং সে থিসিস্ আজ আমাকে শেষ করতেই হবে, এই বাকি রাতটুকুর ভেতর, অতএব—

মনীষা ॥ তুমি যাবে?

অধ্যাপক ॥—না গিয়ে আমার উপায় নেই। অবশ্য এ ঘরেও লিখতে পারতুম, কিন্তু তোমার জ্বালায়—

মনীষা ॥ থিসিস্ই কি তোমার সব? আমি কি তোমার কেউ নই?

অধ্যাপক ॥ তুমি আমার স্ত্রী। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মনে এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা নেচে বেড়াচ্ছে! অমন প্রশ্ন আর ক'রো না, লোকে শুনলে হাসবে। নাও, জানালা বন্ধ করে দিলুম। এইবার তবে [ঘড়ির দিকে চাহিয়া] বা'রোটা বাজতে চলেছে—[ত্বরিতপদে পার্শ্বের কক্ষে প্রস্থান]

মনীষা ॥ শোন—শোন—

অধ্যাপক ॥ তুমি বলে যাও আমি লিখতে লিখতে শুনে যাচ্ছি।

মনীষা ॥ এই যে—এই যে! ওগো, তারা এসেছে! জানালায় তারা এসেছে—

অধ্যাপক ॥ আসুক—

মনীষা ॥ উঃ মাগো!

[চীৎকার করিয়া উঠিয়া ভয়ে তখনি পড়িয়া গেলেন]

*　　*　　*　　*

[দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপক তাঁহার কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন]

অধ্যাপক ॥—কে?

বাহির হইতে ॥ আমরা !

অধ্যাপক ॥ কে তোমরা ?

বাহির হইতে ॥ ঝড় উঠেছে, ধূলো মাটি উড়ছে ! আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বৃষ্টিও নামল। একসঙ্গে পঞ্চভূতের তাণ্ডব নৃত্য !

অধ্যাপক ॥ [ছুটিয়া মনীষার নিকট গিয়া] মনীষা—মনীষা—

[কোন উত্তর পাইলেন না]

* * * *

[এদিকে বাহিরের চাপে দরজাটি ভাঙিতে ভাঙিতে খুলিয়া গেল। অধ্যাপকের পঞ্চ ছাত্র…ক্ষিতীশ, অপরেশ, তেজেশ, মরুত্তম এবং ব্যোমকেশ ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং মনীষার চারিপাশে ঝুঁকিয়া পড়িল]

অধ্যাপক ॥ মনীষা—মনীষা—[পঞ্চ ছাত্র মনীষার দেহ স্পর্শ করিল]

পঞ্চ ছাত্র ॥—হয়ে গেছে। এখন এঁকে নিয়ে যেতে হবে—

অধ্যাপক ॥ কোথায় ?

পঞ্চ ছাত্র ॥ শ্মশানে !

[সন ১৩৩৮, ইং ১৯৩১]

অরূপ-রতন

ইঙ্গিত ঃ

বৃহদ্রথ···বৃদ্ধ কাশীরাজ।

জয়াদিত্য···কাশীরাজ-কন্যা লেখার সহিত সদ্যপরিণীত কোশলেশ্বর।

রেখানাথ···সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, চিত্রকূট জনপদের অধিপতি।

লেখা···কাশীরাজ-কন্যা।

সুলেখা···কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

মাধবিকা···রাজকন্যাদের অন্তরঙ্গ সখী।

এতদ্ভিন্ন···চিত্রকূট-দূত, সেনাপতি, রেখানাথের শিষ্য, ঘাতক।

স্থান এবং কাল ঃ—চিত্রকূট জনপদ-প্রান্তে কাশীরাজের শিবির। রাত্রিতে উদ্বোধন এবং ঊষাতে বিসর্জ্জন।

* * * *

[দৃশ্য।—রাজকীয় শিবির। শিবিরটি একটি বিরাট বস্ত্রাবাস। তাহার যে অংশ দেখা যাইতেছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে 'দরবার' দ্বিতীয়ভাগে 'অতিথি-নিবাস' এবং তৃতীয়ভাগে 'বিলাসকক্ষ'। প্রত্যেক কক্ষ অপর কক্ষের সহিত অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রায়তন দরজা দ্বারা সংলগ্ন। তদ্ভিন্ন সকল কক্ষের সম্মুখ দিয়াই বিস্তৃত অলিন্দ। সেই অলিন্দপথে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাতায়াত চলে। সকল কক্ষেরই সম্মুখে বিশালায়তন সুবিস্তৃত দরজা, তাহা কালো পরদা দ্বারা আবৃত। প্রয়োজন কালে সেই পরদা উত্তোলিত হয় এবং তখন কক্ষাভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়]

[শিবিরস্থ দরবার-কক্ষে বৃদ্ধ কাশীরাজ বৃহদ্রথ এবং তাঁহার নবজামাতা কোশলেশ্বর। সম্মুখে চিত্রকূট-দূত যুক্ত করে দণ্ডায়মান]

বৃহদ্রথ॥ দূত! তুমি অবধ্য; কিন্তু মনে রেখো তোমার প্রভু অবধ্য নয়।

দূত ॥ মহারাজ! দাস তা অবগত আছে। এ দাস শুধু তার প্রভুর বার্তা আপনার সকাশে নিবেদন করেই মুক্ত। কিন্তু, সেই যে নিবেদন—সে নিবেদন তো নির্ভয়েই করা বিধি।

বৃহদ্রথ ॥ নির্ভয়েই নিবেদন কর!

দূত ॥ আমাদের প্রভু কুমার রেখানাথ যে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, তা দেশবিদেশের সকল কলাবিদ্‌ই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, তৎপ্রবর্তিত চিত্রণপদ্ধতি আজ দেশবিদেশের চিত্রীমহলে প্রচলিত। অজন্তা গুহায় তাঁর পরিকল্পিত শিল্পৈশ্বর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে গুণগ্রাহী মগধ-সম্রাট, কুমার রেখানাথকে এই গিরি-মেখলা, নির্ঝরিণী-স্নাতা পরম রমণীয় চিত্রকূট জনপদ দান করেন।

জয়াদিত্য ॥ সে কথা সকলেই জানে। কাজের কথা বল।

দূত ॥ এ নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা যে তিনি আপনাদের উভয়ের বিরাগভাজন! সত্য বটে, তিনি নিতান্ত দুর্বল, নিতান্ত অসহায়, কিন্তু···কিন্তু বর্তমান যুগের শিল্প-জগতে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট—এ কথাও সত্য।

জয়াদিত্য ॥ আমি শিল্প-জগতের প্রজা নই, আমি বাস্তব জগতের রাজা! অর্থাৎ আমি দুর্ধর্ষ সৈনিক। আমি অপমান সহ্য করি না, অপযশ তুচ্ছ করি। আমার জয়যাত্রায় যদি পর্বতও প্রতিবন্ধক হয়, তবে সে পর্বত চূর্ণ ক'রেই চলে আমার অভিযান।

দূত ॥ আমি স্বীকার করি, কোশলেশ্বরের এ বৃথা দম্ভ নয়। আপনি আজ দেশের সার্বভৌম নরপতি।···কিন্তু···ঐ কাশীরাজ একদিন শিল্প-জগতের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন ব'লেই আজ এই বিরোধ।

জয়াদিত্য ॥ সরল ভাষায় কথা বল দূত! আমি শুনেছি কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের পূর্বে তাঁর চিত্র রেখানাথকে দিয়ে অঙ্কিত করিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, কন্যা স্বামীগৃহে গেলে সেই চিত্র তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। যথেষ্ট অনুনয় সত্ত্বেও রেখানাথ সেই চিত্র অঙ্কন করতে সম্মত হন নি।

বৃহদ্রথ ॥ শুধু তাই নয় দূত! তোমাদের কুমার আমার নিমন্ত্রণে, আমার রাজপ্রাসাদে এসে আমার কন্যাকে দেখলেন। দেখে বললেন আমার কন্যার

ছবি এঁকে তিনি তাঁর তুলির অমর্যাদা করতে চান না—এমনি বিরাট তাঁর দম্ভ !

দূত ॥ দম্ভ নয় ; তার কারণ আছে। তাঁর শেষ কীর্তি অজন্তাগুহার চিত্র-পরিকল্পন। তিনি রমণী-মূর্তি এত বেশী অঙ্কন করেছেন যে রমণী-মূর্তির ধ্যান করতে করতে হঠাৎ একদিন এমন এক অপরূপ সুন্দরীর সন্ধান পান যে, তারপর থেকে তিনি সেই মূর্তির রূপদান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই দিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যদি তিনি রমণী-মূর্তিই অঙ্কন করেন, তবে অঙ্কন করবেন সেই মূর্তি ; তা' না হলে তার চাইতে নিকৃষ্ট সৌন্দর্যের মূর্তি এঁকে তাঁর তুলির অমর্যাদা করবেন না।···আপনার কন্যা—

বৃহদ্রথ ॥ আমার কন্যা কোশলেশ্বর জয়াদিত্যের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত দেশবিদেশের রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক এ যুগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

দূত ॥ কিন্তু কুমার রেখানাথ বলেন যে আপনার কন্যার চাইতেও তাঁর সেই সুন্দরী আরো বেশি সৌন্দর্যের অধিকারিণী।

জয়াদিত্য ॥ আমার বধূ তাঁর সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য-গর্বকে পদদলিত করবেন বলেই তোমার কুমারের চিত্রকূট জনপদ আমি অবরোধ করেছি। যতক্ষণ তা না পারি, ততক্ষণ আমার বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না !

বৃহদ্রথ ॥ জানো দূত, আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য শ্রীমান জয়াদিত্য তাঁর বিবাহের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি শেষ করবার বিলম্বও সহ্য করেন নি। বিবাহ-রাত্রি প্রভাত হতেই তিনি আমাদের নিয়ে তোমাদের এই জনপদে ছুটে এসেছেন। এখনো তাঁর ফুলশয্যা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি ! আজ, আজ এই বিদেশে এই যুদ্ধ-শিবিরে, সেই ফুলশয্যার অনুষ্ঠান করতে হবে—এও কি কম পরিতাপের বিষয় !

জয়াদিত্য ॥ শোন দূত, আর কথাতে কাজ নেই ; কাল প্রভাতে তোমাদের শিল্পজগতের একচ্ছত্র সম্রাট এই বাস্তব জগতের সার্বভৌম সম্রাটের সম্মুখে হয় তাঁর সুন্দরীর শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য প্রদর্শন ক'রে আমাদের দর্প চূর্ণ করবেন, নয়, নিজে জয়াদিত্যের জয়যাত্রার রথচক্রে চূর্ণ হবেন।

দূত ॥ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই অপরূপার খোঁজ করেছেন আমাদের কুমার ; কিন্তু তবু দেখা তাঁর আর পান নি। তবুও কিন্তু কুমার রেখানাথ সেই অপরূপার রূপ-রেখার যে পরিকল্পনায় বিভোর, আমরা তার আভাস পাই তাঁর চোখে-মুখে, স্বরে, গানে, স্বপ্নে!···কাজেই আমি নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি না। কিন্তু তবু, আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কি শেষ কথা?

বৃহদ্রথ ॥ হাঁ, এই শেষ কথা।

জয়াদিত্য ॥ আজ আমাদের ফুলশয্যা। এই ফুলশয্যার রাত্রিটুকু তোমাদের কুমারের অবসর। তিনি এই অবসরে যেন তাঁর কর্তব্য স্থির করেন। নইলে আগামী প্রভাতে আমার সর্বপ্রথম কার্য হবে তোমাদের জনপদ অগ্নিদগ্ধ করা।

দূত ॥ তার প্রয়োজন নেই। আমরা আত্মসমর্পণ করেছি ; তবে কুমারের কথা স্বতন্ত্র। তিনিও আজ রাত্রেই তাঁর কর্তব্য স্থির করবেন। আপনারা আগামী প্রভাতেই তাঁর দর্শন পাবেন। যদি আর কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আজ রাত্রেই তিনি তা আপনাদের জানাবেন বলেছেন।···আমার অভিবাদন গ্রহণ করে এবার তাহলে আমায় বিদায় দিন।

[দূতের প্রস্থান]

জয়াদিত্য ॥ আমি বিস্মিত হয়েছি এই চিত্রকারের স্পর্ধা দেখে!

বৃহদ্রথ ॥ তার এই স্পর্ধা কাল প্রভাতে চূর্ণ করা চাই বৎস! অপরূপ-রূপসী আমার কন্যা—রাজন্যমণ্ডলে একথা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে। আমার লেখার একমাত্র তুলনা আমার শ্যালিকা-কন্যা সুলেখা। যেন দুইজনে দুইজনের প্রতিমূর্তি! যারা জানে না, তারা বলে লেখা আর সুলেখা দুই যমজ ভগিনী। প্রকৃতির এই খেয়ালে আমাদের বিপদের অন্ত নেই! তবু প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ তাদের মনে। একজন তেজোদৃপ্তা, আর একজন কুসুম-কোমলা। একজন দিনের রৌদ্র, আর একজন রাত্রির জ্যোৎস্না। এই প্রভেদটুকু না থাকলে কে যে লেখা আর কে যে সুলেখা আমিই চিনে উঠতে পারতুম না!

জয়াদিত্য ॥ না-চিনে-উঠতে পারবার ভয় আমিও প্রতিপদেই করে এসেছি ; সেই জন্যেই, আমি লেখাকে চোখে চোখে রেখেছি।

বৃহদ্রথ॥ চোখে চোখে রাখবার প্রয়োজন নেই। সুলেখা যখন আমার রাজসংসারে এসে দাঁড়াল, তখন সাদৃশ্যের এই গোলযোগ দূর করবার জন্যে, আমি আমার লেখার হাতে আমার রাজচিহ্নখচিত হীরকাঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিলুম। ঐ চিহ্নেই তুমি সব সময়ে তাকে চিনতে পারবে। রাজপুরীর সবাই ঐ চিহ্নে রাজকুমারীকে চিনে থাকে। এই গোলযোগ হ'ত না, যদি আমার শ্যালিকা বেঁচে থাকতেন। তিনি সুলেখাকে প্রসব করেই পরলোকে, আমার স্ত্রীর কাছে চলে যান! মরবার সময় তিনি তাঁর ঐ অনাথা কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে দুই মাতৃহারা কন্যাকে সমভাবে আমি লালন-পালন করে এসেছি। সুলেখা আমার কাছে লেখার চাইতে কিছু কম নয়।···যাক্ সে কথা। আমি যাই, ফুলশয্যার আয়োজন করি। আজ সে-কাজও আমাকেই করতে হবে; যাঁর করবার কথা, তিনি নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন!
[পরিচ্ছদের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অলিন্দপথে বিলাসকক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন]

[তিনি দৃষ্টিপথের অন্তরালে যাওয়া মাত্র রাজকন্যার সখিগণ দরবারকক্ষের দুই পার্শ্বস্থিত দ্বারপথে প্রবিষ্ট হইয়া চকিতে জয়াদিত্যকে নৃত্যদ্বারা আক্রমণ করিল। সেই নৃত্য-গীতে তাহারা জয়াদিত্যকে ফুলশয্যায় আবাহন করিতেছিল। নৃত্যগীতান্তে কাশীরাজকন্যা লেখা দরবারকক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বামীকে সহাস্যে অভিনন্দিত করিলেন এবং ইঙ্গিতে সখীকুলকে সে স্থান হইতে অপসারিত করিলেন]

লেখা॥ শুভরাত্রি।

জয়াদিত্য॥ শুভরাত্রি।

লেখা॥ ফুলশয্যা?

জয়াদিত্য॥ হাঁ, ফুলশয্যা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম আমাদের রাজসূয় যজ্ঞে, আমাদের নাটমন্দিরের সেই নৃত্য উৎসবে, সেইদিন রাত্রে আজকার এই ফুলশয্যা কল্পনা করেছিলুম! সেই কল্পনা প্রতিরাত্রে স্বপ্নময়ী হয়ে আমাকে ছলনা করেছে! দেশের শ্রেষ্ঠ বীর সেখানে, ঐ জায়গায় পরাজিত হয়েছে!··· কিন্তু আজ?

লেখা॥ ছলনা করেছে!···বটে! কি যে ছলনা নয়, কে যে ছলনা নয়, এই

ছলনার সংসারে তা বলা শক্ত।···হাঁ, শক্ত। প্রথমেই ধরুন আপনি বল্লেন, নাটমন্দিরের সেই নৃত্য-উৎসবে আপনি আমাকে প্রথম দেখেছিলেন। কিন্তু···

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু ?

লেখা ॥ কিন্তু সে কি আমাকেই দেখেছিলেন ?

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ···আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না !

লেখা ॥ সত্যি ?···কিন্তু শাস্ত্রে কি পড়েন নি যে, নিজের চোখে দেখেই অনেক সময় পণ্ডিতগণ রজ্জুকেই সর্প বলে ভ্রম করেন। করেন না কি ?

জয়াদিত্য ॥ তুমি কি বলতে চাও সেদিন আর কাউকে তুমি বলে ভ্রম করেছিলুম ?

লেখা ॥ আমি বলতে চাই, যদি সেদিন আপনি আমাকে না দেখে সুলেখাকে দেখে থাকেন ?

জয়াদিত্য ॥···কিন্তু তোমার হাতের হীরকাঙ্গুরীয়ক।

লেখা ॥ ও আপনার আত্ম-প্রবঞ্চনা। নয় কি ? হীরকাঙ্গুরীয়কের কথা আপনি আজ এই ক্ষণকাল পূর্বে পিতার কাছে জানতে পেরেছেন, সেদিন জানতেন না ! তারপরেও না !

জয়াদিত্য ॥ আমার কল্পনার সঙ্গে খেলা ক'রো না লেখা।···আমার সকল স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ো না, দিয়ো না। আমি তোমাকেই ভালবেসেছি লেখা। আর কাউকে নয় !

লেখা ॥ তবেই দেখুন। আমার এই রূপ আপনি ভালোবাসেননি ! কারণ আমারও যে রূপ, সুলেখারও সেই রূপ ! আপনি ভালবেসেছেন রাজকন্যার স্মৃতি !

জয়াদিত্য ॥ হাঁ, হয় ত তাই। কিন্তু তাতে কি কিছু আসে যায় ?

লেখা ॥ হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আমি ঠিক জানি না। কিন্তু লোকে যে স্মৃতিকেই ভালোবাসে তার জ্বলন্ত নিদর্শন আজ পেলুম ঐ পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে, যখন চিত্রকূট দূতের কথা শুনছিলুম !···সেই চিত্রকর কোন দিন হয়ত মুহূর্তের জন্যে কোন এক নারীকে দেখেছে ; আজও তার ধ্যানেই সে বিভোর !

তার সেই ধ্যান রাজকুলের শ্রেষ্ঠা রূপসীও ভঙ্গ করতে পারেনি, কাল প্রভাতে মৃত্যু-রাক্ষসী পারবে কিনা তাও জানি না !

জয়াদিত্য ॥ কাল প্রভাতের আর বিশেষ বিলম্ব নেই, অতএব শীঘ্রই তোমার কৌতুহল চরিতার্থ হবে ! এখন চল···ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করি !

লেখা ॥ ফুলশয্যা ? ফুলশয্যা ! হাঁ ফুলশয্যা । কিন্তু তার পূর্বে আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে । অনুমতি পেলে নিবেদন করি ।

জয়াদিত্য ॥ দয়া করে বল !

লেখা ॥ রাজসূয় যজ্ঞে যাকেই দেখে থাকুন আপনি রাজকন্যারূপে আমার স্মৃতিকেই ভালোবেসে আজ আমাকে আপনার বধূরূপে বরণ করেছেন ।···কিন্তু··· কিন্তু···

জয়াদিত্য ॥ নিঃসঙ্কোচে বল লেখা ।

লেখা ॥ কিন্তু আমার ভয় হয় ! হাঁ, আমি শিউরে উঠি !···অন্ধকার রাত্রে অন্ধকার কক্ষে···

জয়াদিত্য ॥ বল···বল লেখা !

লেখা ॥···যদি সুলেখাকে আপনি লেখা বলে ভ্রম করে বসেন !

জয়াদিত্য ॥ অন্ধকারেও হীরক জ্বলে !

লেখা ॥ তা আমিও জানি ! কিন্তু, তবু···তবু সুলেখা যদি···

জয়াদিত্য ॥ হাঁ বল···সুলেখা যদি—

লেখা ॥ কোনদিন আমার অজ্ঞাতে, ধরুন আমার ঘুমের মাঝে, আমার এই হীরকাঙ্গুরীয়ক চুরি করে হাতে দিয়ে,···পরে···

জয়াদিত্য ॥ এ যে বিষম সমস্যায় পড়লুম !···শোন । কালই আমরা কোশল যাত্রা করব । সেখানে আর তোমার সুলেখা রইবে না !

লেখা ॥ হাঁ ঠিক বটে !···হাঁ সেখানে সুলেখা রইবে না বটে ।···যাক ।··· কিন্তু, হাঁ, ঐ চিত্রকরের বড় দর্প । কাল প্রভাতে সে পরাজিত হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে । দিতেই হবে । কি শাস্তি ঠিক হয়েছে ?

জয়াদিত্য ॥ প্রাণদণ্ড···খুসী হবে ?

লেখা ॥ না···না···না। তা নয়, তা নয়! মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠ দণ্ড নয়।

জয়াদিত্য ॥ তবে?

লেখা ॥ আমার কথা থাকবে?

জয়াদিত্য ॥ আমি প্রতিজ্ঞা করছি অবশ্য থাকবে।···বল, কি দণ্ড তুমি দিতে চাও?

লেখা ॥ ঐ সুলেখার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে!

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সে কি?

লেখা ॥ আমার খেয়াল! সে রাজকন্যাকে তুচ্ছ করেছিল, এইবার অনাথাকে বধূ বলে বরণ করুক! সুলেখার হাত থেকেও আমি মুক্তি পাই!

জয়াদিত্য ॥ তুমি তবে তাকে এখনো চেন নি!—বেশ! সে যদি সুলেখাকে বিবাহ করতে অসম্মত না হয়, সুলেখা তারই বধূ হবে! এইবার চল···

লেখা ॥ আপনি অগ্রসর হোন। আমার সাজ-সজ্জা বাকি রয়েছে।

জয়াদিত্য ॥ শীগ্‌গীর এসো কিন্তু!

লেখা ॥ তাতে ত্রুটি হবে না।

জয়াদিত্য ॥ বেশ! আমি চললুম।

[অলিন্দপথে নেপথ্যে প্রস্থান]

[মাধবিকার প্রবেশ]

লেখা ॥ মাধবিকা!

মাধবিকা ॥ কি সখি!

লেখা ॥ আমার বিশ্বস্ততমা—প্রিয়তমা সখি!

মাধবিকা ॥ ওকি ভাই! তুমি অমন শিউরে উঠছ কেন?···ওকি! তোমার চোখ ছলছল কেন?

লেখা ॥ অরূপ-রতনের আশায় রূপসাগরে ডুব দিতে চলেছি!

মাধবিকা ॥ কি হয়েছে বোন, খুলে বল।

লেখা ॥ তোকে পূর্বেই যখন আভাস দিয়েছিলুম, তখন তুই আমার কথা রাখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলি। এইবার তার পরীক্ষা।

মাধবিকা॥ অক্ষরে অক্ষরে আমি তোমার কথা রাখব বোন! এখন কি করতে হবে বল!

লেখা॥ আজ ফুলশয্যা!

মাধবিকা॥ তার সময় হয়েছে। চল—

লেখা॥ কিন্তু আমি ফুলশয্যায় যাবো না।

মাধবিকা॥ তবে কি সই আমি যাবো?

লেখা॥ যাবে সুলেখা।

মাধবিকা॥ তবে তোমার সেই খেয়ালই বজায় রইবে!

লেখা॥ হ্যাঁ।

মাধবিকা॥ কিন্তু সুলেখা কি সম্মত হয়েছিল?

লেখা॥ তাকে আমি আজ সারাটি অপরাহ্ন বুঝিয়েছি, অবশেষে সে সম্মত হয়েছে। তোরা তাকে আমার ক্রীতদাসী বলে থাকিস, এমনি অনুগত আমার সে। —কিন্তু তোরা তাকে ভুল বুঝেছিস। প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসলেই ক্রীতদাসী হয়। সে আমার সেই ক্রীতদাসী। তা ছাড়া—

মাধবিকা॥ তা ছাড়া?

লেখা॥ [চুপিচুপি] সুলেখা জয়াদিত্যকে ভালবাসে।

মাধবিকা॥ সে কি!

লেখা॥ [হাসিয়া] একদিন আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। তা, আমি ওর দোষ দিই না। রূপে-গুণে, শক্তিতে-সাহসে, দুর্নিবার তার আকর্ষণ। তার ওপর সে সার্বভৌম নরপতি। ভালবাসা পেতেই তার জন্ম।

মাধবিকা॥ তবে তুমিও তাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসো।

লেখা॥ না। আমি ভালোবাসি তাকে, যে আমাকে ভালোবাসে না। নারী যার পূজা পায়, তাকে সে পূজা করতে চায় না; নারী পূজা করতে চায় তাকে, যে তাকে পূজা করে না।

মাধবিকা॥ তবে তুমি জয়াদিত্যকে ভোলনি?

লেখা॥ আমি যে চিত্রকরকে ভুলতে পারছি নে! নারীকে যে ভালোবাসে,

নারী তাকে হয়তো ভুলতে পারে, কিন্তু নারীকে যে আঘাত করে, নারী তাকে ভুলতে পারে না।

মাধবিকা॥ তুমি যা ভালো বোঝ কর। যা করতে বলবে, তাই করবো।

লেখা॥ হ্যাঁ বোন, তাই কর, তাই কর। আমার জন্যে ভেবো না। এই নাও অঙ্গুরীয়ক, এই অঙ্গুরীয়ক সুলেখাকে পরিয়ে দাও, আমার সাজে সাজিয়ে দাও। তাকে ব'লো শুধু আজকের রাতটুকুর জন্যে আমি ছুটি চাইছি। একটি রাত! শুধু একটি রাত!

মাধবিকা॥ বলব। কিন্তু কোশলরাজ যদি অঙ্গুরীয়ক সত্ত্বেও সুলেখাকে আর কোনরূপে চিনতে পারেন!

লেখা॥ কোশলরাজ স্মৃতির ধ্যান করেন। যাকেই তিনি পাননা কেন, মনে করবেন সে আমি, কাশীরাজ-কন্যা লেখা। তা ছাড়া, "অন্ধকারে হীরক জ্বলে" বলে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। [শিবিরপ্রান্তে সানাই বাজিয়া উঠিল] ঐ সানাই বাজছে!···ফুলশয্যার তান!—না বোন, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়, তুই যা ···শীগ্‌গীর! [তাহাকে অঙ্গুরীয়ক দিয়া অলিন্দপথে ঠেলিয়া দিলেন। মাধবিকা লেখার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়া পরে অদৃশ্য হইল]

[শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিতে লাগিল। একমনে লেখা তাহা শুনিতে লাগিলেন। পরে একবার আবার অলিন্দপথে বাহির হইলেন, আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দা টানিয়া দিয়া আত্মগোপন করিলেন। একাধিকবার এইরূপ করাতে মনে হইল তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এদিকে ফুলশয্যার শোভাযাত্রা অলিন্দপথ দিয়া ক্রমে বিলাসকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। লেখা ছুটিয়া গিয়া অতি সঙ্কোচে সেই জনতার সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ধূপ দীপ আলো, নানাবিধ যৌতুক প্রভৃতি বহন করিয়া সখীগণ,·বাহকগণ ও অনুচরগণ শোভা-যাত্রার পুরোভাগে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল। মধ্যভাগে ছিলেন বরণ-ডালা হাতে কুল-স্ত্রীগণ এবং ক্রমে জয়াদিত্য, অবগুণ্ঠিতা সুলেখা এবং বৃহদ্রথ।

বিলাসকক্ষে শুধু তাঁরাই প্রবেশ করিলেন, যাঁরা শোভাযাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন। কাশীরাজ ও কুলস্ত্রীগণ ·বর ও বধূকে আশীর্বাদ করিয়া পার্শ্বস্থ দ্বারপথে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সখীগণ বরণ ডালা হাতে লইয়া দুইপার্শ্বস্থ দ্বারপথে বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া সানাই বাদ্যের তালে তালে বর ও বধূকে আরতি অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিল। নাটকে গানের প্রয়োজন। অতএব সম্ভবতঃ তাহারা সময়োপযোগী গানও গাহিয়াছিল। তাহা শেষ হইলে ক্রমে তাহারা

অদৃশ্য হইল এবং বিলাসকক্ষের সম্মুখে পর্দা খুলিয়া পড়িল। শোভাযাত্রায় যাহারা বাহিরে ছিল, ততক্ষণে তাহারা অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সানাইও থামিয়া গেল।

অতিথি-নিবাসের সম্মুখস্থ দরজাপথের পর্দার আড়াল হইতে লেখা বাহিরে আসিলেন। কম্পিত-চরণে বিলাসকক্ষের পর্দাপথে উঁকি দিতে যাইয়াই সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে অলিন্দপথে ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে চিত্রকরসম্রাট রেখানাথ উপবেশন করিয়া আছেন। বোধ করি তিনি শোভাযাত্রার ভিড়ের মধ্য হইতে কোন সময়ে এখানে আসিয়া কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছেন। লেখা তাঁহাকে দেখিয়াই প্রথমে ছুটিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিয়া তাঁহার তন্ময়তা দূর করিলেন]

লেখা॥ আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রেখানাথ॥ আমার আশীর্বাদ। [হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

লেখা॥ আপনার পদস্পর্শে আমাদের এই দীন বস্ত্রাবাস ধন্য !

রেখানাথ॥ পরিহাসও তবে কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা করা যায় দেখছি ! ···হুঁ···কিন্তু···রাজা কোথায় ? অথবা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য ?

লেখা॥ রাজা শয়নকক্ষে এতক্ষণ নিদ্রাগত। আর কোশলেশ্বর তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে ফুলশয্যায় প্রেমরঙ্গে মত্ত। আপনার যা প্রয়োজন, যদি নিতান্ত অসঙ্গত না হয় তবে আমাকেই বলতে পারেন।

রেখানাথ॥ আপনি—

লেখা॥ আমি সুলেখা, কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

রেখানাথ॥ আমি আপনার কথা শুনেছি ; তবে দেখলুম আজ এই প্রথম। রাজকন্যা লেখার চিত্রাঙ্কনার্থ যখন আমি নিমন্ত্রিত হয়ে রাজপ্রাসাদে অতিথি ছিলুম, তখনি আপনাদের এই অশ্রুত-পূর্ব সাদৃশ্যের কথা শুনি। আর সেই সময় রাজকন্যার সেই হীরকাঙ্গুরীয়ক-অভিজ্ঞানের কথা জেনেছিলুম বলেই আজ আপনাকে রাজকন্যা লেখা বলে ভুল করব না।

লেখা॥ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ এই গভীর রাত্রে আপনার শুভ পদার্পণের উদ্দেশ্য ?

রেখানাথ॥ কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ! তবু আজ রাত্রের এই অনিয়ম ক্ষমা করা কি এতই কঠিন ?

লেখা ॥ আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। অসময়ে এই শুভাগমন কেন সেই কৌতুহল চরিতার্থ করতে চেয়েছিলুম। আপনিই বরং আমাকে ক্ষমা করুন!

রেখানাথ ॥ তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই, আপনাদের অভিভাবকগণের আমি দর্শন ভিক্ষা করি!

লেখা ॥ আমিও বৃথা কথা বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইনা। আপনার উদ্দেশ্য আমার নিকট বিবৃত করুন, তাহলেই তা' সিদ্ধ হবে। জানবেন আমিই তাঁদের প্রতিনিধি।

রেখানাথ ॥ তবে আপনিই শুনুন। কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। আজ এই সুন্দর ধরণী থেকে বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। স্নেহকাতর বৃদ্ধ কাশীরাজের মনে আমি যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছি, আজ আমাকে আমার সেই অনুতাপ থেকে মুক্ত হ'তে হবে। এই নিন রাজকন্যা লেখার প্রতিকৃতি।

লেখা ॥ [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া] সে কি! এ কি!...কই? [হাত বাড়াইয়া প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহা দেখিয়া] উঃ এ যে অবিকল প্রতিচ্ছবি!...কিন্তু, কিন্তু—তবে আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করলেন?...নিকৃষ্টতর সৌন্দর্য এঁকে আপনি পরাজয় স্বীকার করলেন?

রেখানাথ ॥ প্রতিমূর্তি নিখুঁত হয়েছে?

লেখা ॥ নিখুঁত, নিখুঁত! এতো শুধু প্রতিকৃতি নয় এ জীবন্ত মূর্তি।...যাক্ আমার সাধনা সফল হ'ল।...আজ তোমার এই পরাজয় কামনা করেই আমি তোমার শিল্প-কুঞ্জে অভিসারে চলেছিলুম—

রেখানাথ ॥...বিদায়! আমার শিষ্যের শ্রম সার্থক হয়েছে।...অতি যত্নে সে এঁকেছে! আমি আমার শ্রেষ্ঠ তুলি দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করব।

লেখা ॥ [সবিস্ময়ে]...এ চিত্র তবে তুমি আঁকনি?

রেখানাথ ॥ আমি?—হাঃ হাঃ হাঃ।

লেখা ॥ এ চিত্র আমরা নেব না...[সরোষে] ফেরত নাও...

রেখানাথ ॥—ফেরত নিতে হয়, শিষ্য নেবে; আমার কাজ শেষ হয়েছে।

শোন নারী ; আমার সুন্দরী তোমাদের দেখছে আর হাসছে !···ঐ যে চিত্র···ঐ চিত্রে, ঐ মধুমুখের ঐ চারু ওষ্ঠের একটি পাশে ছোট্ট একটি কালো তিল বসিয়ে দিলে ঐ চিত্র আরো শতগুণ সুন্দর হয়ে উঠত ! সেই যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের চাইতেও শতগুণ সুন্দর আমার সুন্দরী।···কাল প্রভাতের প্রতীক্ষায় আমি ভয় পাইনি !···আমার এই শিষ্যও তো ভয় পেতো না···সে শুধু ঐ ছবিতে একটি তিল বসিয়ে দিত !···কিন্তু আমার ভয়, আমি আমার সুন্দরীকে কাল প্রভাতে বিশ্বভুবনে তার মহিমার পরিপূর্ণ সমারোহে প্রকাশিত করতে পারব কি না !···আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত ; আমার তুলি চলে না ! রং সরে না !···দীর্ঘপথের যাত্রী আমি। সাথী নেই, দোসর নেই।···তবু চলেছি ! সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তারি উৎসাহে চলেছি ! চলব !

লেখা ॥ চিত্রকর ! বল···আরো বল···

রেখানাথ ॥ "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা করে !"

লেখা ॥ চিত্রকর ! চিত্রকর !···তুমি কি যাদুকর ?

রেখানাথ ॥ আমি চল্লুম। আজ এই রাত্রিটুকু আমাকে অমানুষিক শ্রম করতে হবে। আমার মাথার ভেতর রূপের আগুন জ্বলছে। হয়তো সে আগুন বিশ্ব আলোকিত করবে, না হয়, তাতে আমার সত্বা ভস্মীভূত হবে।···কিন্তু তবু এর শেষ দেখব ! মরতে হয় মরব, স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরলোকে যাবো··· সেখানে আবার চেষ্টা করব, না পারি আবার মর্তে নেমে আসবো ! যুগে যুগে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার এই সাধনা চলবে।

লেখা ॥ চিত্রকর ! চিত্রকর ! তোমার সুন্দরীর কথা বল—

রেখানাথ ॥ সময় নেই, সময় নেই। আমার শেষ কথাটি তোমাকে বলে যাই ! রাজকন্যা লেখাকে বলো সে যেন আমাকে ভুল না বোঝে। যদি আমি কাল প্রভাতে জয়ী হই, বিশ্বভুবন বুঝবে কি সৌন্দর্যে আমি মত্ত মাতাল হয়ে রয়েছি ! আর যদি পরাজিত হই, তবু রাজকন্যা লেখাকে আমি আমার সুন্দরীর আভাস দিয়ে যাব। চিত্রপটে আমি তার রূপরেখা যতটুকু ফোটাতে পারি,

সেইটুকু লেখাকেই উৎসর্গ করে যাব।—সেই হবে আমার জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ! লেখা সেই রূপরেখা ধ্যান করতে করতে আরো সুন্দর হবে, আরো অপরূপ হবে।

লেখা॥ লেখাকে এই উপহার কেন?

রেখানাথ॥ আমি জানি সে আমাকে ভালো বেসেছে! [বলিয়াই চকিতে অলিন্দ-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লেখা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন]

[মুহূর্তে সেখানে ত্বরিতপদে মাধবিকা আসিয়া বিস্ময়াভিভূতা লেখাকে স্পর্শ করিয়া সচকিত করিল]

মাধবিকা॥ তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ?—সরো···সরো···ছুটে পালাও! ওরা এখানে উঠে আসছে।

লেখা॥ কারা?

মাধবিকা॥ বর এবং বধূ।

লেখা॥ তুমি জানলে কেমন করে?

মাধবিকা॥ আমি আড়ি পেতে বসেছিলুম। ওদের সব প্রেমালাপই শুনেছি। এখন ওদের বেড়াতে সখ হয়েছে। ঐ জ্যোৎস্না উঠেছে। বসন্ত সমীরণ ভেসে আসছে! প্রেম-সাগরে তুফান উঠেছে।

লেখা॥ কবিত্ব থাক। শোনো—

মাধবিকা॥ বলো—

লেখা॥ আমার ঘরে চল, সুলেখাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু নিজমুখে তা বলতে সাহস পাচ্ছি না। লজ্জা হচ্ছে। তুমি আমার দূতী হ'য়ে তাকে তা নিবেদন কর।

মাধবিকা॥ কিন্তু তাকে একলা পাবার সুযোগ পেলে হয়। ঐ তারা আসছে!—চল······পালাই [লেখার হাত ধরিয়া অতিথি-নিবাসে আত্মগোপন]

[কিছু পরে, সুলেখা ও জয়াদিত্য হাত-ধরাধরি করিয়া অলিন্দ-পথে দরবারকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

জয়াদিত্য ॥ এই জ্যোৎস্না-রাত্রে তুমি আমার কোলে মাথা রেখে গান গাও, আমি শুনি !

সুলেখা ॥ গান নয়। তুমি গল্প কর আমি শুনি। তোমার যুদ্ধজয়ের কাহিনী বল, তোমার কীর্তি কাহিনী বল, দেশের সার্বভৌম নরপতি তুমি, কি তোমার গৌরব, কি তোমার গর্ব, আমাকে বল···আমি শুনব !

জয়াদিত্য ॥ বল্‌ব। সব বলব।···কিন্তু আমি কি শুধু বলবই ? শুনব না ?

সুলেখা ॥ বেশ, তবে শোন···

[সুলেখা গান গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে জয়াদিত্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন]

সুলেখা ॥ [গীতান্তে] একি ! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ ? [কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ঘুমন্ত সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া] না থাক !···সারাদিন যুদ্ধোদ্যমের শ্রমে ক্লান্ত তুমি···ঘুমোও। আমি গান গাই। সেই স্বপ্নের গান, যার আরম্ভও জানিনা কখন যে ভেঙ্গে যাবে তাও জানিনা !···কি রহস্যময় এই স্বপ্নের জীবন, অথবা জীবনের স্বপ্ন ! [তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতি শঙ্কিত চরণে মাধবিকা আসিয়া সুলেখার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুলেখা চমকিয়া উঠিলেন]

সুলেখা ॥ কি ?

মাধবিকা ॥ চুপ ! [নিম্নকণ্ঠে] শুনে যাও—

সুলেখা ॥ কোথায় ?

মাধবিকা ॥···নির্জনে !···চল ঐ বিলাস-কক্ষে—

সুলেখা ॥ [অঙ্গুলি নির্দেশে জয়াদিত্যকে দেখাইলেন]

মাধবিকা ॥ ঘুমিয়ে রয়েছেন, থাকুন।···ওঁকে না জাগানোই ভাল।—জাগালে আমাদের কথা কইবার সুযোগ হবে না, অথচ বড় জরুরী কথা—

সুলেখা ॥ কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে ?

মাধবিকা ॥ তুমি এসে শুনে যাও বোন !

[নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সুলেখা মাধবিকার পশ্চাদ্‌বর্তিনী হইলেন। যাইবার সময় দরবার-কক্ষের পর্দা টানিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহারা অলিন্দপথে গিয়া বিলাসকক্ষের পর্দা অপসারিত করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

সুলেখা ॥—কি বোন ?

মাধবিকা ॥ লেখার কাজ শেষ হয়েছে।

সুলেখা ॥ কিন্তু, কিন্তু,···রাত কি ভোর হয়েছে ?

মাধবিকা ॥ না এখনো বিলম্ব আছে। শোন বোন! কাল প্রভাতে চিত্রকর রেখানাথ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হবেন। আজ রাত্রে সেই মৃত্যুপথ-যাত্রীকে পরীক্ষা করবার জন্য লেখা, তোমার হাতে তার আজ রাত্রির পত্নীত্ব সমর্পণ ক'রে অভিসারিকা সেজেছিল—হাঁ, এ অভিসারিকা ভিন্ন আর কি!

সুলেখা ॥ [আপন মনে] চন্দ্রমা তো এখনো অস্ত যায় নি!

মাধবিকা ॥ লেখার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে!

সুলেখা ॥ কিন্তু আমার স্বপ্ন তো এখনও শেষ হয়নি!

মাধবিকা ॥ শোন বোন—

সুলেখা ॥ না···না···ব'লো না, ব'লো না···রাত্রি শেষ হোক, তাঁর ঘুম ভাঙুক···

মাধবিকা ॥ সুলেখা!

সুলেখা ॥ চুপ!

মাধবিকা ॥ তবে শোন—

সুলেখা ॥ বল,···বল···না, না ব'লো না!

মাধবিকা ॥···তুমি বুঝেছ! ··লেখা এখন তোমার হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ক ফেরত চায়—

সুলেখা ॥ ওঃ! [আর্তনাদ করিয়া সুখাসনে এলাইয়া পড়িলেন]

মাধবিকা ॥ সুলেখা! সুলেখা! আমি ঐ পর্দার আড়ালে যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম···ওঠ···আত্মসংবরণ কর···অঙ্গুরীয়ক দাও···

সুলেখা ॥ না-না-না—। [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা ॥ সে কি!

সুলেখা ॥ পারি না, পারব না। তাঁকে ছেড়ে দিতে পারব না, তিনি আমাকে ভালবেসেছেন! তিনি আমাকে তাঁর ইহকাল পরকাল নিবেদন করেছেন,

আমি তাঁকে আমার জীবন মন সমর্পণ করেছি! এ তো একদিনের, এক রাত্রির ভালবাসা নয় সখি!

মাধবিকা॥ মনে রেখো তুমি তার পত্নী নও।

সুলেখা॥ হাঁ, মন্ত্রপাঠ হয়তো হয়নি! কিন্তু ··না-না-না—এ যে কিসের বন্ধন আমি বলতে পারব না!

মাধবিকা॥ লোকে বলবে এ ব্যভিচার।

সুলেখা॥ রাধিকার এই ব্যভিচার তাঁর মাথার মণি ছিল, আমার এই ভালোবাসা আমারও মাথার মণি!

মাধবিকা॥ কিন্তু কথার তো আর সময় নেই! তুমি তবে রাজকন্যার প্রস্তাবে সম্মত নও?

সুলেখা॥ না—না—না! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা॥ জীবনে বোধ করি এই প্রথম তোমাব ভগিনীর অবাধ্য হ'লে।

সুলেখা॥ ওঃ [মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

মাধবিকা॥ মূর্খ তুমি! জয়াদিত্য তোমাকে ভালোবাসেনি, ভালবেসেছে রাজকন্যাকে। তাঁর ধারণা তুমিই রাজকন্যা। যে-মুহূর্তে জানতে পারবে যে তুমি রাজকন্যা নও—সুলেখা, সেই মুহূর্তেই···

সুলেখা॥ [চমকিয়া উঠিয়া] সে কি?

মাধবিকা॥ হাঁ, সেই মুহূর্তেই তিনি তোমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করবেন। যাও দেখি তুমি তাঁর কাছে একবার ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে'!

সুলেখা॥ না—না—না! তা কি সে পারে! সে আমাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছে—বলেছে, ওগো রাণি! যুগ-যুগান্তেও, জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমি তোমারই!

মাধবিকা॥ অবোধ তুমি! নিতান্ত সরলা তুমি! তোমার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। এখনও সাবধান হও!···একবার গিয়েই দেখ না, তাঁর কাছে ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ ক'রে!

সুলেখা॥ হাঁ, যাব। তাতে আমার ভয় নেই! আমি তাঁর কালো চোখে

তাঁর মনের অন্তরতম কথাটি পর্যন্ত পড়েছি···হাঁ যাব। এই নাও তোমার অঙ্গুরীয়ক [অঙ্গুরীয়ক দান] আমি চললুম! আমি তাঁকে সব খুলে বলব! তবু দেখবে সে আমারি, আমি তাঁরি! [উদ্‌ভ্রান্তভাবে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মাধবিকা তাঁহার এই উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া রহিল। তাহার চমক ভাঙ্গিল তখন, যখন পরে লেখা আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন]

লেখা॥ অঙ্গুরীয়ক?

মাধবিকা॥ নাও···[অঙ্গুরীয়ক দান]···কিন্তু প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি!

লেখা॥ আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। কিন্তু কি করব! উপায় নেই! অরূপ-রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি। কি পাব কে জানে?···

মাধবিকা॥ সুলেখা সেজে তবে আশা মিটল না?

লেখা॥ মিট্‌ল না! মিট্‌ল না!···কোথায় যে কি পাব কে জানে! আলেয়ার আলো লুকোচুরি খেলছে! তারি পেছনে ছুটেছি আবার এই অঙ্গুরীয়ক নিয়ে। হয়তো তার উপহার পাবো।···কিন্তু পাবো কি না তাই বা কে জানে! ওগো, এই কি মরীচিকা? মাধবিকা! মাধবিকা! মৃগতৃষ্ণিকার অর্থ জানিস?

মাধবিকা॥ রাত্রি শেষ হয়ে এল। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও লেখা!

লেখা॥ ঘুম? আজ রাত্রে ঘুম?···জীবনে আর ঘুম আছে কি না তাই বা কে জানে! ··না, না···আমি চললুম! এইবার জয়াদিত্যের পরীক্ষা। আমার ভাগ্যের জাল আমি নিজে বুনে যাচ্ছি! সেই জালে কে জড়িয়ে মরবে জানিনা! ···আমি নিজে? না জয়াদিত্য? না চিত্রকর?

[বিহ্বলভাবে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; মাধবিকাও তাঁহার অনুবর্তিনী হইল। প্রহর শেষের সানাই বাজিয়া থামিয়া গেল]

[ইহার পর দেখা গেল দরবার-কক্ষের পর্দা সরাইয়া সুলেখা ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত জয়াদিত্যকে জাগাইলেন]

সুলেখা॥ জাগো! ওগো জাগো! জাগো!

জয়াদিত্য ॥ কে ?

সুলেখা ॥ বল দেখি কে ! [দীপ নিভাইলেন]

জয়াদিত্য ॥ আমি দেখেছি !···তুমি আমারই হাতের লেখা ! কিন্তু লেখা ! অন্ধকারে এ আবার তোমার কি খেলা ?

সুলেখা ॥ আলোতে নির্ভয়ে কথা বলা যায় না। আলোতে সত্য কথা দীপ্তি পায় না। অন্ধকারেই আজ আমাদের হৃদয় খুলতে হবে। আমি একটা দুঃস্বপ্নের কথা যদি তোমার কাছে বলি—

জয়াদিত্য ॥ তুমি কি ভয় পেয়েছ রাণি ?

সুলেখা ॥ ভয় পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি···বলব ?

জয়াদিত্য ॥ বল।

সুলেখা ॥ কিন্তু মনে কর আমি রাজকন্যা নই, আমি কোন অভাগিনী ভিখারী !

জয়াদিত্য ॥ রাণী হ'তে হলে যে রাজকন্যা হতেই হবে, একথা তোমাকে কে বললে লেখা ? আর ও কষ্ট-কল্পনারই বা প্রয়োজন কি ?

সুলেখা ॥ আজ যদি আমি বলি, আমি লেখা নই, আমি সুলেখা—

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! অন্ধকারেও হীরক জ্বলে ! তোমার হাতের ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ক ঘোষণা করবে কে তুমি···কিন্তু একি ! তোমার অঙ্গুরীয়ক ?

সুলেখা ॥ নেই ! নেই ! ওঃ ! [আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

[সহসা দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল সুলেখার পার্শ্বে মাধবিকা দাঁড়াইয়া আছে]

মাধবিকা ॥ সখি, এই তোমার হীরকাঙ্গুরীয়ক। [তাহার হাতে পরাইয়া দিতে দিতে]···তুমি হারিয়েছিলে, তোমার বোন পেয়ে আমাকে দিয়ে তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন !

সুলেখা ॥ ওঃ ! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

জয়াদিত্য ॥ মাধবিকা ! মাধবিকা ! জল আনো ! ব্যজন কর—

[সম্মুখস্থ পর্দা পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত শিবির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। করুণ সুরে সানাই বাজিতে লাগিল। ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিবিরের

সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দিয়া একদল বৈতালিক প্রভাতী গাহিয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল তখন প্রভাত হইয়াছে। পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষের পর্দা সরিয়া গেল। জয়াদিত্য কাশীরাজ, বৃহদ্রথ, এবং মন্ত্রী দরবার-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন]

বৃহদ্রথ ॥ তোমার প্রভু কোথায় ?

দূত ॥ তিনি তাঁর চিত্রশালায়।

জয়াদিত্য ॥ তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার চিত্র কই ?

দূত ॥ [নতশিরে নীরব রহিল]

জয়াদিত্য ॥ তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার চিত্র কোথায় ?

দূত ॥ [তথাপি পূর্ববৎ নীরব]

বৃহদ্রথ ॥ এই মুহূর্তে উত্তর চাই ! বল দূত ! অবিলম্বে, নইলে—

দূত ॥ আমার যা বলবার আছে আমি নির্ভয়েই বলব।

জয়াদিত্য ॥ কথা রাখ।...বল, কোথায় তার সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার প্রতিমূর্তি ?

দূত ॥ তিনি তা অঙ্কন করতে অক্ষম হয়েছেন।

জয়াদিত্য ॥ তা আমি বহু পূর্বেই জানতাম !

বৃহদ্রথ ॥ আমিও তা পূর্বেই জানতাম ! কিন্তু শুধু অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেই তো চলবে না, আমার কন্যার বিশ্ববিজয়ী রূপের অমর্যাদা করবার গুরু অপরাধের দণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে। মন্ত্রী, সেনাপতির প্রতি আদেশ ছিল ঊষা সমাগমেই সেই চিত্রীকে বন্দী করতে। আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে কিনা দেখুন—

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

দূত ॥ স্মরণ রাখবেন কুমার রেখানাথ যুগ-প্রবর্তক চিত্রশিল্পী। এই প্রতিভা অকালে ধ্বংস করলে ভবিষ্যৎ মানব-সমাজও আপনাকে ধিক্কার দেবে, আপনাকে অভিশাপ দেবে—

বৃহদ্রথ ॥ সে আমার কন্যার অপরূপ রূপকে অপমান করেছে। অন্য কেউ এ অপমান করলে ক্ষমা করা যেত, কিন্তু ঐ যুগপ্রবর্তক শিল্পী আমার যুগবরেণ্যা

কন্যাকে অপমান করেছে, যুগান্তরেও লোকে ইতিহাসের কল্যাণে এ কথা না জেনে ছাড়বে না। আমি শুদ্ধ সেই জন্য সেই অপরিণামদর্শী চিত্রকরকে ক্ষমা করতে অক্ষম!

[চিত্রহস্তে লেখার প্রবেশ]

লেখা॥ ক্ষমার প্রয়োজন নেই পিতা। সে চিত্র দিয়ে গেছে। আর, সে-চিত্র আমাদের রূপগর্ব চূর্ণ করেছে।...এই দেখুন—[বৃহদ্রথের হস্তে চিত্রদান]

বৃহদ্রথ॥ একি! মা সুলেখা! এ চিত্র তুমি কোথায় পেলে?

লেখা॥ সে কাল রাত্রে, ফুলশয্যার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় এই চিত্র আমাদের উদ্দেশে নিবেদন করে গেছে।

বৃহদ্রথ॥ দেখ দেখি বৎস! [চিত্রখানি জয়াদিত্যের হস্তে দিলেন]

জয়াদিত্য॥ কিন্তু...এ যে রাজকন্যা লেখার মুখখানিই মনে করিয়ে দেয়!

লেখা॥ হাঁ রাজা!...ও লেখা-সুলেখারই প্রতিমূর্তি; কিন্তু ঐ ছবির মুখ-সৌন্দর্য আরো শতগুণে ফুটে উঠেছে ঐ চারু ওষ্ঠের পাশে ঐ ছোট্ট কালো তিলটিতে—যা আমাদের কারো নেই!

বৃহদ্রথ॥ সত্য?

জয়াদিত্য॥ [অধোমুখে] সত্য।

লেখা॥ [পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] এইবার আমাকে বিদায় দিন!

বৃহদ্রথ॥ সে কি মা!

লেখা॥ মনে মনে আমি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছি!...এইবার তাঁর পথেরই পথিক আমি।

বৃহদ্রথ॥ সে কি কথা মা!...আসুক সে, সে কি বলে শুনি!

[সেনাপতি ও রেখানাথের শিষ্যের প্রবেশ]

বৃহদ্রথ॥ একি সেনাপতি! তুমি একা কেন? রেখানাথ কোথায়?

সেনাপতি॥ জীবনের পরপারে।

লেখা॥ [পাংশু হইয়া] সে কি!

সেনাপতি ॥ আমি যখন তাঁর দেখা পেলুম, তখন তাঁর শেষ মুহূর্ত !...

শিষ্য ॥ মৃত্যুকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করলেন, কিন্তু কেন করলেন—আমি তাঁর প্রধান শিষ্য—আমিও জানি না।

লেখা ॥ আমি জানি ! আমি জানি ! ওঃ ! [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অব্যক্ত বেদনায় অভিভূত হইলেন]

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু তবে কি সে-ই আমাদের পরাজিত করে চলে গেল ?...বল সেনাপতি, এখনও ছুটে গেলে কি তার সঙ্গে দেখা হয় ?

সেনাপতি ॥ তাঁর আত্মা নশ্বর দেহ বহুক্ষণ ত্যাগ করেছে।

বৃহদ্রথ ॥ বৎস...যাবে ?

জয়াদিত্য ॥ হাঁ যাব। সার্থক তাঁর দম্ভ। তাঁর জীবনের দম্ভ মরণে গগণ-স্পর্শী হয়েছে। সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হয়েছে। আসুন পিতা...তাঁর মৃত দেহের সম্রাটোচিত সৎকার-ব্যবস্থা করি।

বৃহদ্রথ ॥ চল...

[একটি মৌন বেদনা সকলের চোখেমুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহারা রেখানাথের মৃত্যু-বাসরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু লেখা আর রেখানাথের সেই শিষ্য]

শিষ্য ॥ আপনিই কি রাজকন্যা লেখা ?

লেখা ॥ না—না—না !

শিষ্য ॥ তবে আমার গুরুর এই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ দান...এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি রাজকন্যার হাতে দেবেন...আমি আর বিলম্ব করতে পাচ্ছিনা !

লেখা ॥ দিন। [পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় চিত্রগ্রহণ]...সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য এই চিত্রে লুকিয়ে আছে !...আমি খুলব ! আমি দেখব ! হাঁ, আমার অধিকার আছে ! [চিত্র আচ্ছাদন-মুক্ত করিলেন]...কিন্তু, কিন্তু...এ কি !

শিষ্য ॥ কি ?

লেখা ॥ [চিত্রপট দেখাইয়া] চিত্রপট...শূন্য...সাদা...সম্পূর্ণ সাদা !...এতে রেখামাত্র পড়েনি !...

শিষ্য ॥ ঐ হচ্ছে অরূপ-রতনের অরূপ চিত্র! রেখা দিয়ে তা আঁকা যায় না… গেলে, জগতে একমাত্র তিনিই তা আঁকতে পারতেন।—পরাজয়ের অভিমানেই তিনি জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বিদায় দেবি! বিদায়।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান]

লেখা ॥ অরূপ-রতন! অরূপ-রতন! [শূন্যে চাহিয়া] তুমিও আজ আমার অরূপ-রতন! তোমাকে প্রণাম! তোমাকে প্রণাম।

[ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৩৩]

বসুন্ধরা

কলিকাতার উপকণ্ঠে দ্বিতল একখানি গৃহের নিম্নতলস্থ উপবেশন কক্ষ। খুব দামী না হইলেও সুরুচিসঙ্গত সাজসজ্জায় উপবেশন কক্ষটি সুসজ্জিত। দেখিলেই বোঝা যায় ইহা কোন চিত্র-শিল্পীর কক্ষ। সম্মুখে ক্ষুদ্র বারান্দা। বারান্দার নিম্নে উপবেশন-কক্ষের সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে সদর দরজা।

বেলা অপরাহ্ণ। দেখা গেল উপবেশন কক্ষ হইতে বেলিফ তাহার লোকজন এবং দুই তিন জন ভদ্রলোক বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্বামী রঞ্জিত বসু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জিতের ভৃত্য মধু প্রাঙ্গণে নামিয়া গেল।

বেলিফ ॥ [সঙ্গীয় এক ভদ্রলোকের প্রতি] পজেসন (Possession) হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই [রঞ্জিতকে দেখাইয়া] উনি বাড়ী ভেকেট্ (vacate) করে দেবেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার নতুন ভাড়াটে এখানে আজই পাঠাতে পারেন। [রঞ্জিতকে] কি বলেন মশাই ?

রঞ্জিত ॥ হাঁ, সন্ধ্যার পর।

বেলিফ ॥ সদর দরজায় আমার লোক পাহারা রইল। আসুন। [তাহারা চলিয়া গেল। ভৃত্য দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইল। রঞ্জিত উপবেশন-কক্ষে গিয়া তাহার আসনে বসিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। মধু দরজায় দাঁড়াইয়া বাহিরে উঁকি দিয়া কি দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রঞ্জিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই···]

রঞ্জিত ॥ [মধুকে কোন কথা বলিতে অবসর না দিয়া] হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না মধু! ক'টা বাজে খেয়াল আছে? রাণী যে এখনি আসবে—

মধু ॥ কি করতে হবে দাদাবাবু ?

রঞ্জিত॥ কি করতে হবে! কেন, রাণী স্কুলে যাবার সময় কিছু বলে যায় নি?

মধু॥ স্কুল ছুটির পর তাঁর সঙ্গে স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস ছবি দেখতে আসবেন।

রঞ্জিত॥ শুধু আসবেন! তাঁদের চা দিতে হবে না? রাণী বলে নি?

মধু॥ বলেছেন। কিন্তু—

রঞ্জিত॥ স্কুল ছুটির আর বেশি বাকি কি?

মধু॥ শুধু চা তো আর চলবে না!

রঞ্জিত॥ তাই কি চলে মধু? কোনোদিন তা চলেছে? ···ও, টাকা?

মধু॥ [মুখ নত করিল]

রঞ্জিত॥ [হঠাৎ তাহার হাতঘড়ি ও দেওয়াল ঘড়িটা দেখিয়া] দেখেছ! আবার তিন মিনিট স্লো! নাঃ আর পারলুম না। এটা আর কোন মতেই হাতে রাখা চলল না। যাও তো মধু, রমেশকে এটা দিয়ে এস—রমেশ··· চোরাবাজারে যার কারবার···আঃ—আমাদের এই গলির মোড়ে যার বাসা,—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে আছে। গেলেই নেবে—সঙ্গে সঙ্গে তোমায় দশটা টাকা দেবে—টাকা কয়টি নিয়েই কেকের দোকানে ছুটবে—

মধু॥ আপনি বলছেন কি দাদাবাবু? এটা যে আপনার বিয়ের ঘড়ি! দামী ঘড়ি! স্লো যাচ্ছে এটা? আর ঠিক চলছে ঐ সাতটাকার জাপানী ঘড়ি?

রঞ্জিত॥ তোমার সঙ্গে তো আমি বক্‌তে পারব না মধু! যা বলব তা যদি না শোন, তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই। [ঘুরিয়া বসিয়া তুলিতে রঙ নিল]

মধু॥ আর ঘড়িটা বাইরে নিয়ে যেতেই বা দেবে কেন? বাইরে যা পাহারা—

রঞ্জিত॥ চুরি করে কিছু করা হচ্ছে না মধু। বে-আইনীও নয়!···পাহারাকে এ কথা বলা আছে। [একটু থামিয়া] এই ঘড়িটার ওপর তোমার যে মমতা দেখছি···আমার ওপর তোমার ততটুকু মমতা থাকলে তোমাকে আমার এতকথা বলতে হত না মধু!

মধু ॥ [হাতঘড়িটা তুলিয়া লইয়া] শুধু কেক্, না আর কিছু ?

রঞ্জিত ॥ যেন তুমি এ বাড়ীতে কাউকে চা খাওয়াও নি মধু ! [মধু যাইতেছিল] শোন—[চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া] রাণী এ সব কিছুই জানে না। তুমি তাকে কিছু বলো না মধু।

মধু ॥ কেউ কিছু না বললেও বুঝতে আজ কিছুই বাকি থাকবে না দাদাবাবু !

রঞ্জিত ॥ যা বলতে হয় আমিই বলব। নতুন বাসা আমি দেখে রেখে এসেছি। সন্ধ্যার আগে যদি এই ছবিটা শেষ করতে পারি, কিছু টাকা আজই পাব ···এবং পেলে আজ রাত্রেই সে বাসায় উঠে যাব। তুমি এস মধু—ছবিটা আমাকে এখনি শেষ করতে হবে। [মধু চলিয়া গেল। রঞ্জিত তাহার কাজে মন দিল। হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে সে সদর দরজার অন্তরালে গিয়া গোলমালটা বুঝিতে চেষ্টা করিল]

পাহারা ॥ না—না—এ চলবে না—চলবে না—

মধু ॥ শোন—শোন—[ফিস্ ফিস্ করিয়া সে কি কহিল]

পাহারা ॥ কই, দেখি।

[মধু বোধ হয় কিছু দেখাইল]

পাহারা ॥ হাঁ, এটার কথা বলা আছে। শুধু এই ঘড়িটা, আর কিছু না। হাঁ, আচ্ছা, ওটা নিয়ে যেতে পার।

[মধু চলিয়া গেল, বোঝা গেল]

···[রঞ্জিত ধীরপদক্ষেপে উপবেশনকক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার কি মনে হইল। সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। চাপাগলায় পাহারাকে কি কহিল। পাহারা উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল :—]

পাহারা ॥ আচ্ছা—আচ্ছা তাই হবে বাবু। ওদের আমি কিছু বলব না। দেখবেন দাঁড়িয়ে সেলাম করব। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেবেন না বাবু। আচ্ছা —আচ্ছা—আপনি যান—ভাবেন না।

[রঞ্জিত উপবেশনকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাজে মন দিল এবং মাঝে মাঝে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিল—]

পথ হারিয়ে গেছে আমার হাটের জনতায়।

কোন দেশে মোর সোণার কুড়ে বলরে কে গো হায়॥

[পা টিপিয়া টিপিয়া ধ'রে ধীরে রাণী বাহির হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে চাপা হাসি। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ রঞ্জিতের গুণ গুণ গান শুনিল—ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। রঞ্জিত একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল—রাণী তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। দেশলাইএর বাক্সটি লইয়া তাহা হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া তাহা রঞ্জিতের কাণের কাছে ধরিয়া জ্বালাইবার উপক্রম করিয়া—চীৎকার করিয়া উঠিল 'বাঃ'। রঞ্জিত চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেই রাণী তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের সামনেই দেশলাইটি জ্বালিয়া দিল। রঞ্জিত পুনরায় চমকিয়া উঠিয়া মুখ সরাইয়া লইতেই—তাহার চেয়ার উল্টাইয়া যাওয়ার মতো হইল। রঞ্জিত ভূপতিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল]

রাণী॥ [খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, চট্ করিয়া থামিয়া গিয়াই রঞ্জিতের দিকে পিছন ফিরিয়া] আমি দেখি নি—আমি কিছু দেখি নি—আমি এখানে ছিলুম না। আমি কিছু দেখিনি—আমি এই দেওয়াল। দেওয়ালের কান আছে কিন্তু চোখ নেই, হাঁ—

রঞ্জিত॥ [উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে রাণীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল]

রাণী॥ উঃ ছাড়ো—হেড্‌মিসট্রেস! হেড্‌মিসট্রেস!

[রঞ্জিত 'হেড্‌মিসট্রেস' শুনিয়াই চট্ করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইল]

রঞ্জিত॥ [প্রাঙ্গণে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া] কই হেড্‌মিসট্রেস?

রাণী॥ তাঁর বাড়ীতে। [মুখ বুজিয়া হাসিতে লাগিল]

রঞ্জিত॥ তিনি এলেন না যে?

রাণী॥ নিশ্চয় আসবেন।

রঞ্জিত॥ তোমার সঙ্গে আসবেন কথা ছিল—

রাণী॥ কথা তাই ছিল। শেষে কথা হল আমি তিনটেয় স্কুল থেকে বের হয়ে মার্কেট হয়ে বাড়ী ফিরব। তিনি স্কুল থেকে সোজা এখানে আসবেন চারটেয়।

রঞ্জিত ॥ মার্কেটে গিয়েছিলে ?

রাণী ॥ [অপরূপ ভঙ্গীতে] হাঁ।

রঞ্জিত ॥ এদিকে আমি মধুকে—

রাণী ॥ এদিকে আমি মধুকে বাড়ী ফেরবার পথে পেলুম। কেক্ কিনে বাড়ী ফিরছিল। ওকে 'বাসে' করে কমলালয় স্টোর্সে পাঠিয়ে দিলুম—সেখানে আমার সব সওদা রেখে এসেছি যে !······বলতো কি সওদা ?

রঞ্জিত ॥ ও···আজ তুমি মাইনে পেয়েছ ?

রাণী ॥ নিশ্চয়। বলতো ক মাসের ?

রঞ্জিত ॥ ক মাসের ?

রাণী ॥ বল—

রঞ্জিত ॥ কি করে বলব !

রাণী ॥ আমার চোখ মুখ দেখেও বলতে পাচ্ছ না ? আগে তো আমার চোখ দেখেও তুমি সব বলতে পারতে। আজ পারছ না কেন ?

রঞ্জিত ॥ বিপদের কথা রাণি !

রাণী ॥ আগে তুমি আমার কথা সব সময় ভাবতে।···আচ্ছা আমি যদি এখন নাচি, তাহলেও কি বলতে পারবে না, কমাসের মাইনে একসঙ্গে পেয়েছি ! নাচি ?

রঞ্জিত ॥ দুমাসের ?

রাণী ॥ না নাচতেই তুমি কেন বললে ? নাচবার জন্যে আগে কত সাধ্য-সাধনা করতে, আর এখন নাচতে চাইলেও—

রঞ্জিত ॥ হেড্‌মিস্‌ট্রেস এসে পড়বেন যে। নাচবে রাত্রে। এখন বল দেখি কি কি কিনলে ?

রাণী ॥ বলব কেন ?

রঞ্জিত ॥ বল না···শুনি—

রাণী ॥ মধু এলেই দেখবে। দেখো, কিন্তু—

রঞ্জিত ॥ কি ?

রাণী ॥ চম্‌কে উঠো না—

রঞ্জিত ॥ চম্‌কে দেবার মতও কিছু আছে নাকি ?

রাণী ॥ আছে।

রঞ্জিত ॥ কি ?

রাণী ॥ একটা দেশলাই! [কৌতুকভরা চোখে হাসিতে হাসিতে দূরে সরিয়া গেল। দেওয়াল-ঘড়িতে পৌনে চারটা বাজিল]

রাণী ॥ [দেওয়ালঘড়ি এবং নিজের হাতঘড়ি মিলাইতে গিয়া] বাঃ তোমায় দেওয়াল ঘড়ি দেখি রেস্‌ খেলছে! আমার ঘড়িতে পৌনে চারটে বাজতে এখনো দশ মিনিট।

রঞ্জিত ॥ [ছবি আঁকিতে আঁকিতে] তার মানে রেসে তুমি হেরে গেলে রাণি!

রাণী ॥ [রঞ্জিতের কাছে ছুটিয়া আসিয়া] আর তুমি ? তোমার ঘড়ি কই ?

রঞ্জিত ॥ [হঠাৎ এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মস্থ হইয়া সহজভাবে] আমি আরো বেশি করে হারছিলুম!

রাণী ॥ [অসহিষ্ণু ভাবে] ঘড়িটা কই ?

রঞ্জিত ॥ বললুম যে! আমারটা আরো বেশি শ্লো যাচ্ছিল—তাই তাকে হসপিটালে পাঠিয়েছি।

রাণী ॥ সারতে দিয়েছ ?

রঞ্জিত ॥ [মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না] ফেলে দিয়েছি।

রাণী ॥ তার মানে ?

রঞ্জিত ॥ [রাণীর মুখপানে চাহিয়া ম্লান হাস্যে] ফে—লে দিয়েছি।

রাণী ॥—দেখ, আমার বিয়ের ঘড়ি নিয়ে ওরকম তামাসা করলে সত্যি আমি ভারী চটে যাব কিন্তু—

রঞ্জিত ॥ [চুপ করিয়াই রহিল]

রাণী ॥ বল না ঘড়িটা কই ?

রঞ্জিত ॥ যা বলবার আমি বলেছি রাণী।

রাণী ॥ বটে! আচ্ছা আমি দেখে আসছি [ত্বরিৎপদে উপরে উঠিয়া গেল]

রঞ্জিত ॥ [তুলি রাখিয়া দুই গালে হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত কি ভাবিল। ...ইতিমধ্যে মধু আসিয়া দাঁড়াইল। মধুর এক হাতে একটি পোর্টেবল গ্রামোফোন অন্য হাতে একটি থলি। থলিটি জিনিষপত্রে বোঝাই। বগলে কতকগুলি ছোট বড় প্যাকেট]

রঞ্জিত ॥ [অবাক হইয়া মধুরদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। পরে] রাণী কিনেছে?

মধু ॥ তবে আর কে কিনবে দাদাবাবু?

রঞ্জিত ॥ গ্রামোফোন!

মধু ॥—শুধু গ্রামোফোন! কমলালয় স্টোর্সে আর যে কি আছে তাতো জানি না দাদাবাবু! দেখ [জিনিসগুলি বাহির করিতে লাগিল—রঞ্জিত নীরবে দেখিয়া যাইতে লাগিল]

একটি পোর্টেবল গ্রামোফোন।

খানকতক রেকর্ড।

চারটি জাপানী ফুলদানী। একটি ভালো টি-সেট্।

জানালার ভালো পরদা, আধ ডজন।

একটি ভাল টেবিল ক্লথ।

সেফ্‌টি রেজারের বাক্স।

একটি হোল্ড-অল!

একটা ইক্‌মিক্ কুকার।

কিছু ডালমুট—কিছু লজেন্স্।

মধুর কেনা কেক্। দুইটি ফুলের মালা।

মধু ॥ দেখলে দাদাবাবু?

রঞ্জিত ॥ দেখলুম।

মধু ॥ এ সব কি হবে? সন্ধ্যে বেলাই তো—

রঞ্জিত ॥ চুপ।

[নিস্তব্ধতা]

রঞ্জিত ॥ এগুলো রাণীকে দাও গিয়ে। টাকা পেয়েছিলে?

মধু ॥ হাঁ দাদাবাবু। কেক্ কিনেছি এই ফিরেছে—[গুণিয়া ৮৵১০ রঞ্জিতকে দিল। রঞ্জিত উহা পকেটে রাখিল]

রঞ্জিত ॥ তুমি গিয়ে চা কর। ঠিক্ চারটের হেড্‌মিস্ট্রেস আসবেন। কোন কিছু ক্রুটি না হয় মধু, বিশেষ আজ।···[একটু পরে] হেডমিসট্রেস নাকি ওকে হিংসা করে, রাণী কতদিন আমায় বলেছে। রাণীর সৌভাগ্যের সেই গৌরব, আজ হেডমিসট্রেসের সামনে বজায় রাখতেই হবে। [মধু চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় রাণী দ্বিতল হইতে ছুটিয়া নিচে নামিল]

রাণী ॥—[উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে] এসেছে মধু!···[ছুটিয়া গিয়া গ্রামোফোনটি খুলিয়া তাহাতে দম দিতে দিতে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাইতে লাগিল] আমার অনেক কালের সখ—রাত্রে যখন কথা বলে বলে আর কিছু বলবার থাকে না—তখন এটা—আজ আমরা সারারাত জেগে দুজনে—[হঠাৎ দম দেওয়া বন্ধ করিয়া] ঐ পর্দাগুলো দেখেছ? [ছুটিয়া গিয়া পর্দাগুলি ধরিল। তাহা হইতে একটা তুলিয়া লইয়া একটা জানালায় ছুটিয়া গিয়া তাহাতে উহা লাগাইতে লাগাইতে] এর চেয়ে ভাল ডিজাইন রাজা মহারাজার বাড়ীতেও নেই, আমি জোর করে বলতে পারি। [লাগানো শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ আবার কি মনে পড়িল —সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হইয়া গেল। পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া, দেওয়ালে টাঙানো তাহার মৃত খোকার তৈলচিত্রে উহা পরাইয়া দিয়া] যেটা আগে করবার সেইটেই গেলুম ভুলে! এমন ভুল তো আমার আগে কখনও হ'ত না—কখনো না। [গ্রামোফোনটিতে ধীরে ধীরে দম দিতে দিতে] ওর কথা তো কখনো ভুলতে পারি নি। স্কুলে পড়াচ্ছি—ওর কথা মনে পড়ে, পড়াতে হয় ভুল···একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলে "আকবরের ছেলের নাম কি দিদিমণি?" আমি বললুম!···ওরা সবাই হেসে উঠল; রেগে উঠলুম, জিজ্ঞেস করলুম "হাসছ কেন?" ওরা বললে "হুঁ'

দিদিমণি, আকবরের ছেলের নাম খোকা?"...হাঁ, আমি নাকি বলেছিলুম "খোকা।"

রঞ্জিত ॥ [রাণীর মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে] মালাটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওখানে! ভারী সুন্দর! না?

রাণী ॥ ছাই মানিয়েছে। মালাটা ও এতক্ষণ ছিঁড়ে ফেলত। ছিঁড়ে ফেলেই ফুলগুলো তুলতো আর ছিঁড়তো! ছিঁড়তো আর হাসতো। ঘরময় ফুলের পাপড়ি...আমি বকতে এসে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখতুম! সেই ভালো, না, ঐ ভালো! ছাই! [মালার দিকে তাকাইয়া] ওটা ওখানে থাকবে না—[মালাটা খুলিয়া আনিতে যাইতেছিল—রঞ্জিত তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল]

রঞ্জিত ॥ থাকগে...নতুন কি গান এনেছ বলত?

রাণী ॥ কি জানি কি এনেছি!

রঞ্জিত ॥ আমার জন্যে কি এনেছ?

রাণী ॥ [ছুটিয়া গিয়া সেফ্‌টি রেজারের বাক্সটি আনিয়া রঞ্জিতের টেবিলের উপর রাখিয়া] ফিট্ কর [ছুটিয়া গিয়া সেভিং স্টিক্ জলে ডুবাইয়া রঞ্জিতের গালে সাবান দিতে গেল]

রঞ্জিত ॥ আঃ আমি আজ সকালেই কামিয়েছি যে!

রাণী ॥ [কিছুমাত্র না দমিয়া রঞ্জিতের মুখ এক হাতে ধরিয়া অন্যহাতে তাহার মুখে সাবান মাখাইয়া যাইতে লাগিল] সে কি হয়! আমি খুঁজে খুঁজে নতুন দিশি ব্লেড্ আনলুম। তোমাকে বলতেই হবে...বিলিতি ব্লেডের চেয়ে কিছুমাত্র খারাপ নয়—

রঞ্জিত ॥ পরীক্ষা করে দেখে সে কথা বললে স্বদেশীর অপমানই করা হবে রাণী!...আঃ রাণি—রাণি—হেডমিসট্রেস!

রাণী ॥ [হাসিয়া উঠিয়া] ওতে আমি ভুলছিনা!...আচ্ছা, থাক্। [চট্ করিয়া একটা তোয়ালে টানিয়া লইয়া তদ্দারা তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া] ক্ষতি হয় নি, আরো সুন্দরই হল মুখখানি।...ভারি লোভ হচ্ছে—

রঞ্জিত ॥ হচ্ছে নাকি?

রাণী ॥ ঐ ডালমুট। দেখলেই জিবে জল আসে।···খাবে?

রঞ্জিত ॥ [অভিমান] ডালমুট আমি খাইনা।

রাণী ॥ তবে ঐ টেবিলক্লথটা টেবিলে পেতে ফেল। আমি ততক্ষণ —[বাহিরে গাড়ীর শব্দে] ঐ যা···এসে পড়েছে···ঐ ফুলদানী তিনটে···ওটা নামাও—না-না' হ'ল না—তুমি সব—ওটা তোল—চেয়ারটা সরিয়ে দাও—জানলাটা খুলে দাও—[নিমেষের মধ্যে যথাস্থানে সব সাজাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া চিরুনিটি লইয়া রঞ্জিতের চুলটি অতিদ্রুত আঁচড়াইয়া দিয়া···নিজের বেশভূষা চট্‌ করিয়া দেখিয়া লইয়া চাপাগলায় রঞ্জিতকে] রেডি? [রঞ্জিত জানাইল 'রেডি'। রাণী তখন অচঞ্চল রূপে সহাস্য মুখে সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জিত তাহার অনুবর্ত্তী হইল। উভয়ে সস্মিতমুখে হেডমিসট্রেস শেফালী রায়কে অভ্যর্থনা করিল]

রাণী ॥ আসুন—আসুন—

[নমস্কারাদি বিনিময়ান্তে]

হেড মিসট্রেস ॥ অনেকদিন আসিনি। আসবো-আসবো ভাবছিলুম—এমন সময় রাণীই চায়ের নেমন্তন্ন করে বসল। [রাণীকে] মানুষের মন যেন তোমার নখদর্পণে! কতক্ষণ ফিরেছ?

রাণী ॥ এই তো সবে ফিরলুম!

[সকলে গিয়া উপবেশন কক্ষে বসিলেন]

হেড মিসট্রেস ॥ [চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া] তোমাদের এখানে এলে আমার এত ভালো লাগে! অল্পের মধ্যে এরকম সাজানো সংসার আমার চোখে পড়ে না! এ যেন একখানা ছবি! এ বাড়ী ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতেও বোধ হয় তোমাদের কষ্ট হয়, কি বল রাণি? [জানালা-পথে তাকাইতেই] ক্রিসেন্থিমাম! কি সুন্দর ফুটেছে! অতবড় ডালিয়াও তো সচরাচর দেখি না।

রঞ্জিত ॥ আপনাকে ভাগ্যক্রমে আজ যখন পেয়েছি, তখন, রাণি, ওঁকেই মধ্যস্থ মানা যাক্‌···দেখতে কে বেশি সুন্দর মিসেস রায়?

রাণী ॥ [হেডমিসট্রেসকে দেখাইয়া দিয়া] মিসেস রায়।

রঞ্জিত ॥ [অপ্রতিভ হইল] না—না—, আমি বলছিলুম ঐ ক্রিসেন্থিমাম না ডালিয়া ?

হেড মিসট্রেস ॥ না আমার হোস্টেস ? [তিনজনেই হাসিতে লাগিলেন]

রঞ্জিত ॥ Comparison is odious. আচ্ছা, ও থাক্। রাণি, চা দাও—

হেড মিসট্রেস ॥ এত সকালেই বিদেয় করতে চাইছেন ?

রঞ্জিত ॥ না—না, সে কি ! রাণি, তবে তোমার গ্রামোফোন—

হেড মিসট্রেস ॥ আপনার ছবিটা বুঝি কিছুতেই দেখাবেন না ! ছবি বোঝবার যোগ্যতা না থাকলে গ্রামোফোনই বাজাতে হয় রাণি !

রঞ্জিত ॥ না,—না, সে কি ! এই যে দেখুন না ! [ছবি দেখাইতে বসিল। মধু আসিয়া দাঁড়াইল]

মধু ॥ চা আনব ?

রাণী ॥ আনো।

রঞ্জিত ॥ এই সবে শেষ করলুম ! আপনার কি রকম লাগবে জানি না। [ছবি দেখাইল]

রাণী ॥ মিষ্টার বসু বলেন এই ছবির অন্তরালে নাকি কি গল্প লুকিয়ে আছে। আমি তো খুঁজে পাই না। দেখছি শুধু ধানের ক্ষেত, পাশে ছোট একখানা বাংলো বাড়ী—বাড়ীর সামনে কড়াই শুঁটির ক্ষেত—যেহেতু উনি…মিষ্টার বসু, কড়াইশুঁটি খেতে ভালোবাসেন !

রঞ্জিত ॥ আমি না তুমি ?

রাণী ॥ জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলেই বুঝবেন অত কড়াইশুঁটি খাওয়া আমার তিন পুরুষেরও সাধ্য নেই।

রঞ্জিত ॥ কলে অফুরন্ত জল, অতএব রাণী জল খায় না, বুঝলেন মিসেস রায় ?

হেড মিসট্রেস ॥ Silence ! Silence !

রাণী ॥ দেখুন তো !

হেড মিসেট্রেস ॥ কড়াইশুঁটি খেতে খেতে ওর ফুলগুলির কথা ভুলোনা রাণি ! কি চমৎকার রং ! বাড়ী থেকে দেখছি একটা মেঠো পথ বেরিয়েছে…

ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে কতদূর…উঃ…কতদূর চলে গেছে!…কিন্তু দৃষ্টির ঐ শেষে ওরা দুজন কে? মুখ যেন চেনা চেনাই মনে হয় রাণি?

রাণী॥ [রঞ্জিতকে, সন্দিগ্ধ ভাবে] কে ওরা?

রঞ্জিত॥ চিনতে পাচ্ছ না? চেনা উচিত।

রাণী॥ [রঞ্জিতের কাছে সরিয়া গিয়া, কাণে কাণে এবং সস্মিত সলজ্জ দৃষ্টিতে] আমরা?

রঞ্জিত॥ আমরা কি না সে তুমি বলবে। আমি বলব…ওরা বসুন্ধরার ভাড়াটে। কোন অজানা দেশ থেকে ওরা দুজন—ঐ মানব আর ঐ মানবী পথ চল্‌তে চল্‌তে এই বসুন্ধরায় এসে পড়েছিল। বসুন্ধরার খানিকটা মাটি ওরা ভাড়া নিলে। ওরা সেই মাটিতে বাসা বাঁধলো, মাটি চষ্‌লো—আবাদ করলো—বীজ বুনল—গাছ হ'ল—ফল ফল্‌ল—ফুল ফুটল! দেহের রক্ত জল করে বসুন্ধরাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, ধনী থেকে আরো ধনী করে তুলল—এবং এমনি করে বসুন্ধরার ভাড়া মিটিয়ে ওরা মনের সুখে পরমানন্দে ঘরকন্না করতে লাগল!

রাণী॥ (হেড মিসট্রেসকে) চমৎকার! না?

হেড মিসট্রেস॥ চমৎকার! তারপর?

রঞ্জিত॥ এমনি করে কিছুদিন বেশ কাট্‌ল। যত দিন যায়—তত আয়ু কমে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা কমে আসে। ওদের এক ছেলে হল। ওরা ভাবলে সে ওদের ক্ষতিপূরণ করবে! কিন্তু—

হেড মিসট্রেস॥ [দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিটির দিকে চাহিয়া লইয়া] থাক্—

রঞ্জিত॥ তারপর—তারপর—কোথা থেকে কি হল! হঠাৎ—হঠাৎ ওরা পেল এক নোটিশ—এই মাটি এই ঘর এই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে—আজই—এখনি—এই জীবনসন্ধ্যায় তোমরা দূর হও, ঘরকন্না আর চলবে না—ভাড়া তোমাদের বাকি পড়ে গেছে!

রাণী॥ [অজ্ঞাত আতঙ্কে] সে কি! না—না, তা কেন হবে!

রঞ্জিত॥ [মৃদু হাস্যে] তাই তো হচ্ছে। সর্বত্র। এই বাড়ীতে আমরা

আজ বিশ বছর আছি। এই বাড়ীতে আমার বাবা—আমার মা বাস করে গেছেন—এই বাড়ীকে তাঁরা মনের মত করে সাজিয়েছেন—এই বাড়ীতে আমরা মানুষ হয়েছি—এই বাড়ীতে তাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন—তাঁরা গেলেন —তুমি এলে—রূপে রসে গানে গন্ধে এই বাড়ী আবার ভরে উঠ্‌ল—মুগ্ধ হয়ে স্বর্গ থেকে এক শিশু তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কত খেলা সে খেললে—এখানে —ওখানে—সর্বত্র তার পায়ের ছাপ রেখে একদিন হঠাৎ পালিয়ে গেল। যাক্ সে —তবুও তো ক্রিসেন্থিমাম ফুটল—ডালিয়া হেসে উঠ্‌ল···। এই তো তোমার বাড়ী? ভাড়া বাকি ফেলেছ কি, এ তোমার বাড়ী নয়!

রাণী॥ তুমি কখনো ভাড়া বাকি ফেল না—

রঞ্জিত॥ আমার বলে কোন কথা হচ্ছে না রাণি। কথা হচ্ছে নিয়মের। শুধু কি ভাড়াটে বাড়ীর কথাই হচ্ছে রাণি? তা তো নয়! নিজের বাড়ীতেই কি কেউ চিরকাল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পেরেছে! যেতে হবে···সবাইকে একদিন এ সব ছেড়ে যেতে হবে। আমরা যাব আজ—আর কেউ যাবে কাল—কেউ যাবে পরশু! বসুন্ধরার আমরা কেউ নই রাণি, কেউ নই। আমাদের দেশ এখানে নয়—এখানে নয়—

রাণী॥ কোথায়?

রঞ্জিত॥ তাও জানি না। না, হয়ত জানতুম কিন্তু এই মাটির মায়ায় যখন আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম, তখন তা ভুললুম। কিন্তু আমরা যে ভাড়াটে এ কথা তো ভোলবার নয়! ভাড়া বাকি পড়লেই যে নোটিস হয়, সেই নোটিসই কি তা স্মরণ করিয়ে দেয় না রাণি?

রাণী॥ যাও—তুমি আমাদের শুধু ভয় দেখাচ্ছ! [হেডমিসট্রেসকে] আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

হেড্‌মিসট্রেস॥ অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস করি যে ভাড়া বাকি পড়লে বাড়ীওয়ালা নোটিস দিয়ে অথবা না দিয়ে বাড়ী থেকে উঠিয়ে দেবে।—যাক্···চমৎকার হয়েছে আপনার ছবি—অনেক নতুন কথাও শুনলুম। যদি কিছু মনে না করেন আজ আমি উঠি—আমার মাথাটা বড্‌ডো ধরেছে—

রাণী ॥ ধরবে না! মাথার আর দোষ কি! এ রকম গল্প শুনে আমার মাথাই টন্ টন্ করছে।

হেড্ মিসট্রেস ॥ [রাণীকে] আচ্ছা ভাই আজ উঠি!

রাণী ॥ আর কি বলব! গাড়ী—

হেড্ মিসট্রেস ॥ না ভাই, গাড়ী তো রয়েছে। [রঞ্জিতকে] আমাদের ওখানে একদিন যাবেন—

রাণী ॥ আমাকে বললেন না যে?

রঞ্জিত ॥ আর আমাকে?

হেড্ মিসট্রেস ॥ একজনকে বললেই যথেষ্ট। এ আমি জানি যে কান টানলে মাথা আসে। [এই কথোপকথনের মধ্যে তিনজন সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জিত দরজা খুলিয়া দিল! হেড মিসট্রেস বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন]

হেড্ মিসট্রেস ॥ রাণী, আজকাল দেখচি দরজায় দারোয়ান রাখো?

রঞ্জিত ॥ [তাহার অর্থ-শূন্য উচ্চহাস্যে রাণীর উত্তর ডুবিয়া গেল। নমস্কারাদি বিনিময় পূর্বেই হইয়াছিল, হেড্ মিসট্রেস গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। রাণী ও রঞ্জিত সদর দরজা বন্ধ করিয়া উপবেশন কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল]

রাণী ॥ বাইরে ও লোকটা কে?

রঞ্জিত ॥ [বুঝিতে পারিয়াও] কোথায়?

রাণী ॥ আমি যখন আসি তখনও ওকে রোয়াকে বসে থাকতে দেখেছিলুম, এখনো দেখি বসেই আছে!

রঞ্জিত ॥ [সহজভাবে] কি জানি কে! থাক্ না ক্ষতি কি! ছবিটা বুঝলে?

রাণী ॥ তুমি আজকের চায়ের আসরটা মাটি করলে! অমন সব ভয় দেখানো গল্প কি লোকের কাছে বলতে আছে? ছিঃ! লোকে কি ভাবে বলত!··· আচ্ছা, সত্যি কি এ বাড়ী থেকে আমাদের কোনোদিন উঠ্তে হতে পারে?

রঞ্জিত ॥ আমার যা বলবার তা তো খুব স্পষ্ট করেই বলেছি রাণি!

রাণী ॥ তুমি তো মাসে মাসেই ভাড়া মিটিয়ে দাও—না ?

রঞ্জিত ॥ যদি দিই, উঠব না। যদি না দি, উঠ্‌তে হবে।

রাণী ॥ আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলত ! আমার সঙ্গে আগের মতো প্রাণ খুলে কথা কও না !

রঞ্জিত ॥ কি করে বুঝলে ?

রাণী ॥ আজ তুমি বলতে পার নি আমি ক'মাসের মাইনে পেয়েছি ! কি কিনেছিলুম তাও বলতে পারলে না ! আগে তো এমন ছিল না ! বাড়ী ফিরলেই তুমি বলতে রাণি আজ তুমি স্কুলে মেয়েদের খুব বকেছ—আজ তুমি সেখানে গিয়েছিলে—ওখানে গিয়েছিলে। আমি অবাক হয়ে যেতুম ! সব মিলত !··· তুমি আমায় আগের মত ভালোবাসো না—বাসো না, না—না—না !

রঞ্জিত ॥ সত্যি ?

রাণী ॥ নয়ত কি !

রঞ্জিত ॥ আগে এমন ছিল না ?

রাণী ॥ নিশ্চয় না। শুভদৃষ্টির পর থেকে একটি মুহূর্তও তো আমি ভুলি নি !

রঞ্জিত ॥ তোমার সব মনে আছে রাণী ? এখনো, আজো ?

রাণী ॥ তোমার বুঝি নেই ! দেখেছ···তাই তো বলছিলুম সুখের দিন আমার গেছে !

রঞ্জিত ॥ সুখের দিন বলতে বিশেষ করে কোনটি তোমার মনে হয় রাণী ?

রাণী ॥ বিশেষ অবিশেষ আবার কি ! প্রত্যেকটি দিন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

রঞ্জিত ॥ তবু—তারি মধ্যে—কোন দিনটি—কোন দিনটি সব চেয়ে সুখের মনে হয় রাণি ?

রাণী ॥ বলব ?

রঞ্জিত ॥ বলত—

[সদর দরজায় বাহির হইতে ঘন ঘন করাঘাত]

রাণী ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কে ?

রঞ্জিত ॥ [চাঞ্চল্য দমন করিয়া] আমি দেখছি—[ছুটিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিলেন]

বাহিরে পাহারা ॥ সন্ধ্যা তো হয়ে এল বাবু! তাদের লোক খোঁজ নিতে এসেছে।

রঞ্জিত ॥ আর আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার বেশি কিছুতেই নয়। [সদর দরজা বন্ধ করিয়া রাণীর কাছে আসিয়া দেখে রাণী ছবিটি দেখিতেছে]

রাণী ॥ কে?

রঞ্জিত ॥ ছবি শেষ করবার তাগিদ।

রাণী ॥ দেখ, ছবিটা কি, না বিক্রি করলেই নয়? আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে এ ছবিটা আমাদের ঘরেই থাক। সত্যি কথা বলতে কি পরের ঘরে তোমার ছবি যায়, আমার ভালো লাগে না। তোমার ছবি দিয়ে আমার ঘর সাজাবো। [ছবিটা নির্দেশ করিয়া] আচ্ছা ওরা দুজনে পথের শেষে গিয়ে অমন করে পিছু ফিরে চেয়ে আছে কেন?

রঞ্জিত ॥ ঐ ভাড়া-বাড়ীর মায়া। এই যে ভাড়া-বাড়ী, এই বিদেশের গেহ··· এর জন্যে—এর জন্যেও আমাদের চোখে জল আসে। বসুন্ধরা আমাদের দেশ নয় রাণি, জানি, কিন্তু এই বিদেশের মায়াই আমাদের সারাটা জীবন আচ্ছন্ন করে রাখে নাকি? যাক্ সে কথা। রাণি, শুভরাত্রির পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তোমার স্মৃতির পটে এঁকে রেখেছ, সত্যি?

রাণী ॥ নয়ত কি?

রঞ্জিত ॥ বিয়ের পর তুমি এই বাড়ীতে এলে। না? তারপর সেই এক রাত্রে হঠাৎ আমাদের মনে হল ঘর আর আমাদের ভালো লাগছে না···আমরা পালাব। মনে আছে? কি ছেলে-মানুষই আমরা ছিলুম তখন?

রাণী ॥ মনে নেই? প্রথমটায় আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলুম না! কি বোকাই আমি ছিলুম! শেষটায় তুমি আমার—ছিঃ ভাবতেও লজ্জা হয়!

রঞ্জিত ॥ এখানে তো কেউ নেই রাণি! লজ্জা কি? শেষটায় আমি তোমার পায়ে ধরে সাধলুম···তখন আর কি কর! রাজী হলে!

রাণী ॥ ওমা! পালাতে সে কি ভয়! অমন ভয় আমি জীবনে আর কখনো পাই নি!

রঞ্জিত ॥ অমন আনন্দ আমি জীবনে আর পেলুম না! টাকাপয়সা ইচ্ছে করলেই সঙ্গে নিতে পারতুম—কিন্তু নিলুম না তো! অন্ধকার রাত্রে দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম! চলতে চলতে রাত ভোর হয়ে গেল! তখন তোমার সে যে কি নিদারুণ লজ্জা, মনে আছে?

রাণী ॥ আর তোমার? সে কি নিদারুণ ভয়। সে কথা বুঝি ভুলে গেছ?

রঞ্জিত ॥ আচ্ছা বেশ। লজ্জায়ই হোক্ আর ভয়েই হোক্ অবশেষে আমরা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে উঠলুম। লাভার্স বাওয়ারে সারাটা সকাল কাটল···দুপুরও! খিদে পেল না—তৃষ্ণা পেল না—

রাণী ॥ পেল না আবার!

রঞ্জিত ॥ পেল···কিন্তু···গেলও তো! একথা কি সত্যি নয় রাণি, চুমু খেয়ে খেয়েই আমরা সারাটি দিন কাটিয়ে দিলুম!···কোন কষ্ট হয়েছিল রাণি?

রাণী ॥ কিন্তু কি দশাটা তুমি আমার সে দিন করেছিলে মনে আছে?

রঞ্জিত ॥ কই সে দিন তো কিছু বল নি!

রাণী ॥ আজ যদি হয়, আজো বলব না। ও বুঝি বলবার কথা?···কিন্তু [সকৌতুকে] তার পর? তারপর?

রঞ্জিত ॥ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিকেল বেলা বায়ুসেবন উদ্দেশ্যে দাদামশায়ের প্রবেশ।

রাণী ॥ সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ মর্দ্দন—দেখতে দেখতে সেখানে হাট জমে গেল···

রঞ্জিত ॥ কিন্তু···তবু—তবু—অমন একটি দিন জীবনে আর পাই নি···পেলুম না! কি বল রাণি?

রাণী ॥ [চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রায় কাণে কাণে] এই, যাবে?

রঞ্জিত ॥ ঐ কথাটি, ঐ কথাটি শোনবার জন্যে আমি মরছিলুম রাণি।··· চল—এখনি—

রাণী ॥ দাঁড়াও, ওপর থেকে আসছি—

রঞ্জিত ॥ না। তা হচ্ছে না। সে দিন যেমন বের হয়েছিলুম, আজো তেমনি বের হতে হবে। কিছু নিতে পারবে না। কিছু না, যেমনটি দাঁড়িয়ে আছ—ঠিক অমনিভাবে আমার হাত ধরে বের হয়ে এস। যদি সেই রাত্রির আনন্দ চাও রাণি, তবে এস, ঠিক তেমনি করে আমরা পালিয়ে যাই—

রাণী ॥ [চোখে মুখে হাসি] চল···

রঞ্জিত ॥ পা টিপে টিপে এস—[রাণী হাসি চাপিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চলিল —এমন সময় হঠাৎ মধু আসিয়া পড়িল]

মধু ॥ দাদাবাবু—[সবিস্ময়ে] এ কি !

রঞ্জিত ॥ আঃ—নাও মধু—[পকেট হইতে যা ছিল সব বাহির করিয়া দিয়া] ৮৶১০···যা আছে তোমায় দিলুম।

মধু ॥ তার মানে দাদাবাবু ?

রঞ্জিত ॥ আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি মধু ! [সদর দরজায় সজোরে করাঘাত হইতে লাগিল]

রাণী ॥ [চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] ও কি ?

রঞ্জিত ॥ আমরা পালাচ্ছি মধু। আমাদের জন্যে ভেবোনা—ভেবোনা তুমি। ও টাকা তোমার পাওনা। [সদর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত]

রাণী ॥ কে ওরা ? কে ওরা ?

রঞ্জিত ॥ যে ইচ্ছে সে হোক্। বল, কোথায় আমরা পালাব।

রাণী ॥ ওরা যে সদর দরজা ভেঙ্গে ফেলছে !

রঞ্জিত ॥ সে দিন রাত্রেও তুমি এমনি ভয় পেলেছিলে রাণি···এবং তার পরই পেয়েছিলে চরম আনন্দ। মনে নেই তোমার ? সেদিন তোমায় যেমন করে বুকে নিয়ে পালিয়েছিলুম আজও তেমনি করে বুকে নিয়ে পালাব—

[তাহাকে বুকে লইতে গেল। সদর দরজায় ভীষণ আঘাত। বাহিরের কয়েকজন লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল :—একি আচরণ আপনার মশাই ! বাড়ীভাড়া বাকি

কেনবার সময় মনে ছিল না যে বাড়ী একদিন ভেকেট্ করতে হবে? নোটিশ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ভেকেট করবেন বলেছেন—এখনও জোচ্চুরি—?" সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভাঙিয়া লোকজন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল]

রাণী ॥ [ক্রমে সব বুঝিতে পারিল। ভয়ে আতঙ্কে ব্যথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল] ওঃ [স্বামীর বুকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল]

রঞ্জিত ॥ [সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে] একটু পথ দিন। [মূর্ছিতা রাণীকে বুকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল]

[পূর্বাশা, মাঘ, ১৩৪০]

যজ্ঞফল

—ও যে অট্টহাসি! ও কি মা-ই হেসে উঠলেন বাবা?

—হ্যাঁ, বাবা, ও তিনি-ই।

—তারপর?

—তারপর সকল চিকিৎসা যখন শেষ হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হলুম।

—গুরুদেব? তা' তিনিও এসে খুব ঘটা করে'ই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন নিশ্চয়?

—না বাবা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তিনি সত্যিসত্যিই মহাপুরুষ। তাঁর পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন; শ্মশানেই থাকতেন। এঁরা অবশ্য গৃহী। কিন্তু গুরুদেবের নিজের মুখেই শুনেছি গৃহী হ'তে পেরেছেন শুধু বৈরাগ্যে আর ভোগে তাঁর ভেদজ্ঞান দূর হয়েছিল ব'লে।

—এ সব কথা আমি ভালো বুঝিনে। তারপর বলুন শুনি।

—তিনি এসে যজ্ঞ করলেন। পরে আমাকে ডেকে হেসে বল্লেন—"কালিকাপ্রসাদ, প্রত্যাদেশ পেলুম এই বছরেই পুত্রমুখ দর্শন করবে।" হৈম পাশের ঘরেই ছিল, এক মুঠো মোহর নিয়ে ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলে। গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন "সুপুত্রবতী হও।"

—তারপরেই বুঝি আমি হলুম?

—না, অত সহজে তুমি আমাদের দয়া করনি বাবা। গুরুদেব বল্তেন —"সুপুত্র কত আরাধনার ধন!" হৈম কি তোমার জন্যে কম তপস্যা করেছে!

—তপস্যা ?

—হ্যাঁ, বাবা, তপস্যা। গুরুদেব বললেন—"শুধু ছেলে হ'লেই তো হবে না, ছেলের মত ছেলে হওয়া চাই; নইলে এত বড় জমিদারী—একটা রাজ্য—এটা তো চালিয়ে যেতে হবে !"

—বটে ! আমি যে অন্নের গ্রাসটিও মুখের ভেতর ঠিকমত চালনা করতে শিখি নি—সেও যে মাসিমারই কাজ ছিল বাবা !

—হবে। বয়েস হ'লে, সব হবে। বি-এ পাস দিলেই কি বয়স হ'ল বাবা ?

—যাক্। তারপর ?

—তারপর তিনি আমাকে একদিন বললেন—"কালিকাপ্রসাদ, হৈমীর মধ্যে মা যশোদার বিভূতি দেখতে পাচ্ছি।" এই ব'লে হ্লাদিনী, কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধার পদ্ম, ষট্‌চক্র···কি সব বল্‌লেন, আমরা তো অতশত ধরতে পারিনা বাবা। শেষে বল্‌লেন—"সেই শক্তি ওতে সুপ্ত রয়েছে, তা'কে জাগ্রত করতে হবে।" বল্‌লেন—"যোগনিদ্রা তোমরা বুঝবে না, কিছু আজকালকার হিপনটিক সাজেশন (hypnotic suggestion) হয়ত বুঝতে পারবে"···

—হ্যাঁ, ওটা বুঝি বটে।

—তারপর হৈমকে নিয়ে তাঁর কি সাধনা ! দুপুর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁদের···

—বাবা ! ঐ···আবার ! এবার চীৎকার করে' কাঁদছেন ! মা, না ? নিশ্চয়—

—হ্যাঁ বাবা, তিনিই। ওতে ভয় পেয়ো না তুমি—

—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন না বাবা···

—ওটা একটু থামুক। সে-ই এ ঘরে আস্‌বে নিশ্চয়।

—আমাকে তো চিনতে পারবেন না ! কি হবে ?

—আমি চিনিয়ে দেব।

—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই কি চিন্‌তে পারবেন ?

—বোধহয় না। তবু চেষ্টা করে' দেখব। তুমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। রাতদিন বিভীষিকা দেখত—ঐ গুরুদেবকেই। গুরুদেবকে চিঠি লিখলুম, তিনি উত্তরে লিখলেন—"ভগবানের ভার সহ্য করতে পারছে না।"

—গুরুদেবকে নিয়ে এলেন না কেন?

—তার আর সুযোগ পেলুম কই বাবা? সন্ধান করে' জানলুম তাঁর ডাক এসেছিল, তিনি হিমালয়ে চলে' গেছেন।

—তারপর?

—তারপর উন্মত্ততা ক্রমে চরমে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ বিভীষিকা দেখতে দেখতে একদিন তোমাকে গলা টিপে মেরেই ফেলে আর কি!

—বেঁচে যেতুম বাবা তবে।

—ছিঃ বাবা! অক্ষয় অমর হও তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা তুমি; তোমার মুখের দিকে চেয়েই এখনো আমি সংসারে রয়েছি···কাছে এস বাবা। না, আরো কাছে এস।···যখন দেখলুম প্রসূতির ঐ অবস্থা, তখন আমি অগত্যা তোমাকে তোমার মাসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিলুম।

—হ্যাঁ বাবা, আমাব সেই বন্ধ্যা মাসিমা যাগযজ্ঞ না করে'ও আমাকে পেয়ে পুত্রবতী হবার আনন্দ পেয়েছেন। তারপর···?

—তারপর এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলুম। তুমিও চোখের আড়াল হ'লে—সেও ভালোমানুষটি হয়ে গেল। কে বলবে যে সে মা হয়েছিল, পাগল হয়েছিল! যেন কিছুই হয়নি। সে যেন আমাদের সেই নববধূ হৈম—মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে যেন আমরা সবাই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম—তার বেশি আর কিছু নয়। ডাক্তাররা দেখে বললে—বেশ হয়েছে। ছেলের কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই—হিতে বিপরীত হবে।" সেই থেকে তুমি তোমার মাসিমার ওখানেই মানুষ হয়েছ, আমি চুরি করে চুপি চুপি তোমাকে দেখে এসেছি। তুমিও এতদিন জেনে এসেছ ঐ মাসিমাই তোমার মা···যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল সে মরে গেছে।

—বাবা, তবে আজ আমাকে এখানে আনা আপনার উচিত হয়নি; আমি মাসিমার ওখানেই ফিরে যাই।

—না বাবা, তোমার মা তোমাকে দেখবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

—তবে তিনি শুনেছেন?

—শুনেছেন।

—কে শোনালে? কেন শোনালে?

—সেই কথাই বল্‌ছি। গত মঙ্গলবারেও বেশ শান্ত ছিল, রাত্রে বেশ ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠল। আমার হাত দুখানি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের ওপর রেখে সহজ সরল ভাবে আমায় বল্লে—"সব সময় তুমি মুখখানি ভার করে থাক কেন?" আমি একটু হাসলুম···হাসতে চেষ্টা করলুম। সে আমার হাত দু'খানি নিয়ে খেলা করতে করতে বল্লে, "তোমার ছেলে হ'ল না বলে —না? আমি কোন কথা কইলুম না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল! সারাটি রাত ঘুমলো না। পরদিন সকালবেলা উঠে গড় হয়ে আমায় প্রণাম করে নিজে জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিয়ে বল্লে— 'আজ আমার এ সাধে বাদ সেধো না'—এই বলে চুলের বেণী খুলে আমার পা দু'খানি মুছে দিলে। মনে হ'ল গুরুদেবই এ প্রথাটির প্রচলন করেছিলেন; তিনি বল্‌তেন "ভক্তিমতী নারীর এই সেবাটুকু বড় মধুর।"

—তারপর···তারপর···?

—তারপর উঠে আমায় পালঙ্কে বসিয়ে, সম্মুখে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে বল্লে "একটি পুষ্যিপুত্র নিলে হয় না?"—মূর্খ আমি···মূঢ় আমি! তখন আমি না বলে থাকতে পারলুম না তোমার কথা। যাগযজ্ঞ আর গুরুদেবের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে' বল্‌লুম "তোমার ছেলে হয়েছিল হৈম···কিন্তু, সে হবার পরেই তোমার খুব অসুখ হয়, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না; ছেলের অযত্ন হবে জেনে তা'কে তা'র মাসিমার হাতে সঁপে দিয়েছি। তোমার, তোমার সোনার চাঁদ ছেলে সেইখানেই মানুষ হচ্ছে'। শুনে সে যেন নেচে উঠল! আনন্দে বিস্ময়ে সে অপরূপ হয়ে উঠল! তখনি জিদ ধরল তোমাকে তার কোলে এনে

দিতে হবে। আমিও স্বীকৃত হলুম। তারপর থেকেই নিজের হাতে তোমার জন্যে ঘর সাজিয়েছে, খাবার তৈরি করেছে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-আলো-করা বৌ আনবে বলে ঘটক ডেকে পাঠিয়েছে। কি যে করেছে আর কি যে না করেছে, সে বলবার নয়! আমি তোমাকে আনবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললুম; তিনি বললেন "না, আর ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে ছেলে নিয়ে আসুন।" কিন্তু···

—কিন্তু?

—কিন্তু পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকা দেখে বলে পাঠালেন এ দু'দিন বড় খারাপ দিন, পুত্রমুখ দেখবার পক্ষে বড়ই অশুভ। আমি সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছি! কিন্তু বিলম্ব দেখে সে আবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, একদণ্ডও আর অপেক্ষা করবে না। আবার সেই আগের মত ক্ষেপে উঠেছে। কখনো কাঁদছে, কখনো হাসছে, যাকে দেখছে তারই হাত পা জড়িয়ে ধরে বলছে "আমার ছেলে এনে দাও···এখনি না এনে দিলে আমি আত্মঘাতী হব"—

—বাবা, আপনার পঞ্জিকা রেখে দিন, আমি তাঁর কাছে এই চল্‌লুম···

—হ্যাঁ বাবা, যাবে বৈ কি! শুভ মুহূর্ত এসেছে বোধ হয়! ব'সো, আমি ঘড়ি দেখছি···বাঃ, শুভ যোগের যে চার মিনিট পার-ই হয়ে গেছে দেখছি··· যাও বাবা, এসো···

—আপনি···

—না বাবা, আমি ঠিক এ সময়টায় যেতে চাইনে···আমার কান্না পাচ্ছে··· এসো বাবা, এসো। ···রামচরণ, আরে রামচরণ! গেলি কোথা?

—এই এসেছি, আজ্ঞে···

—যে বাবুটি এই ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে গেল, দেখলি?

—আজ্ঞে···

—ও তোদের ছোটকর্তা, আমারি ছেলে। সে-সব শুনিস 'খন। পথে আসতে নদীর ধারে হাঁস চরতে দেখে বাবা আমার শিকারের জন্যে মেতে উঠেছিল। আমার বন্দুকটা আনবার জন্যে কেবলাকে কখন বলেচি, এখনো তো সে এল না···

—আজ্ঞে সে বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমিও তো বন্দুকই খুঁজছিলুম—

—এই যে কেবলা···বন্দুক পেলি?

—আজ্ঞে, বন্দুক মার হাতে···

—সে কি!

—হ্যাঁ কর্তা···আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন—

[পাশের ঘরে গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম শব্দ]

—ওকি! ওকি! তবে কি আত্মহত্যা করলে?

—না···না···না···হাঃ হাঃ হাঃ।···আত্মহত্যা করিনি···গুরুহত্যা···

—আমার ছেলে? আমার ছেলে?

—কে তোমার ছেলে? হাঃ হাঃ হাঃ!···তোমার আবার ছেলে! গুরুদেব ·গুরুদেব—অবিকল গুরুদেব···সেই চোখ···সেই মুখ···সেই স্বর···হাঃ হাঃ হাঃ।

সবুজপত্র—অগ্রহায়ণ: ১৩৩২

কানাই-বলাই

চরিত্র

কানাই চৌধুরী বলাই অধিকারী	সওদাগরী অফিসের কেরানী।
চণ্ডী দেবী	বলাই অধিকারীর স্ত্রী।
দুর্গা দেবী	কানাই চৌধুরীর স্ত্রী, চণ্ডী দেবীর ছোট বোন।
গণেশ	কানাই চৌধুরীর ভৃত্য।

[কানাই চৌধুরীর বাসভবন। বেলা তিনটা। কানাই চৌধুরীর স্ত্রী দুর্গা এবং বলাই অধিকারীর স্ত্রী চণ্ডী—দুই সহোদরা বোনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনে আলোচনা করিতেছে]

দুর্গা ॥ কি হ'বে দিদি ?

চণ্ডী ॥ হ'বে আর কি ! কপাল তোর পুড়েছে।

দুর্গা ॥ [ছল ছল চক্ষে] দিদি !

চণ্ডী ॥ বিয়ের আগেও তোকে বলেছি, বিয়ের পরেও তোকে বলেছি দুর্গা,—শত্রুকে বিশ্বাস করবি, তবু স্বামীকে বিশ্বাস করবি না। সে কথা শুনে তুই তখন হাসতিস্। এখন কাঁদতে হবে।

দুর্গা ॥ কিন্তু দিদি, উনি তো এমন ছিলেন না। আমাকে ছাড়া আর যে কাউকে জানতেন, এতো কথনো মনে হয় নি।

চণ্ডী ॥ বিয়ের পর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছিলি। সঙ্গে থাকলে এক মূর্তি, সঙ্গে না থাকলে আর এক মূর্তি—এও তো তোকে আমি বলেছি।

পুরীতে যদি তুই সঙ্গে যেতিস্—সাহস পেতো না; এ সব কেলেঙ্কারীও ঘটতো না।

দুর্গা॥ তুমি জামাইবাবুকে একলা যেতে দিলে,—সঙ্গে গেলে না। তাই দেখেই তো আমি সাহস পেলুম দিদি। তার ওপর জামাইবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে দেখে—ভাবলুম, নাই বা গেলুম আমি সঙ্গে। পূজোর সময়ে দেনা করে বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম, সেই দেনাই এখনও শুধতে পারি নি। জানো তো, আমাদের খরচার সংসার। যাবো বললেই তো আর হয় না।

চণ্ডী॥ তা' না হয় না গেলি। কিন্তু কড়া শাসনে রাখতে তোকে কে মানা করেছিল? কড়া শাসনে রেখেছি বলেই আজ আমি নিশ্চিন্ত। বলেতো,——"চণ্ডী, কী অভ্যেস করে দিয়েছো। বরং তুমি সঙ্গে থাকলে এদিক ওদিক চাই। কিন্তু যখন সঙ্গে থাকো না, তখন স্রেফ্ মাটির দিকে চেয়ে পথ চলি। তোমার শাসনে এ কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।"

দুর্গা॥ তুমি ঠিকই বলেছো দিদি। তোমার কথা না শুনে কী ভুলই করেছি! ভুল যে শুধরোবো, সে আশাও আর নেই দিদি। মনে হয়, শাসনের বাইরে চলে গেছে। ঐ নীল চিঠি—যেদিন ওর নামে ডাকে এসেছে, সেদিনই আমার কপাল পুড়েছে। পড়েছো তো চিঠিখানা।

চণ্ডী॥ পড়বো না?—কী তার রং, কী ঢং! মুখপুড়ী চিঠিতে আবার একতোলা আতর মাখিয়ে ডাক-বাক্সে ছেড়েছে।

দুর্গা॥ কী জানি দিদি! এসব কথা মনে হলেই মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখি। জামাইবাবুকে কি চিঠিটা দেখিয়েছো? বের করতে পারলে কিছু? মেয়েটা কে?

চণ্ডী॥ অ্যাদ্দিন জেরা করেও পারিসনি তো কানাইয়ের পেট থেকে কোন কথা বের করতে?

দুর্গা॥ না দিদি। কই আর পারলুম? এ কথা তুললেই বলেন,—"তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি এর কিছুই জানি না দুর্গা।"

চণ্ডী॥ ও বললে, আর তুই বিশ্বাস করলি! কতোবার তোকে বলবো—

শত্রুকে বিশ্বাস করবি, কিন্তু নিজের সোয়ামীকে বিশ্বাস করবি নে কখনো। আমি তো তোর জামাইবাবুকে বললুম,—"ভাল চাও তো, সব খুলে বল। পুরীতে গিয়ে দুই ভায়রায় মিলে কী সব কাণ্ড করে এসেছো বল। না বলো তো আজ আর রক্ষে নেই! সাঁড়াশি দিয়ে তোমার জিভ টেনে বের করে কথা আদায় করবো।"

দুর্গা॥ ওরে বাবা! জামাইবাবু তবে বলেছেন?

চণ্ডী॥ বলবে না? বাবা সাধে আমার নাম রেখেছিলেন 'চণ্ডী'? কিন্তু তোর নাম কেন যে তিনি 'দুর্গা' রেখেছিলেন, আজও আমি তা' বুঝলুম না। দুর্গা! একটা গোবেচারা স্বামীকে যে শায়েস্তা করতে পারলে না, সে হলো গিয়ে দুর্গা!

দুর্গা॥ জামাইবাবু কী বললেন দিদি? মুখপুড়ীটা কে?

চণ্ডী॥ একটা হাতী।

দুর্গা॥ হাতী!

চণ্ডী॥ আমি মিথ্যে বলছি নে রে দুর্গা। সত্যিই একটা হাতীর মতো মেয়ে—আড়াই মন ওজন—যেমন কালো তেমনি মোটা। কোথাকার খুব বড় জমিদারের একমাত্র মেয়ে। মা নেই, কিছুদিন হলো বাপও গেছে মারা। অগাধ সম্পত্তির মালিক। চিঠিতে নাম দিয়েছে না—"তোমারই নগেন?" আর কেউ দেখলে মনে করবে কোন ব্যাটা ছেলে। কিন্তু নামটা হলো গিয়ে ওর নগেন্দ্র-নন্দিনী। তিনিই হলেন গিয়ে নগেন—পেটে পেটে এতো শয়তানী!

দুর্গা॥ তা' এতো বড়ো জমিদারের মেয়ে—এতো টাকার মালিক—বিয়ে হয় নি?

চণ্ডী॥ কে বিয়ে করবে ঐ কেলে হাতীকে? বললে তো তোর জামাইবাবু, যতো দিন যাচ্ছে ততো ফুলছে—চর্বির একটা পাহাড়। হ্যাঁ, ঐটেই হলো গিয়ে ওর ব্যাধি। ঐ ব্যাধি সারাতেই গেছে পুরী—লোণা জল-হাওয়ায় যদি কয়েক সের কমে। পুরীতে এবার যতো লোক বেড়াতে গেছে, সবার মুখেই এই কেলে হাতীর কথা॥ এস্টেটের ম্যানেজার নাকি দু হাতে টাকা ঢালছে—যদি কেউ

সারাতে পারে! এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবরেজ, ঝাড়ফুঁক, অবধূত—সবাই বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন এই না দেখে তুই ভায়রার হলো যুক্তি—তোর জামাইবাবু বললে "বেশ,—হরির কৃপায় দশ জনে খায়, আমরাই বা কেন খাবো না হে?"

দুর্গা॥ তার মানে?

চণ্ডী॥ তার মানে আমার বলাই অধিকারী পুরীতে রটিয়ে দিলেন—তোমার কানাই চৌধুরী কী যেন এক ভৌতিক চিকিৎসা জানেন—ভূতের যদি কৃপা হয়, হেন ব্যাধি নেই সারে না। জমিদারবাড়ী থেকে তলব এলো। আসতেই হবে।

দুর্গা॥ তা' সে গেল?

চণ্ডী॥ যাবে না? প্রথম দিনেই একশো টাকা ফি—আর সে কী খাতির-যত্ন!

দুর্গা॥ হায়, হায়, সেই খাতির-যত্নই আমার কাল হলো! ··ঐ পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আপিস থেকে আসছেন। যা করতে হয়, তুমিই কর। আমার মাথা ঘুরছে, বুকটা কেমন করছে।

[অফিস হইতে সদ্য প্রত্যাগত কানাই চৌধুরীর প্রবেশ]

কানাই॥ ও বাবা! এ যে একেবারে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—প্রয়াগ-তীর্থ!

চণ্ডী॥ কানাই, ও সব ছেঁদো কথায় ভবি ভুলবে না। বোসো।

কানাই॥ বসছি দিদি। কিন্তু অফিসের এই জামাকাপড়গুলো—

চণ্ডী॥ ওগুলো গায়েই থাকবে। এটাও আদালত।

কানাই॥ ওরে বাবা! আচ্ছা থাক। কিন্তু এক পেয়ালা চা—পাবো তো?

চণ্ডী॥ পাবে—যখন গলা শুকিয়ে যাবে—প্রাণ-পাখী ত্রাহি-ত্রাহি করবে।

কানাই॥ ব্যাপার কি চণ্ডীদিদি? সেই নীল চিঠিটা তো? সে তো আমি দুর্গার গা ছুঁয়ে বলেছি—কে আমাকে কেন লিখলে, আমি জানি না। বিশ্বাস না হয়, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি চণ্ডীদিদি।

চণ্ডী॥ দুর্গা! এক কেটলি জল গরম কর্।

দুর্গা ॥ কেন দিদি ?

চণ্ডী ॥ থামো। গরম জলের কেটলিটা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আনবি—হ্যাঁ, সাঁড়াশি।

কানাই ॥ ওরে বাবা ! বলাইদা' আমাকে বলেছেন, তুমি নাকি একদিন—

চণ্ডী ॥ নাকি ! নাকি কেন ? বলাইদা' কখনো মিছে কথা বলে না।··· কই, তুই গেলি না দুর্গা ?

দুর্গা ॥ যাই দিদি।

চণ্ডী ॥ আচ্ছা দাঁড়া। কথাগুলো তোরও শোনা দরকার।

কানাই ॥ তা' দরকার। ওরই সব চেয়ে বেশি শোনা দরকার। [একটি চেয়ার আগাইয়া দিয়া] তুমি বেসো দুর্গা, বোসো।

চণ্ডী ॥ খবরদার ! কিছু লুকোবার চেষ্টা করো না। জেনো, আমি সব কিছু শুনেছি। কোনও বাইরের লোকের কাছ থেকে নয়—শত্রু-টত্রুও নয় ! শুনেছি তোমারই পেয়ারের বলাইদার কাছে। মিথ্যে বলবার লোক সে নয়—বিশেষ আমার কাছে। স্বামীকে বিশ্বাস করতে নেই, আমি জানি। কিন্তু তাকে আমি এমন গড়ে-পিটে মানুষ করেছি যে, হ্যাঁ, ওকে বিশ্বাস করা চলে। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই,—কোনও বাজে কথা নয়—মোক্ষম একটি কথা। তোমার প্রাণের নগেন্দ্র-সুন্দরী তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।···যাক। কিন্তু তুমি—তুমি তাতে রাজী হয়েছিলে কি না ?

কানাই ॥ বিশ্বাস কর দিদি, আমি তাকে দেখিই নি। দুর্গার গা ছুঁয়ে বলেছি। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

দুর্গা ॥ বটে।

কানাই ॥ হ্যাঁ। তাকে ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা করতে গিয়েছিল বলাইদা'—আমি না ! মা কালীর দিব্বি করে বলছি—আমি নই।

চণ্ডী ॥ দুর্গা, এক কেটলি গরম জল। না—আচ্ছা, দাঁড়া।

কানাই ॥ নিজে সব কিছু করে বলাইদা' যে এমন করে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবে এ আমি কখনো ভাবি নি—ভাবতে পারি নি।

দুর্গা ॥ জামাইবাবু যদি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই চাপাবেন, তবে মেয়েটা, কেন লেখে—[চিঠি বাহির করিয়া] "প্রাণের কানাই !"

[দুর্গার হাত হইতে চিঠিটা কাড়িয়া লইয়া চণ্ডী বাকী অংশ চং করিয়া পড়িতে লাগিল]

চণ্ডী ॥ "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেলে—আর এলে না।" ছিঃ ছিঃ —পড়তেও ঘেন্না হয়।

দুর্গা ॥ [চণ্ডীর হাত হইতে চিঠিটি কাড়িয়া লইয়া] না পড়লে তো চলবে না দিদি। বর-সাজে সাজিয়ে ১লা ফাগুন পুরী পাঠিয়ে দিতে হবে যে! এই যে লিখেছে—[পত্রপাঠ]

"তোমার আসার আশায় আর কতোদিন সমুদ্রের ঢেউ গুণিব? তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, ফাল্গুন মাসের প্রথমেই শুভকার্য্য ঘটিতে পারিবে। তোমার সেই কথায় ম্যানেজারবাবু পাঞ্জী দেখাইয়া ওরা ফাল্গুন বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন। কবে আসিতেছ তার করিয়া জানাও। তার না পাইলে আমার হার্টের অসুখ আরো বাড়িয়া যাইবে। কোন দিন এ অভাগীর প্রাণ-পাখী খাঁচা-ছাড়া হইবে—"

আহা-হা! তাই হোক্ না। হলে তো বাঁচি।···দিদি. আসল কথার জবাবটা এখনও আমরা পাই নি কিন্তু। কোন সাহসে মানুষটা সেই কেলে হাতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? সাহসটা কোত্থেকে এলো শুনি? আমি কি মরে গেছি?

চণ্ডী ॥ মরে গেছিস কি বেঁচে আছিস দেখাচ্ছি [কানাইকে] কি বলবে বল।

কানাই ॥ কী আর বলবো দিদি! এতো করেতো বললুম, তাওতো বিশ্বাস করছো না।

চণ্ডী ॥ বিশ্বাস করবার মতো কথা হলেই বিশ্বাস করা যায়। বিয়ে করতে না চাইলে কি করে তার সাহস হয় ঐ চিঠি লিখতে?

দুর্গা ॥ তা' নয়তো কি? দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে এই মানুষটার কাছে চিঠি লেখে কেন? আর তার ঠিকানাই বা পেলে কি করে?

চণ্ডী ॥ 'মানুষ-মানুষ' করিসনে দুর্গা। এরা আবার মানুষ! আঁস্তাকুড়ের

সব জঞ্জাল। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] ঝাঁটাগাছটা আন্। সব জঞ্জাল আজ ঝেঁটিয়ে সাফ করবো।

[ভৃত্য গণেশ খান দুই ডাকের চিঠি লইয়া আসিল]

গণেশ॥ বাবু, চিঠি।

দুর্গা॥ এই গণ্শা, আমার হাতে দে।

[গণেশ চিঠিগুলি দুর্গার হাতে দিয়া চলিয়া গেল]

কানাই॥ যাক্ নীল খাম-টাম নেই। আতরের গন্ধও পাচ্ছি না।

চণ্ডী॥ ও—সেজন্যে বুঝি খুব আফশোস হচ্ছে? হ্যাঁরে দুর্গা, তোর মাছ-কাটা বঁটিটা অতো ছোট কেনরে?

দুর্গা॥ দ্যাখোতো দিদি এই চিঠিটা—পুরী থেকেই এসেছে। নাম লিখেছে —তারানাথ রায়—ম্যানেজার। কী জানি বাপু, এতো পাকা লেখা আমি পড়তে পারি না।

চণ্ডী॥ দে না—পাকা হাতেই দে। [কানাইকে] পড়। ঠিক ঠিক পোড়ো কিন্তু —বাদ-সাধ দিও না।

[কানাই উক্ত চিঠিটি লইয়া পড়িতে লাগিল]

কানাই॥ মান্যবরেষু!

মাননীয় কানাইবাবু, আমার দুর্ভাগ্য—এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আপনাকে জানাইতে হইতেছে। আমাদের এস্টেটের মালিক শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি আট ঘটিকায় হঠাৎ স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।"

চণ্ডী॥ জয় মা কালি! খুব বিচার করেছো মা

দুর্গা॥ খুব বাঁচিয়েছো। কালীঘাটে গিয়ে জোড়াপাঁঠা দিয়ে আমি তোমার পুজো দেবো মা।

কানাই॥ কিন্তু একি! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমার মাথা ঠিক আছে তো?

দুর্গা॥ কেন? কি হলো?

চণ্ডী ॥ মরেও বুঝি তবে আবার বেঁচে উঠেছে।

কানাই ॥ ওগো, তোমরা আমাকে ধর। আমার হাত-পা কাঁপছে—আমার মাথা ঘুরছে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।…এক লাখ নয়, দু লাখ নয়, দশ লাখ টাকা—দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—

দুর্গা ॥ ওগো, অমন করছো কেন? বল না কি হলো?

চণ্ডী ॥ আ মর্! লোকটা পাগল হলো না কি?

কানাই ॥ পাগল হবারই কথা। দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—মরবার কিছু আগে উইল করেছে আমার নামে।

চণ্ডী ॥ হতেই পারে না।

দুর্গা ॥ না, না, তা' হতে পারে। কই দেখি কি লিখেছে।

[কানাইয়ের হাত হইতে চিঠি লইয়া পাঠ]

"……আপনি কথা দিয়াও না আসায় তিনি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দিন দিন ওজন কমিতে থাকে। আড়াই মণ হইতে এক মাসেই দেড় মণে দাঁড়ায়। উহা আপনার ভৌতিক চিকিৎসার ফল মনে করিয়া আমরা আনন্দেই ছিলাম্। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন—আপনাকে না পাইলে আর বাঁচিবেন না। কি মনে করিয়া দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সমুদয় সম্পত্তি আপনার নামে গোপনে উইল করেন। অন্তিমকালে ইহা প্রকাশ করিয়া যান। আপনিই এখন আমাদের মালিক। শীঘ্র আসিয়া এই বিশাল সম্পত্তি বুঝিয়া লউন।"

দুর্গা ॥ ওগো, তা হ'লে তো তোমাকে এখনই পুরী রওনা হ'তে হয়।

চণ্ডী ॥ না, না, সে কি করে হয় দুর্গা? চিকিৎসা করলেন তোর জামাইবাবু—বিয়ের কথাও হলো তোর জামাইবাবুরই সঙ্গে—ঐ কানাই-ই তো সে কথা একশো বার বলেছে—পুরী তবে ও যাবে কেন? যাক্ তোর জামাইবাবু। আমি যাচ্ছি—আজ রাতের গাড়ীতেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গা ॥ জামাইবাবু গেলেই তো হবে না। উইলটা হয়েছে আমার কর্তার নামে। কিগো বল না। ঘটনাটাতো তোমার সঙ্গেই ঘটেছিল। সত্যি কথা বলতে ভয় কি ?

কানাই ॥ না, না, ভয় আবার কি ! বিশেষ, এখন। তবে, শুনবে সত্যি কথা ?

চণ্ডী ॥ সত্যি কথাটাই তো শুনতে চাইছি।

কানাই ॥ তবে শোনো। আমি মিথ্যে বলি নি। নাটের গুরুটি হচ্ছেন ঐ বলাইদা। যাতায়াত, ঝাড়ফুঁক—তা ছাড়া আর যা যা সব ঘটনা—

চণ্ডী ॥ তাই যদি হবে, সম্পত্তিটাও তবে তোমার বলাইদাই পাবে। কি বল ভাই ?

কানাই ॥ উঁহুঁ। পাবো আমি।

চণ্ডী ॥ কেন ?

কানাই ॥ তোমার জন্যে দিদি—তোমার জন্যে। তোমার জিভকে ধন্যবাদ—তোমার কেটলিভরা গরমজলকে ধন্যবাদ—তোমার সাঁড়াশি···ঝাঁটা-বঁটি—সব কিছুকে ধন্যবাদ।

চণ্ডী ॥ মস্করা রাখো। ব্যাপার কি বল ?

কানাই ॥ ব্যাপারটা অতি সোজা কথা কথা। প্রেম করলেন বটে বলাইদা। কিন্তু তোমার কাছে কোনদিন ধরা পড়বেন ভয়ে তার কাছে নাম-ঠিকানা দিলেন আমার। আমি জানলুম—বলাই অধিকারী······তিনি জানলেন—কানাই চৌধুরী।···হ্যাঁ, আমাকে সব বলে-কয়েই দাদা আমার এই অঘটনটি পুরীতে ঘটিয়ে এসেছেন। ঐ যে দাদাও আমার এসে গেছেন। এসো দাদা—এসো—

[বলাই অধিকারীর প্রবেশ]

এই নাও—পুরীতে গিয়ে যা সব কাণ্ডকারখানা করে এসেছো, এখন তার ঠ্যালা বোঝো।

বলাই ॥ আমি আবার কী কাণ্ড করেছি। আমি ও সবে নেই। [চণ্ডীকে] ওগো, সেই কখন এ বাড়ীতে এসেছো। লোকটা যে আপিস থেকে ফিরে একলা

ঘরে বসে আছে—এক পেয়ালা চা না পেয়ে গলা শুকিয়ে মরছে—সে ভাবনা বুঝি নেই ?

দুর্গা ॥ বসুন—জামাইবাবু। আমি চা-জলখাবার আনছি।

কানাই ॥ খালি চা-জলখাবারে আজ আর চলবে না। সের দশেক সন্দেশ আনাও।

দুর্গা ॥ তা আনাবো বৈকি।

বলাই ॥ ব্যাপার কি ?

চণ্ডী ॥ ব্যাপার তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। চিঠিখানা পড়।

[চিঠিখানি দুর্গার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া বলাইয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল। বলাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল]

বলাই ॥ ওরে বাবা! [পুনরায় পাঠ] এরে বাবা !! [পুনরায় পাঠ] ওরে বাবা !!!

[পাঠ শেষ হইলে চিঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল]

[মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে] এ আমি কি করেছি রে—কি ভুলই আমি করেছি রে—হায় হায় হায়—

চণ্ডী ॥ কি করেছো এখনো টের পাও নি। চল আগে বাড়ী—তারপর বুঝবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া! জাতও গেল, পেটও ভরলো না। আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

দুর্গা ॥ আহা—হা—দিদি, ছাড়ো—ছাড়ো। জামাইবাবু একবার না হয় ভুল করেছেন,—আর ভুল করবেন না। বুঝলেন জামাইবাবু, এবার থেকে যা করবেন, নিজের নামেই করবেন। দিদির শিক্ষা হয়েছে—আর কিছু বলবে না।

[কানাই ও বলাই উভয়ে হাসিয়া উঠিল]

কানাই ও বলাই ॥ [একযোগে] তা বটে! তা বটে !!

[ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৬১]

টিয়া

[একটি শয়নকক্ষ। খুব বড় একটি জানালার পাশে একখানি খাট। জানালার বাহিরেই সুবিস্তৃত বারান্দা। কক্ষের যেদিকে এই জানালা সেই দিকেই কক্ষের দরজা, দরজার সম্মুখেও ঐ বারান্দা। বারান্দার নিচে ছোট একটি ফুলের বাগান। তাহার পরই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালে লতানো গোলাপের গাছ।

ঘরে খাটের উপর রোগ-শয্যায় একটি ছোট মেয়ে, বছর দশেক বয়স হইবে। নাম টিয়া। তাহার মাথার কাছে তাহার মা করুণা বসিয়া আছেন। খাটের পার্শ্বে টিপয়, তদুপরি একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছে, এবং ঔষধপত্র, থার্মোমিটার প্রভৃতি রহিয়াছে।

বারান্দায় কয়েকখানি চেয়ার। তাহাতে টিয়ার পিতা মনুজনাথ এবং তাঁহারই আত্মীয়-স্বজন এবং ডাক্তার বসিয়া আছেন।

বারান্দায় ঠিক জানালার সম্মুখে একটি টিয়া পাখীর খাঁচা ঝুলিতেছে। খাঁচাতে পাখী নাই, খাঁচার দরজাটি খোলা। টিয়াপাখীটি উড়িয়া গিয়া দেওয়ালের উপর বসিয়া আছে।

মেয়েটির অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটাও ভালো লাগিতেছে না; তাহারই তালে তালে সকলের বুকের দুরু দুরু শব্দও বুঝি শোনা যায়।—আসন্ন সন্ধ্যা]

মনুজনাথ॥ সন্ধ্যাটাও কি পার পাবে না ডাক্তার?

ডাক্তার॥ নিশ্চয়।

[পার পাইবে কি পাইবে না, কোনটা নিশ্চয়, ভাল বোঝা গেল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতেও কেহ সাহসী হইল না]

মনুজনাথ॥ ডাক্তার তুমি আর একটা ইন্‌জেক্‌সন দাও—

ডাক্তার॥ না।

ললিত॥ ঐটুকু মেয়ে···আর কত সইবে!

অমিয়॥ বেশ ঘুমুচ্ছে···ওকে আর জ্বালাতন···

ডাক্তার ॥ রোগ হলেই জ্বালাতন হতে হয়।···আপনারা মনে ভাবছেন ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ওকে ঘুম বলা চলে না। তবে, ইন্‌জেকসনেরও আর প্রয়োজন নেই।

[গভীর নিস্তব্ধতা]

মনুজনাথ ॥ একি! করুণা উঠে আসছে!

ডাক্তার ॥ এইবার যদি ওঁকে অন্য কোন ঘরে পাঠাতে পারেন। বিশ্রাম ওঁর নিতান্ত আবশ্যক। রাতের পর রাত জেগে, দিনরাত রোগীর পাশে থেকে থেকে ওঁর চেহারা যা হয়েছে, দেখলে আমারি ভয় পায়—ওঁর কোন গুরুতর অসুখ করেছে নিশ্চয়।

মনুজনাথ ॥ টিয়া ওর প্রাণ। টিয়া না বাঁচলে ওকেও বাঁচানো যাবে না ডাক্তার। আহার নিদ্রা ও সাধ করে ত্যাগ করেনি!

ডাক্তার ॥ কিন্তু তবু···

মনুজনাথ ॥ চুপ।

[করুণা তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মনুজনাথ ॥ কি করুণা?

করুণা ॥ [দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া] টিয়া-টা এখনো···আছে!

মনুজনাথ ॥ কিন্তু আমাদের টিয়া? ঘুমুচ্ছে? কি বুঝছ?

করুণা ॥ হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে, কিন্তু কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে তবে ঘুমিয়েছে!

মনুজনাথ ॥ কি—কি বললে?

করুণা ॥ ওর ঐ মিতার কথা! তোমার কথা নয়, আমার কথাও নয়, ফল-ফুল-খেলনা···কোন কথাই নয়, শুধু ঐ টিয়ারই কথা!

মনুজনাথ ॥ ওটাকে ধরবারও তো কোন উপায় দেখছি না। ধরতে গেলেই—

করুণা ॥ [আতঙ্কে] না—না—

ললিত ॥ কি করে ওটা খাঁচার বাইরে গেল?

মনুজনাথ ॥ ডাক্তার কবরেজ নিয়েই আমরা ব্যস্ত, সেই ফাঁকে—

ডাক্তার ॥ টিয়ার টিয়া-টি—

করুণা ॥ চুপ। কথা আছে, শুনুন—

ডাক্তার ॥ [করুণাকে] আপনি বসুন না—

করুণা ॥ না। ব'সে গল্প করবার মতো শক্তি আমার নেই! শুধু একটা কথা···জীবন-মরণের কথা···

[গভীর নিস্তব্ধতা]

মনুজনাথ ॥ কি কথা করুণা ?

করুণা ॥ জীবন-মরণের কথা।

মনুজনাথ ॥ সে কি করুণা ?

করুণা ॥ হ্যাঁ, জীবন-মরণের কথা। তন্দ্রায় আমি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন কেন, আমার মনে, আমার প্রাণে সেই পরম সত্য ধরা দিয়েছে—

মনুজনাথ ॥ কি করুণা, কি ?

করুণা ॥ টিয়ার প্রাণ ঐ টিয়া। ঐ টিয়া যে-মুহূর্তে এখান থেকে উড়ে পালাবে, আমার টিয়াকেও সেই-মুহূর্তেই হারাবো—[বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত ক্রন্দন রোধ করিয়া মেয়ের কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন]···

···[গভীর নিস্তব্ধতা। সকলে দেওয়ালের উপর উপবিষ্ট পাখীটির দিকে চাহিয়া রহিল]

ডাক্তার ॥ ঐ টিয়া পাখীটি দেখছি রহস্যময় হয়ে উঠল।

মনুজনাথ ॥ ডাক্তার, এ কখনো সত্যি হতে পারে ?

ডাক্তার ॥ কেন ঠাকুমা-ঠাকুর্দার মুখে শোনেননি এমনি ধারা রূপকথা: রাক্ষসের প্রাণ ভোমরা ? রাজকন্যা জানতে পেরে প্রাণ-ভোমরা মারতেই মরে গেল রাক্ষস! বিশ্বাস হতো না কি, যখন হাঁ করে শুনতেন ?

মনুজনাথ ॥ কিন্তু ডাক্তার, কিন্তু···

ডাক্তার ॥ এখন তা সত্যি হয় কি না—এই তো ?

মনুজনাথ ॥ বল ডাক্তার, বল—

ডাক্তার ॥ 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।'—বিশ্বাসে সব হয়!

মনুজনাথ ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার ॥ চুপ। চীৎকার করবেন না, টিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যাবে—

ললিত ॥ পাখীটাও ভয়ে উড়ে যেতে পারে—

[গভীর নিস্তব্ধতা]

ডাক্তার ॥ ঐ পাখীটির কি বিশেষ কোন ইতিহাস আছে ?

মনুজনাথ ॥ কিছু না। আমার মার ছিল একটা পোষা টিয়াপাখী। আমাকে তিনি বেশি ভালবাসতেন কি ঐ পাখীটাকে বেশি ভালবাসতেন, এ প্রশ্নটা সকলের সঙ্গে আমারও মনে জাগতো। আমার ঐ মেয়ে হ'ল, আদর করে মেয়ের নামও তিনি রাখলেন টিয়া। কিছুদিন পরে পাখীটা মারা গেল। মা তখন ঐ টিয়াটাকে কিনে এনে নাতনীকে দিলেন, কিন্তু, নিজেও আর বেশি দিন বাঁচলেন না। এই তো ওর ইতিহাস।

ডাক্তার ॥ এ ইতিহাসে কোন বিশেষত্ব আছে কিনা সে কথা আলোচনা না করে আমি বরং এইটাই জানতে চাই, ও টিয়া-টা নিয়ে কে বেশি মাথা ঘামায়··· মেয়ে, না মা ?

মনুজনাথ ॥ তুজনেই। আমার বাড়ীতে ঐ পাখীটার যা আদর, আমারো সে আদর ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে কি···এ কথা···করুণার ঐ কথা··· কখনো সত্যি' হয় ডাক্তার ?

ডাক্তার ॥ মনে-প্রাণে যখন কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, তখন সে বিশ্বাস বিশেষ শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়। সেই শক্তিতেই সে সত্যি হয়, এটা আমি সত্যিসত্যিই দেখেছি।

মনুজনাথ ॥ ডাক্তার—ডাক্তার—

ডাক্তার ॥ মার ঐ বিশ্বাস মেয়ের মনে সংক্রামিত না হলেই মঙ্গল!

অমিয় ॥ সকলের চেয়ে মঙ্গল ঐ পাখীটি যদি উড়ে না পালায়।

ললিত ॥ এও তো হতে পারে, রাতদিন মেয়ের জন্যে ভেবে ভেবে—অনাহারে আর অনিদ্রায় করুণা-মাসীর এই মানসিক বিকার হয়েছে।

[করুণা আসিতেছেন দেখা গেল]

মনুজনাথ ॥ চুপ।

[নিস্তব্ধতার মধ্যে করুণা আসিয়া দাঁড়াইলেন]

করুণা ॥ [পাখীটার দিকে চাহিয়া] ওরে আমরা কি দোষ করেছি যে তুই পালাবি? ফিরে আয়! ওরে, ফিরে আয়!

মনুজনাথ ॥ [করুণাকে] ওদিকে যেয়ো না···ও হয় তো···হ্যাঁ, ঐ যে—

করুণা ॥ চুপ—চুপ—

[নিস্তব্ধতা]

ললিত ॥ না, আর ভয় নেই। ও স্থির হয়ে বস্‌ল।

করুণা ॥ ও খাঁচায় কেন ফিরে আসে না, কেউ বলতে পার? ওকে কি আদরই না করি ···কি যত্নেই না ওকে রাখি; তবু আজ···! ওরে আয়—আয়—তোর পায়ে পড়ি, ফিরে আয়—

ডাক্তার ॥ আপনি বসুন। আপনার টিয়ার কথা বলুন—এখন কেমন বুঝছেন?

করুণা ॥ জেগেছে। জেগেই বললে মিতা কই? আমি দেখালুম। বল্‌লে,—মা, ও আজ আকাশে উড়বে। এখানে আর ওর মন নেই। ও আমার সব গল্প শুনেছে, শুনে ওরও মন ছুটেছে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কে চলে জানতে, রামধনু কার ধনু তাই দেখতে, সূর্য্যিঠাকুর কোন পাটে ওঠেন, কোন ঘাটে ডোবেন জানতে, চাঁদের মাঝে যে বুড়ী চরকা কাটে তাকে দেখতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষে বলে,—মাগো, আমার যদি পাখা থাকতো! ওর মত আমার যদি পাখা থাকতো! দুজনে এক সঙ্গে উড়ে যেতুম আজ!

মনুজনাথ ॥ চুপ—[অঙ্গুলিসঙ্কেতে টিয়াটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন]

করুণা ॥ সর্বনাশ! [ছুটিয়া, ঘরে মেয়ের কাছে গেলেন]

অমিয় ॥ না, স্থির হয়ে বসেছে। আর ভয় নেই।

ললিত ॥ ওটাকে ধরবার কোন উপায় নেই?

মনুজনাথ ॥ [সাতঙ্কে] না—না—, ধরতে গেলে যদি উড়ে পালায় !

ডাক্তার ॥ জোর করে কি কাউকেই ধরে রাখা যায় ললিতবাবু ?

মনুজনাথ ॥ করুণা আবার,—[ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন] কি করুণা ?

করুণা ॥ ওর জন্যে যে নতুন শাড়ী এনেছ, নতুন জুতো, নতুন জামা, নতুন ওড়না···ও চাইছে। এখনি, এখনি—

মনুজনাথ ॥ ললিত, মল্লিকাকে বল—

ললিত ॥ [ছুটিয়া যাইতে যাইতে] এখনি আনছি—

করুণা ॥ বলে,—এ পুরোণো জামা-কাপড় আর নয় মা ; নতুন জামা-কাপড় দাও, আজ আমি নতুন সাজে সাজব—হ্যাঁ,···খুব খুশি মনেই বল্‌লে।

ডাক্তার ॥ আমি বরং একবার দেখে আসি—

করুণা ॥ না, না দরকার নেই। কোন দরকার নেই। আপনাকে ও দেখতে পারে না। আপনি গেলে ওর মন আবার বিষিয়ে উঠবে !

ডাক্তার ॥ তবু···একটিবার···

করুণা ॥ না। কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন ডাক্তারবাবু ? বিশেষ এখন ? এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর অসুখই আর নেই। তবে কেন মিছিমিছি ওকে—

মনুজনাথ ॥ হ্যাঁ ডাক্তার, তুমি বরং···ওরে, ডাক্তারবাবুকে চা দেওয়া হয় নি ! [নূতন জামা-কাপড় লইয়া ললিত আসিল] এই যে ললিত—

করুণা ॥ [ললিতের দিকে ছুটিয়া গিয়া] দাও, দাও। নতুন এই জামা-কাপড় পরলে ওর আর কোন অসুখই থাকবে না—এমনি খুশি হবে। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন না। দেখুন—কিন্তু কাছে গিয়ে নয় ; দূর থেকে, আড়াল থেকে—

[জামা-কাপড় লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন]

মনুজনাথ ॥ ললিত—ললিত—তুমি ছুটে দোকানে-দোকানে গিয়ে এখনি আরো সব শাড়ী—আরো সব জামা—ওর সারাটি দেহ মুড়ে দিতে দোকানে যা আছে···সব—স-ব—যত দামই হোক—যাও—যাও—

ডাক্তার ॥ কিন্তু—আচ্ছা, যাও। [ললিত চলিয়া গেল]

মন্নুজনাথ ॥ ডাক্তারের চা এলো না! অমিয়, তুমি যাও ভাই—

অমিয় ॥ যাচ্ছি—

মন্নুজনাথ ॥ আচ্ছা, শোনো। তুমিও যাও অমিয়—খেল্‌না, বুঝলে অমিয়, রং-বেরং-এর অ্যা তো খেল্‌না···কাঠের, রবারের, কাঁচের। লাটিম, বল, নৌকো, হাতী-ঘোড়া, সাপ, একটা বাঁশি, লুডো, কিছু জলছবি, হাতীর দাঁতের একটা বাক্স—ঐ সওদাগরী দোকানে আছে, শ্বেত-পাথরের তাজমহল···। হ্যাঁ, রান্নাবান্না ওর ভারী সখ—খেল্‌নার কড়াই, ডেক্‌, হাতা, খুন্তি, বেড়ী—জানো তো সব?

অমিয় ॥ জানি···

মন্নুজনাথ ॥ পূজো করতে ওর ভারী সখ। ছোট রেকাবি, পেতলের সাজি, চন্দনের বাটি, ধূপদানী, পঞ্চপ্রদীপ—মনে থাকবে?

অমিয় ॥ থাক্‌বে।

মন্নুজনাথ ॥ দাঁড়াও। ও যেন আমার কাছে সেদিন কি চেয়েছিল, দিতে পারি নি,···কিন্তু আজ তো তা মনে পড়ছে না!···টিয়া টিয়া—

অমিয় ॥ চুপ। ঐ দেখুন—[অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পাখীটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। পাখীটি উড়িবার উপক্রম করিতেছিল মনে হইল।···গভীর নিস্তব্ধতা]

মন্নুজনাথ ॥ না—না, আর ভয় নেই। ও ভালো করে বস্‌ল।···কি চেয়েছিল—কি চেয়েছিল···[স্মরণ করিতে না পারিয়া] মনে পড়ে না! আচ্ছা ভাই, তুমি এসো—ফিরতে কিন্তু ভাই বিলম্ব করো না—কোনটাই ভুলো না—

[অমিয় যাইতেছিল]

ডাক্তার ॥ ভুলো না। খেলনা—পূজোর বাসন—এবং···

অমিয় ॥ এবং—?

ডাক্তার ॥ যাবার পথেই—

অমিয় ॥ বলুন—

মন্নুজনাথ ॥ কি ভুল করলুম ডাক্তার?

ডাক্তার ॥ এক পেয়ালা চা। [হাসিয়া অমিয় চলিয়া গেল। এদিকে করুণা আসিয়া দাঁড়াইল]

মনুজনাথ ॥ করুণা, খবর ?

করুণা ॥ লণ্ঠনকে দেখেছ ?

ডাক্তার ॥ লণ্ঠন !

করুণা ॥ রায় বাড়ীর সেই ছেলেটা গো। লণ্ঠনকে এখনি না পেলে তো আর চলছে না।

মনুজনাথ ॥ কেন ? কেন ?

করুণা ॥ পুরাণো জামা-কাপড় ছেড়ে নতুন জামা-কাপড় পরতে এখন এক আপত্তি দাঁড়িয়েছে।

মনুজনাথ ॥ কি আপত্তি ?

করুণা ॥ বলে নতুন সাজে যে সাজব, খোঁপাতে কি দেব ?

মনুজনাথ ॥ কি চাই ?

করুণা ॥ তোমার কাছে সে তো চেয়েছিল। তুমি দাওনি।

মনুজনাথ ॥ চেয়ে যে ছিল তা' মনে পড়ছে, কিন্তু কি যে চেয়েছিল সেইটে কিছুতেই মনে পড়ছে না। কি চেয়েছিল ?

করুণা ॥ ফুল।

মনুজনাথ ॥ হ্যাঁ, ফুল। আমি এখনি দিচ্ছি···

করুণা ॥ কিন্তু কি ফুল ?

মনুজনাথ ॥ [স্মরণ করিতে চেষ্টা।—না পারিয়া] কি ফুল ?

করুণা ॥ অভিমানিনী তা আজ আর তোমায় বলবে না। আমায়ও বললে না। বলে, ঘরের লোক যা দেয়নি, বাইরের লোক তাই দেবে। বাইরের সেই লোক, লণ্ঠন।

মনুজনাথ ॥ তা দিক্···সেই দিক্···কোথায় সে ?

করুণা ॥ তার খোঁজে এখনি লোক পাঠাও, নইলে অনর্থ হবে—

মনুজনাথ ॥ [একজনকে] খুঁজে আনো ভাই রায় বাড়ির সেই লণ্ঠনকে, তাকে এখনি যেথান থেকে পার ধরে আনো—

করুণা ॥ তাকে গিয়ে বল, টিয়াকে তুমি কি ফুল দিতে চেয়েছিলে—দাওনি

কেন? টিয়া যে তোমার আশায় বসে আছে। শীগ্‌গির গিয়ে টিয়াকে সেই ফুল দিয়ে এস। ব'লো টিয়া কাঁদছে···টিয়া রাগ করে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

[সে চলিয়া গেল]

ডাক্তার ॥ লণ্ঠন! বাপ-মা আর নাম পায়নি!

করুণা ॥ তাই টিয়া হেসে বলে সূর্য্যি যখন ডুবে যাবে, তুমি ভাই লণ্ঠন আমার পাশে থেকো, তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকবো, আঁধারের মুখ দেখব না!

ডাক্তার ॥ সূর্য ডুবতে তো আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কোথায় লণ্ঠন—আর কোথায় বা—

করুণা ॥ কি?

ডাক্তার ॥ আমার সেই এক পেয়ালা চা!

মনুজনাথ ॥ মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—কি ফুল···আমার মনে পড়েছে—কিন্তু ওঃ [অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

করুণা ॥ ও কি! অমন করছ যে? কি ফুল?

মনুজনাথ ॥ না—না—ওঃ।

করুণা ॥ [মনুজনাথের প্রতি] কি ফুল, ওগো বল না···কি ফুল?

মনুজনাথ ॥ ঐ লতানে গোলাপ···হলুদ ঐ মার্সাল নীল···দেওয়ালের ঐ মাথায়···টিয়াপাখীর ঠিক্ নিচে—ঐ যে ফুটে রয়েছে!

করুণা ॥ সর্বনাশ! ও ফুল এ গাঁয়ে···

মনুজনাথ ॥ কোথাও নেই—কোথাও নেই—তাই আমি ও-ফুল সেদিন তুলিনি···কিন্তু আজ—

করুণা ॥ আজ তুলবে?

মনুজনাথ ॥ তুলব?

করুণা ॥ [ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] না!

মনুজনাথ ॥ চুপ—চুপ—[পাখীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পাখীটি প্রায় ওড়ে এই অবস্থা]

করুণা ॥ ওঃ [আর্ত্তনাদ করিয়া, ছুটিয়া ঘরে]

[দেখা গেল দেওয়ালের ওপার হইতে একটি ছোট হাত পাখীটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল সে হাত আর কাহারও নয়, সেই লণ্ঠনের। সে টিয়াটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের উপর উঠিয়া বসিয়া নিচের সেই গোলাপটি ছিঁড়িয়া, একহাতে টিয়া এবং অন্য হাতে ফুল লইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া টিয়ার ঘরে লাফাইতে লাফাইতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে যাহারা তাহাকে চিনিল, তাহারা সমস্বরে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল,—লণ্ঠন! লণ্ঠন!]

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, লণ্ঠন এল, কিন্তু আমার চা ?

[ঘরে বাহিরে সকলেই হাসিয়া উঠিল]

[উত্তরা (বেনারস) কার্তিক : ১৩৩৯

আমরা কোথায়

জবা ॥ আবার এখুনি বেরুচ্ছ দাদাবাবু!

ইন্দ্র ॥ ঘরে বসে কড়িকাঠ গুণে লাভ কিরে জবা!

জবা ॥ দাঁড়াও। চা করেছি। ট্রামে-বাসে গুঁতো খেয়ে চাকরির উমেদারি করে পয়সা নষ্ট, শরীর নষ্ট। আর কত দেখবে? লাভটা কি?

ইন্দ্র ॥ একটা কিছু করতে হবে তো। নইলে চলবে কিসে?

জবা ॥ তোমার চলবে না, তাতে কার কি আসছে যাচ্ছে?

ইন্দ্র ॥ তবু দেখতে হয়। আজ একটা আশা আছে।

জবা ॥ চাকরি পাবে?

ইন্দ্র ॥ পেতে পারি। কই, চা হ'ল?

জবা ॥ ঢালচি। চাকরি হবে তোমার! কী চাকরি তুমি করবে?

ইন্দ্র ॥ কেরানিগিরি। ষাট টাকা মাইনে।

জবা ॥ তোমায় দেবে? কি দেখে?

ইন্দ্র ॥ চেহারা দেখে। কী আবার দেখে।

জবা ॥ চেহারায় তো রাজপুত্তুর। পরিচয় নিলে জানবে জমিদারের ছেলে। ষাট টাকা মাইনের কেরানি তোমাদেরই ছিল ষাট জন। তাস পাশা খেলে দিন কাটিয়েছ, প্রজা ঠেঙ্গিয়েছ। তুমি কেরানিগিরির কি জান?

ইন্দ্র ॥ দেখ জবা, কিছুতেই তোর শিক্ষা হবে না? আবার বকছিস?

জবা ॥ অমন আশা কত পেয়েছ। তোমারি কি শিক্ষা হল?

ইন্দ্র ॥ যাবনা, আর ঘরে বসে গুষ্টিশুদ্ধু তোর গায়ের গয়না বেচে খাব?

জবা ॥ যদ্দিন চলে তাই চলুক না।

ইন্দ্র ॥ খুব লম্বা লম্বা কথা বলছিস যে। হাতে কগাছা সোনার চুড়ি এখনো রয়েছে, তার গরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস যে জবা !

জবা ॥ তা আর পারছি কই! চোখের ওপর দেখলুম রাজা হলেন ফকির। যদি না দেখতুম, তাহলেও বা সোনা-দানার গরব করা চলত। গরব করে বলছিনা দাদাবাবু। বরং বলছি সহর ছেড়ে চল বনে—চল পাহাড়ে। ঝরণার জল, গাছের ফল, এন্তার খাও—গুহা আছে, শোও—

ইন্দ্র ॥ বাকল আছে পর। দিব্যি আরাম। চমৎকার বুদ্ধি।…জংলী ভুত। ছোটজাতের বৌ—তোর মুখে লেখা। ভদ্দর লোকের সাধ্যি কি তোকে ভদ্দর করে! দে, চা দে।

জবা ॥ ভদ্দর হয়ে লাভ যা, তাও তো দেখলুম। জোতজমি জমিদারী—সাত পুরুষের ভিটে—তার চেয়েও বড়, ঠাকুর-দেবতা—ধর্ম—জুজুর ভয়ে যেমন করে ছেড়ে দিয়ে, এক কাপড়ে প্রাণের ভয়ে সব পালিয়ে এলে নোয়াখালি থেকে কলকাতা, অভদ্দর চাষারা তা পারেনি।…নাও চা।

ইন্দ্র ॥ [চায়ে চুমুক দিয়ে] এর নাম চা ?…এ চা তুই খা। [তার গায়ে নিক্ষেপ করে, পেয়ালাটা রেখে, হন হন করে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল…] যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

জবা ॥ [চকিতে সরে যাওয়ায়—চা'র বেশি ভাগটাই মাটিতে পড়ে গেছে। বাকিটা পড়েছে কাপড়ে। জবা শুধু বললে] বেশ, কোন মুখে আবার চা চাও দেখব।

বাড়ীওয়ালা ॥ ছোট বাবুর গলা পেলুম, আছেন তো ?

জবা ॥ বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ বাইরেই তো থাকেন। কাজকর্মের সুবিধা হল কি কিছু ?

জবা ॥ জানি না।

বাড়ীওয়ালা ॥ আমি জানি। হবে না কিছু, তা দেখচেন দেখুন। বড়বাবু কোথায় ?

জবা ॥ ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ কেমন আছেন ?

জবা ॥ ভালো না, হাঁপানি বেড়েছে।

বাড়ীওয়ালা ॥ বেড়েছে ! সে কি ! বাড়বার কথা নয় তো, সারবার কথা। কত লোকের সেরেছে, ওঁর সারল না ! ত্রিকুটের স্বপ্নাদ্য ওষুধ ফেল হয়নি তো কখনো ! আমার গাদা গাদা সারটিফিকেট রয়েছে যে ! নিয়মভঙ্গ হয়েছে নিশ্চয়। হতেই হবে।···চা বুঝি একপাট হয়ে গেছে ? তা বেশ—তা বেশ। [ইন্দ্র ফিরে এল] এই যে ছোটবাবু ! এরি মধ্যে ফিরে এলেন যে !

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ এলুম। পথে গিয়ে মনে হল চা খেয়ে বেরুইনি।

[জবা সেখান থেকে চলে গেল]

বাড়ীওয়ালা ॥ ভাগ্যিস !—তাই দেখা হ'ল। কাজকর্মের সুবিধে হল কিছু ?

ইন্দ্র ॥ কই আর হ'ল মশাই।

বাড়ীওয়ালা ॥ হবে না মশাই, হবে না। বিষুব রাশিচক্রে রবি—রবিপুত্র—সিংহিকার সুত রৌদ্র, সঙ্গে দেব-সেনাপতি, ওরে বাবা ! 'তদা যুদ্ধাকুলা পৃথ্বী—ধনধান্য বিবর্জিতা।'

ইন্দ্র ॥ কিন্তু আপনার তো বেশ হ'ল। পাঁচশ' টাকা সেলামি নিয়ে আমাদের তিনখানি পায়রার খোপ ভাড়া দিয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ হ'ল ! গৃহহানি হ'ল না আমার ? তিন তিনখানা ঘর হাতছাড়া হয়ে গেল না ?

ইন্দ্র ॥ তা বটে !

বাড়ীওয়ালা ॥ দ্বারে দ্বারে সোমত্ত বৌ-ঝি আর বুড়ো বাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আপনাদের কান্নাকাটি সইতে পারলুম না। ভাবলুম···হিন্দুকে হিন্দু না দেখলে দেখবে কে !—তাই নিজে বঞ্চিত হয়ে ঘর তিনখানা ভাড়া দিলুম।

ইন্দ্র ॥ তা তো বটেই।

বাড়ীওয়ালা ॥ না, তা তো বটে নয়। আমি আপনাকে দেখছি, আপনিও আমায় দেখছেন ! কিন্তু আমাদের কেউ দেখছে না। র‍্যাশনের চাল বলুন,

পরণের কাপড় বলুন—আলু, পটল, বেগুন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ এমন কি ঐ পুঁই আর কলমি শাক—মুখ বাঁকিয়ে বসে আছে। কে আমাদের মুখের দিকে চাইছে বলুন।

ইন্দ্র॥ তা যা বলেছেন।

বাড়ীওয়ালা॥ চলে না মশাই। সাধে কি আজ আবার ভাড়া চাইতে এসেছি?

ইন্দ্র॥ বলেন কি মশাই? ভাড়া!

বাড়ীওয়ালা॥ একমাসের আগাম ভাড়া। দেবার কথা ছিল।

ইন্দ্র॥ কিন্তু মাসে মাসে ভাড়া তো মিটিয়ে দিচ্ছি। দিই নি?

বাড়ীওয়ালা॥ কেন দেবেন না। কিন্তু এক মাসের ভাড়া আগাম জমা থাকে। নিয়ম।···রসিদ পাবেন।

ইন্দ্র॥ আপনি তো জানেন নোয়াখালি থেকে কি অবস্থায় এখানে এসেছি। ভিটে-মাটি সব গেছে। গয়না-পত্র লুট হয়ে গেছে। প্রায় একবস্ত্রে শুধু প্রাণ কটি নিয়ে দেশ ছেড়েছি।

বাড়ীওয়ালা॥ তা বটে—তা বটে। তবে মরা হাতী লাখো টাকা, এই যা। রিলিফ সেণ্টারে যখন থাকলেন না—তখন বুঝতে হবে—

ইন্দ্র॥ থাকলুম না নয়। থাকা গেল না।

বাড়ীওয়ালা॥ তবেই দেখুন বড়লোক না হ'লে—

ইন্দ্র॥ বাবার অবস্থা দাঁড়াল, এখন-তখন। রিলিফ সেণ্টারে দারুণ বিশৃঙ্খলা। বাবা কাঁদতেন আর বলতেন, আমায় বাড়ী নিয়ে চল্। হাতে টাকা নেই, পয়সা নেই; চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না, পথ্য পর্যন্ত দিতে পারি না। বাবার এ দৃশ্য সইতে পারলে না দলের একটি মেয়ে—এক নমঃশূদ্রের বৌ। ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র তখন এক হয়ে গেছে। দুঃখের মধ্যে দিয়ে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে—সত্যিকার আত্মীয়তা।

বাড়ীওয়ালা॥ শাস্ত্রেও বলে স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। ঐ জবা বলে যাকে ডাকেন, সেই তো?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, জবা। প্রখর বুদ্ধি, খানকতক গয়না ছিল—সব কটাই বাঁচাতে পেরেছিল। তাই বেচে বাসা করলে। সেই বাসা এই বাসা।

বাড়ীওয়ালা ॥ ভালোবাসা হলেই বাসা ভাল হয়। [চা নিয়ে জবা এলে] নিন—চা নিন [চায়ে চুমুক দিয়ে] চা-ও ভালো। বেশ চা।

জবা ॥ এ চা আপনার বাড়ির। চেয়ে আনলুম। আমাদের চা ছোটবাবু খেতে পারেন না।

বাড়ীওয়ালা ॥ করেছ কি! আমার বাড়ির চা আমি আবার খেতে পারি না। কি সর্বনাশ! কি খাচ্ছি?

জবা ॥ কর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি। ঐ তো দোরের আড়ালে রয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ কি সর্বনাশ, এতো ভালো চা! দেখেই তা বুঝেছি। পরের বাড়ির চা আমার পোষায় না।

জবা ॥ ছোটবাবু আবার বাড়ির চা ছুঁড়ে ফেলে দেন। আপনার বাড়ির চা বলেই খাচ্ছেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ সে কি মশাই!…নাঃ দেখচি চা খাওয়াটাই কিছু নয়। আর যদি খেতেই হয়, বাড়ির চা খাবেন। আর বাড়ি-ভাড়াটা আগাম দেবেন। চল গো, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

জবা ॥ [মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল]

ইন্দ্র ॥ হাসচ যে?

জবা ॥ ভদ্দর লোক এখনি আবার ফিরে আসবে।

ইন্দ্র ॥ কেন?

জবা ॥ ও বাড়ির চা—দোরের আড়ালে গিন্নী—সব মিছে কথা। বাড়ি গিয়ে কথা পাড়লেই কুরুক্ষেত্র বাধবে।

ইন্দ্র ॥ কি সর্বনাশ!

জবা ॥ ভেবেছে কি, ওকে আমি সহজে ছাড়ব?

ইন্দ্র ॥ সে কিরে জবা?

জবা ॥ করেছে কি জানো ?

ইন্দ্র ॥ কি ?

জবা ॥ ডাক্তারি ওষুধে বাবার হাঁপানি সারছে না। ও এসে বলেছে ত্রিকূট বাবার স্বপ্নাদ্য ওষুধ আছে—অব্যর্থ—১০৮ টাকা দিয়ে ত্রিকূট-যজ্ঞ করে সে ওষুধ দেন ত্রিকূট বাবা।

ইন্দ্র ॥ ১০৮ টাকা !

জবা ॥ যে কষ্ট পাচ্ছেন তা যদি সারে—১০৮ টাকা বড় কথা নয়। একদিন হাঁপানির খুব টান উঠেচে, প্রাণটা বেরিয়ে যায়—মীরাদিদি সেবা করছিল আর কাঁদছিল—তখন বাবা তাকে বললেন ঐ ওষুধ এনে আমায় বাঁচা মা মীরা।

ইন্দ্র ॥ মীরা টাকা পাবে কোথায় ! আমায় কেন বলেন নি ?

জবা ॥ কেন বলেননি বাবাই জানেন। আমায়ও বলেননি। রোগের যন্ত্রণায় মীরাকে কাছে পেয়ে মীরাকেই বলেছিলেন। মীরা সেই থেকে আহার নিদ্রা ছাড়ল। যে মেয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায়নি, সেই মীরা কাজের খোঁজে কোথায় ঘুরেছে আর কোথায় না ঘুরেছে !

ইন্দ্র ॥ সে কি ! আমি জানি না !

জবা ॥ তুমিও বাইরে বাইরে থাকো—কি করে জানবে !

ইন্দ্র ॥ মীরা। শেষে মীরা !

জবা ॥ মীরাকে আমার হাতের এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করতে বলেছিলুম। মীরা বললে, না রে জবা, বাবা আমারি কাছে চেয়েছেন, এই প্রথম চাওয়া—এই শেষ চাওয়া—আমাকেই তা দিতে দে।

ইন্দ্র ॥ মীরা দিয়েছে ? কী করে দিলে ? কোথায় পেলে টাকা ?

জবা ॥ কাল পেয়েছে। শুশ্রূষার কাজ। আগাম টাকা নিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ আর সেই টাকা দিয়েছে ঐ পিশাচটাকে ?

জবা ॥ হুঁ, দিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ অথচ ব্যারাম বাবার বেড়েই চলেছে। আর এরি জন্যে আমার বোন

—যে কোনোদিন ঘরের বাইরে বের হয়নি—। আমি ঐ রাস্ক্যালকে আজ খুন করব !—না—না, ছাড়ো, আমায় ছাড়ো—

জবা ॥ ছিঃ দাদাবাবু, ঐ যে বাবা আসচেন। বাবা কি বলেন শোন !

[কাস্‌তে কাস্‌তে মহেন্দ্র দাসের প্রবেশ]

ইন্দ্র ॥ বাবা !

মহেন্দ্র ॥ বল।

ইন্দ্র ॥ ত্রিকুটের ওষুধ খেয়েছ তুমি ?

মহেন্দ্র ॥ খাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ উপকার বুঝছ ?

মহেন্দ্র ॥ না।

ইন্দ্র ॥ ১০৮ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়েছে ?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আমার মীরা মা দিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ ওষুধ দিয়েছে ঐ বাড়িওয়ালা ?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা।

ইন্দ্র ॥ শালাকে আজ আমি দেখচি—

মহেন্দ্র ॥ সে কি ! এই—দাঁড়াও।

ইন্দ্র ॥ এই সব বুজরুকি সহ্য করব ?

মহেন্দ্র ॥ বুজরুকি ! দুপাতা ইংরেজি পড়ে—এসব হল বুজরুকি ! এই পাপেই আজ এল পাকিস্তান !

ইন্দ্র ॥ বলুন। আমিও বলতে পারি কেন এল পাকিস্তান। কিন্তু তর্ক থাক। ১০৮ টাকা দক্ষিণায় বাবা ত্রিকূটনাথের স্বপ্নাদ্য মাদুলি যদি অব্যর্থ ই হবে, কই সারল ব্যারাম ? বুজরুকি নয় ? আমি চিটিং কেস করব।

মহেন্দ্র ॥ ব্যারাম সারবে। ত্রিকূট বাবার কথা মিথ্যা হবে না—হতে পারে না। বাড়িওয়ালা নিজে পাহাড়ে গিয়ে বাবার শ্রীমুখে শুনে এসেছে। কত শত লোক ভালো হয়ে গেছে। একটা নিয়ম আছে—সেই নিয়মটা পালন করতে পারছি না—আমার ব্যারাম তাই সারছে না। অতি সাধারণ—অতি সহজ—

অতি ছোট একটা নিয়ম—এত সোজা যে লোকে শুনলে হাসবে—কিন্তু এত চেষ্টা করেও সে নিয়মটা মানতে পারছি না। দোহাই ত্রিকূটেশ্বর! আমায় শক্তি দাও—ঐ নিয়মটুকু পালনের শক্তি দাও—আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

[কাসতে কাসতে কোনক্রমে কথাগুলি শেষ করলেন। জবা তাঁকে ধরে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেল।···ক্ষণেক নিস্তব্ধতা। স্তব্ধ ইন্দ্রকে সচকিত করলে বাইরের দরজায় করাঘাত। দরজা অর্গলবদ্ধ ছিল না—খুলে গেল।

দেখা গেল একজন রিলিফ অফিসার এবং একজন নমঃশূদ্র, নাম নটবর তলোয়ার]

রিলিফ ॥ এই যে ইন্দ্রবাবু। ভেতরে আসতে পারি?

ইন্দ্র ॥ নমস্কার। আসুন।

[সকলে ভেতরে এল]

রিলিফ ॥ ইনি পুলিস অফিসার।

ইন্দ্র ॥ নমস্কার। ব্যাপার কি?

পুলিস ॥ আপনার বাসার চারদিকে পুলিস। মিথ্যা বলে ব্যাপারটা আর জটিল করবেন না। জবা দাসী নাম্নী একটি মেয়েছেলে আপনার বাড়ীতে আছে?

ইন্দ্র ॥ আছে।

জবা ॥ [এগিয়ে এসে] আমারি নাম জবা দাসী।

নটবর ॥ হুজু:—হুজুর, ঐ আমার স্ত্রী। হ্যাঁরে জবা—আমারে ছেড়ে এদ্দিন কোথায় ছিলিরে তুই?

পুলিস ॥ এই থামো। [জবাকে] এই লোকটি তোমার স্বামী? এই নটবর তলোয়ার?

জবা ॥ 'না' বলব না। স্বামীই ছিল।

রিলিফ ॥ [ইন্দ্রকে] আপনি একে আপনার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আমাদের রিলিফ সেণ্টারে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেছিলেন।

ইন্দ্র ॥ তা, খাতায় স্বামী-স্ত্রী রূপেই লিখিয়েছিলুম।

পুলিস ॥ এ কথা জেনে—যে, এ অপরের স্ত্রী—

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তা জানতাম না—বলা চলে না।

পুলিস ॥ [রিলিফ অফিসারকে] এঁরা দুজনে একঘরে শুতেন ?

রিলিফ ॥ নিশ্চয় শুতেন।

ইন্দ্র ॥ আরো ত্রিশ চল্লিশ জন ঐ ঘরেই শুতেন। কোনোদিন পঞ্চাশ জনও শুতেন।

রিলিফ ॥ হ্যাঁ, তারাও দেখেছে।

ইন্দ্র ॥ তা দেখবে বই কি। রিলিফ সেণ্টার তো আর শ্বশুরালয় নয়।

নটবর ॥ আরে জবা, শেষে তোর মনে এই ছিল রে! শেষে কুলে কালি দিলিরে জবা!

পুলিস ॥ [নটবরকে] এই থামো। [ইন্দ্রকে] আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

জবা ॥ কি অপরাধে ?

পুলিস ॥ সেটুকু বোঝবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি ওঁর আছে। তোমারও আছে। অ্যারেস্ট হিম।

ইন্দ্র ॥ দাঁড়ান স্যার। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এ আমার বিবাহিতা স্ত্রী! লাইসেন্স চান, প্রমাণ চান—সব পাবেন। চান ?

পুলিস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

ইন্দ্র ॥ হাসির কথাই বটে। আমারও হাসি পাচ্ছে। ছোটলোক বলে যাদের ছায়া মাড়াইনি—তাদের এক মেয়ে আমার স্ত্রী। আর তারি অন্নে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি। মহাকালই যে হাসছেন দারোগাবাবু।

জবা ॥ আমি হাসতে পারছি না দারোগাবাবু। আমাদের গ্রাম মুসলমানরা আক্রমণ করবে শুনেই ঐ অত বড় তলোয়ার খাঁ—আমার ঐ স্বামীদেবতা দাসীকে ঘরে ফেলে—সাতপুরুষের ভিটে ফেলে, কুকুরের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। ছেঁড়া জুতোজোড়া পায়ে নিতে ভোলেন নি—ঐ দেখুন। কিন্তু দাসীকে বাঘের মুখে ফেলে গেলেন। শুধু দাঁত আর নখ দিয়ে কতক্ষণ লড়াই করা যায় বলুন দারোগাবাবু···পারলুম না—ওদের চাবুকেরই হল জয়। পিঠে আজও তার ঘা। দেখুন।

ইন্দ্র ॥ আমাদের গাঁয়ে আমরা রুখেছিলুম। বাপ মা ভাই বোনদের সরিয়ে দিয়ে আমরা 'গরিলা-লড়াই' চালিয়েছিলুম। কিন্তু আমাদেরি আত্মীয়-কটুম্বরা আমাদের ধরিয়ে দিলে। কলমা পড়তে আপত্তি করলুম না, কারণ সব ধর্মেই আমার বিশ্বাস আছে। ঘটনা-চক্রে এরা আর আমরা একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হলুম। হুকুম হ'ল আমাদের সাদি দিয়ে ধর্মটা পাকা করে নেবে। উচ্চজাতের সঙ্গে অন্ত্যজের, অস্পৃশ্যের সাদি হবে—ভেদাভেদ দূর করা হবে। ভালো লাগল। আমার নামকরণ হল রহমৎ খাঁ। আমার বিবি হলেন পরিবান্নু বেগম···ঐ জবা দাসী। খানাপিনা হল খুব। নামাজ পড়তে ভুল হল না কোনোদিন।

নটবর ॥ হা গোবিন্দ !···

পুলিস ॥ হুঁ ! প্রমাণ আছে ?

নটবর ॥ আর প্রমাণে কি হবে দারোগা সায়েব ! এমনি সব কাণ্ড-কারখানাই হয়েছে। তা আবার শুদ্ধিও হচ্ছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বলেছেন, গঙ্গা নেয়ে নিলেই হবে। আয় জবা, চস্।

পুলিস ॥ [জবাকে] কি, যাবে ?

জবা ॥ না।

নটবর ॥ সেকিরে জবা !

পুলিস ॥ না কেন ? ধর্মে যখন বাধছে না—

জবা ॥ মুখ্যু মানুষ। ধর্মটর্ম বুঝি না। বুঝি মানুষ, চিনি মানুষ। যাব না।

পুলিস ॥ তা বুঝতে পারছি।—তা বেশ। সবাই তাহলে একবার থানায় চল। স্টেটমেণ্টগুলো রেকর্ড করতে হবে। একটা এনকোয়ারীও করতে হবে।

নটবর ॥ কিন্তু—

পুলিস ॥ [সপদদাপে] চল।—তুমি মেয়ে, তোমাকেও যেতে হবে।

[পুলিস অফিসারের সঙ্গে সকলে থানায় চলে গেল]

[মীরা লুকিয়ে এসব দেখছিল আর শুনছিল। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে যখন দেখলে ওরা চলে গেছে—তখন সে ভেতরে যাবে এমন সময় বাড়ীওয়ালাও পা টিপে টিপে এগিয়ে এল এবং ইসারায় মীরাকে দাঁড় করালো]

বাড়ীওয়ালা ॥ মীরা !

মীরা ॥ এসেছেন ভালোই করেছেন। নইলে আমিই আপনার কাছে যাচ্ছিলুম।

বাড়ীওয়ালা ॥ তাই নাকি ! বা-বাঃ—বেশ। কিন্তু কি সব ব্যাপার ! সব থানায় গেল ?

মীরা ॥ হ্যাঁ। গেল। আপনাকেও যেতে হবে ললিতবাবু।

বাড়ীওয়ালা ॥ কেন, কেন মীরা !

মীরা ॥ আপনি আমাদের চীট্ করেছেন। আপনি বদ লোক।

বাড়ীওয়ালা ॥ ছিঃ মীরা, একথা বলো না। হঠাৎ এত রাগ কেন মীরা !

মীরা ॥ আপনি বাবাকে কী বুঝিয়েছেন, আপনিই জানেন। ত্রিকুটেশ্বরের ওপর যতটা বিশ্বাস—আপনার ওপরও ততটা। ১০৮ টাকা নিয়ে আপনি তাঁকে কি স্বপ্নাদ্য ওষুধ দিয়েছেন, আপনিই জানেন। কিন্তু বাবার বিশ্বাস, তাতে তিনি সারবেনই। সারছেন না শুধু—কি একটা নিয়ম বলে দিয়েছেন—সেই নিয়মটা মানতে পারছেন না বলে। নিয়মটা কি ?

বাড়ীওয়ালা ॥ খুব সোজা একটা বিধি।

মীরা ॥ কিন্তু সেটা কি ?

বাড়ীওয়ালা ॥ সেটা গুপ্ত রাখাই যে বিধান মীরা। অপরে জানলে ওষুধে কিন্তু ফল হবে না।

মীরা ॥ না জানাতেও ফল হয়নি। জানলে বরং বুঝব।

বাড়ীওয়ালা ॥ তা তুমি ধরলে বলতেই হয়। কিন্তু ওষুধে কাজ না হ'লে আমার দোষ নেই মীরা।

মীরা ॥ বলুন।

বাড়ীওয়ালা ॥ বিধিটা হচ্ছে এই, ওষুধটা যখন খাবেন তখন কখনো যেন উষ্ট্রের কথা মনে না হয়।

মীরা ॥ উষ্ট্র !

বাড়ীওয়ালা ॥ মানে উট্। দেখেছ ত !

মীরা ॥ দেখেছি। কিন্তু উষ্ট্র কেন ?

বাড়ীওয়ালা ॥ সে ত্রিকুটেশ্বর জানেন।

মীরা ॥ কিন্তু এ বিধি দেওয়াতে উষ্ট্রের কথাটিই যে আরো বেশি করে মনে পড়বে—ওষুধের থলটি যেই মুখে ধরবেন।

বাড়ীওয়ালা ॥ উনি চেষ্টা করছেন। একদিন হয়ত পারবেন। সেদিন ব্যারাম সারবে নির্ঘাৎ। জয় বাবা ত্রিকুটেশ্বর !

মীরা ॥ বুঁঝলুম।…হুঁ, বুঝলুম। বেশ। আচ্ছা আর একটা কথা।

বাড়ীওয়ালা ॥ বল—বল মীরা।

মীরা ॥ আপনার ১০৮ টাকা দক্ষিণা আমি যোগাড় করে দিয়েছি। জানেন ?

বাড়ীওয়ালা ॥ তা-না-হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি বইকি। আর তো সব ভ্যাগাবণ্ড।

মীরা ॥ একশ আটটা টাকার জন্যে যখন আমি পাগলের মতো ঘুরচি, তখন একদিন একটা পোস্টকার্ডে চিঠি পেলুম। লিখেচে—"৩২৩ চৌরঙ্গীপার্কে মাসাজ কিওর—মানে, গাত্রমর্দন চিকিৎসালয়ে নার্স নিযুক্ত হবে। মাসিক বেতন ১৫০ টাকা। আবেদন করুন।" স্বাক্ষর—"হিতৈষী বন্ধু।" যেতেই চাকরী পেলুম। আগাম ১০৮ টাকা নিয়ে আপনার দক্ষিণা দিলুম।

বাড়ীওয়ালা ॥ তাই নাকি ! এত সবও আছে নাকি !

মীরা ॥ ক্রমে বুঝলুম যে নার্সিংটা কি।

বাড়ীওয়ালা ॥ কী ?

মীরা ॥ শয়তান ! ব্যবসাটা তোমার !

বাড়ীওয়ালা ॥ না মীরা, তোমার মাথার ঠিক নেই আজ। তুমি বরং—আচ্ছা আমিই বরং—

মীরা ॥ শুধু আমি ? আমার মতো কত মেয়ের সর্বনাশ তুমি করেছ ! ১০৮ টাকা যোগাড় করতে যেমন পাগল হয়েছিলুম, তেমনি পাগল হয়ে এই রিভলবার যোগাড় করেছি। [রিভলবার লক্ষ্য করল]

বাড়ীওয়ালা ॥ মীরা ! মীরা !

মীরা ॥ আমাদের জীবন তুমি মরুভূমি করে দিয়েছ। মরুভূমি ! জীবন আমাদের মরুভূমি !

[চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে গেল]

বাড়ীওয়ালা ॥ [রিভলবার তুলে নিয়ে] মীরা।

মীরা ॥ মরুভূমি দিয়ে চলেছি আমরা সব উট। বাবা কী করে আমাদের ভুলবেন ! কী করে পারবেন তিনি !

মহেন্দ্র ॥ [নেপথ্য থেকে] মীরা ! মীরা !

[বাড়ীওয়ালা রিভলবার নিয়ে অদৃশ্য হল]

মীরা ॥ [দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল]

মহেন্দ্র ॥ [ওষুধের খল হাতে এসে, তাকে ঐ অবস্থায় দেখে] উট ! মরুভূমিতে মুখ ঢেকে রয়েছে !···হাঃ হাঃ হাঃ [হঠাৎ] এই যা—মনে পড়ে গেল ! কী হবে আর ওষুধ ! [খলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন] আয় মা ! আমার বুকে আয় —এ মরুভূমিতে এইটুকুই যা ওয়েসিস !

[বর্তমান, আশ্বিন ১৩৫৫]

শেষ

নাট্যকার মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘু-ডাকাত

[একত্রে একখণ্ডে তিন টাকা]

"বাংলা নাট্যমঞ্চের স্বর্ণযুগ তখনো মিলিয়ে যায় নি—ভারতের জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে স্বাধীনতার সংকল্পবাণী উচ্চারণ করছে,—সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের আবির্ভাব। তাঁর জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ নাটকগুলি সে যুগে শুধু অভূতপূর্ব আলোড়নেরই সৃষ্টি করেনি, নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থানও নির্দেশ করে দিয়েছে। প্রচলিত লোক-গাথা কিংবা সুপরিচিত পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনীকেই তিনি নূতনতর রূপে উপস্থাপিত করলেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। নাট্যবস্তু-গ্রন্থনে, নাটকের উপযুক্ত ঘাত-প্রতিঘাত-সৃজনে, পরিচ্ছন্নতায়, আঙ্গিকের অভিনবত্বে এবং সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব, দৃষ্টিভঙ্গীতে, তিনি যে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সে কথা অচিরেই প্রমাণ করে দিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর পরবর্তীকালে রচিত তিনটি বিভিন্ন নাটকের একত্র সমাবেশ। 'মীরকাশিম' ঐতিহাসিক, 'মমতাময়ী হাসপাতাল' সামাজিক এবং 'রঘুডাকাত' সম্ভবত স্থানবিশেষে প্রচলিত কোন লোকগাথার নাট্যরূপ। 'মীরকাশিম'-এর কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র এবং 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাম দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক উপহার দিয়ে গেছেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্বে, আঙ্গিকের উপস্থাপনে এবং চরিত্রসৃষ্টির বলিষ্ঠতায় মন্মথ রায় সম্পূর্ণ স্বকীয়। পূর্বসূরীদের প্রভাব তিনি আশ্চর্যরকমে অতিক্রম করতে পেরেছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

'মমতাময়ী হাসপাতাল' তাঁর নিজস্ব কাহিনী। প্রেম ও রোমান্সে গঠিত এক অপরূপ গল্পের নাট্যায়ন। স্নিগ্ধ মধুর কমেডি বা মিলনান্তক নাটক রচনাতেও নাট্যকার যে সিদ্ধহস্ত, এই নাটকটি তার প্রমাণ হয়ে রইল।

'রঘুডাকাত' মেদিনীপুর অঞ্চলের সম্ভবত একটি ইতিহাসাশ্রিত লোকগাথার কাহিনীকে আশ্রয় করে গ'ড়ে উঠেছে। শুধু সুষ্ঠু ও দৃঢ় নাট্যগ্রন্থনই নয়, কী চরিত্র-চিত্রণে, কী ভাব-ব্যঞ্জনায়, নাটকখানি নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে।

একত্রে গ্রথিত তিনখানি নাটকের এই সুলভ সংস্করণটির ছাপা, বাঁধাই ও পরিবেশনও সুন্দর।" —**আনন্দবাজার পত্রিকা**—২৭।২।৫৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্যকার মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘু-ডাকাত

[একত্রে একখণ্ডে তিন টাকা]

"বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের জীবন যেমনি সংঘাতময়—তেমনি বিষাদান্ত। পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন কাশেম আলি—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁর স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, অতুলনীয় বীরত্ব নাট্যকার এমন জোরালো নাটকীয় আবেগ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যে, মীরকাশিম চরিত্রের সঙ্গে আমরা যেন একাত্ম হয়ে যাই—তাঁর উত্তেজনায় আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি—তাঁর বেদনায় ব্যথিত হই। এক কথায় তৎকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অধ্যায় আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই বিগত দিনের জাতীয় জীবনের হৃৎ-স্পন্দনধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাই। নাট্যকার এক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তা ছাড়া তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। দর্শকের সস্তা হাততালির লোভে তিনি কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেন নি—স্টাণ্ট বা চমকের সাহায্যে মেলোড্রামা সৃষ্টির প্রয়াস পান নি। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে যে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু প্রতিভাশালী প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব।

একদা মঞ্চে 'মীরকাশিম' বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আজও এর আবেদন পুরনো হয়ে যায় নি। নাটকের চরম সার্থকতা নির্ভর করে অভিনয়-সাফল্যের উপর! মীরকাশিম যে একখানি মঞ্চসফল নাটক তা বলা বাহুল্য। এ নাটকের অভিনয় সকল সময়েই দর্শকদের আনন্দবিধান করতে সমর্থ হবে।

"মমতাময়ী হাসপাতাল" একখানি কৌতুক-নাট্য। শ্লেষ নেই, ভাঁড়ামি নেই, ব্যঙ্গের কশাঘাত নেই—শুধু অনাবিল হাসির ঝরণাধারা বয়ে গেছে এই নাটকের ছত্রে ছত্রে। বাংলা-সাহিত্যে বিশুদ্ধ হাসির নাটকের খুবই অভাব। 'মমতাময়ী হাসপাতাল'—বাংলার কৌতুক-নাট্য-সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করবে সন্দেহ নেই।

রঘুডাকাতের কাহিনী সুবিদিত। দুর্দ্ধর্ষ রঘু ডাকাত কি করে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হ'ল—সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনীকে কেন্দ্র করেই 'রঘু ডাকাত' রচিত হয়েছে। এ ধরণের নাটক রচনায় মন্মথবাবুর জুড়ি নেই। নাট্যকারের ভাষার মাধুর্য্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নাটকখানিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। এখানি যে দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করবে তাতে সন্দেহ নেই।"—**প্রবাসী**, চৈত্র, ১৩৬১

নাট্যকার মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্য নিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্ম স্পর্শ করিয়াছে! বার্নাড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান'-এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—**বিজলী**। (পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল)।

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।'—**প্রবর্তক**।

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "ও-দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারমেন'-এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।"—**নবশক্তিতে 'চন্দ্রশেখর'**।

[কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া একত্রে এক খণ্ডে: তিন টাকা]

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এলাইন স্টীল-এর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে"—**ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত**। (নব-সংস্করণ যন্ত্রস্থ)।

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও স্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণ অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদ সদাগর' দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—**আনন্দবাজার পত্রিকা**। (দুই টাকা)।

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C.A.P., ফার্স্ট এম্পায়ার। সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্য-নৈপুণ্যের কীর্তি-স্তম্ভ। "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা-সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।"—**যুগান্তর**। (বারো আনা)।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক"—**নবশক্তিতে "চন্দ্রশেখর**'। (নব-সংস্করণ যন্ত্রস্থ)।

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব রূপ। "হাসি এবং অশ্রুতে সমুজ্জ্বল।"—**আনন্দবাজার** (পাঁচ সিকা)।

রাজনটী—এই নাটিকাখানি 'রাজনর্তকী' নামে বাংলা ও হিন্দীতে এবং 'Court Dancer' নামে ভারতে প্রস্তুত প্রথম ইংরাজী সবাক চিত্ররূপে চিত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছে। "এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।"—**আনন্দবাজার**। (বারো আনা)।

জীবনটাই নাটক—মিনার্ভা থিয়েটার। "বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে—এটা হলো নবীনতম। আমার তো মনে হয়, এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটাবার সম্ভাবনা হল।"—
—**শ্রীমনোজ বসু**।

"আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই, এ অভিনয়ের উদাহরণ নেই।"—**শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল**। (আড়াই টাকা)।

উর্বশী নিরুদ্দেশ—"কিছুটা স্বপ্ন কিছুটা বাস্তব, সব মিলে এক অপূর্ব রসের উৎসরণ। যে lyrical appeal মন্মথবাবুর সার্থক নাটকগুলির বিশেষত্ব, সেই রসস্রোতে অব্যাহত।"—**দেশ**।

"বাস্তব ও স্বপ্নের অপূর্ব সমন্বয়।"—**আনন্দবাজার পত্রিকা**। (আট আনা)।

কৃষাণ—হাসি-অশ্রু-সমুজ্জ্বল চিত্র-নাট্যোপন্যাস। "ঘটনায় মর্মস্পর্শী, আবেদনে করুণ, চরিত্রচিত্রণে উজ্জ্বল।"—**আনন্দবাজার**। (দুই টাকা)।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্যকার মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী

রূপকথা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। "এরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"—**আনন্দবাজার পত্রিকা**। (বারো আনা)।

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতুহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচলপ্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—**আনন্দ-বাজার**। (দুই টাকা)।

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে-ভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যে-ভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিস্ট'-এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক-সাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।"—**দীপালীতে 'চন্দ্রশেখর'**। (দুই টাকা)।

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষ।"

—**আনন্দবাজার**।

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"—**দেশ**। (দুই টাকা)।

কাজলরেখা—প্রসিদ্ধ রূপকথার একাঙ্ক নাটক—ছাত্রীদের অভিনয়োপ-যোগী। (বারো আনা)। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্যকার মন্মথ রায়ের নূতন রচনা

নবযুগের অভিনব নাট্যসাহিত্য

ধর্ম্মঘট

[যন্ত্রস্থ]

"বেশ কিছুদিন আগের কথা। হঠাৎ বঙ্গশ্রী মাসিকপত্রে এক সংখ্যায় লক্ষ্য করলাম মন্মথ রায়ের ধর্ম্মঘট নামে একটি নাটক প্রকাশিত হ'তে শুরু করেছে। প্রায় বারো-চৌদ্দ বছরের নীরবতার পরে "কারাগার" ও "মীরকাশিমে"র নাট্যকারের লেখনী-প্রসূত নাটক স্বভাবতই মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল।...

তারপর বছর ঘুরে গেছে। হঠাৎ সেদিন আমন্ত্রণ এল ট্রাম শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের নতুন নাট্যাভিনয় দেখবার জন্যে। নাটক : মন্মথ রায়ের "ধর্ম্মঘট"। প্রযোজনা : কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক প্রগতি সংঘ। পরিচালনা : অমর গাঙ্গুলী। শিল্পনির্দেশ : শম্ভু মিত্র।

মনে সংশয় ছিল। কারণ বাংলার বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকাররা বিদেশী রাজের আমলে সক্রিয়ভাবে তাঁদের রচনায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করলেও জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এবং ভাবী সমাজ গঠনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কেউ মেনে নিতে পারেন নি। তাই বহু গণ-আন্দোলন তাঁদের ব্যক্তিগত সহানুভূতি লাভ করলেও রচনা তাঁদের একান্ত নিঃসঙ্গতার বেড়াজাল নির্ম্মাণ করে রয়েছে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের রচনায় স্থান পায় নি। তাই সেই বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণীর এই আগুয়ান পদক্ষেপ একাধারে আনন্দ ও সংশয় জাগিয়েছিল।

কিন্তু অভিনয় সমাপ্তিতে সব সংশয় দূরীভূত হল। শুধু প্রশস্তি উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু বলার রইল না।

হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকের রক্তে ফেঁপে-ওঠা ছাতার কারখানার মালিক দীনবন্ধু চৌধুরীর নানা অছিলায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট কিভাবে মালিকের ঘৃণ্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা